প্রিয় ছাত্রী

বর্ণালী আর চিত্রলেখাকে দিলাম।

রহস্যপ্রিয় পাঠক পাঠিকাদের বলছি,

দয়া করে, বেডরুমের আলোটা নিভিয়ে দিন। উত্তর থেকে ছুটে আসা কনকনে হাওয়ার বাতায়নটি খুলে রাখুন। এখন যদি বর্ষাকাল হয় তবে বৃষ্টির সকরুণ আর্তনাদে ভেসে যাবে বিশ্বচরাচর। যদি এটা হয় ডিসেম্বরের কোন শীতার্ত মধ্যরাত, তাহলে হাড় হিম হবে ঘন কুয়াশায়।

দোহাই আপনাদের অমনভাবে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনবেন না। কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটোয় শুরু হবে তিমির তনয়া ড্রাকুলার বীভৎস জিঘাংসা। ঐ তার ঘুম ভাঙছে। পশ্চিমের আকাশ চিরে জন্ম নিচ্ছে কালো শয়তান ড্রাকুলা!

তার পেটের দিকে দেখুন—তাজা রক্তের দাগ!!

তার চোখের দিকে দেখুন—বিচিত্র ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার আগুন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

অতএব সাবধান, এ বইয়ের শেষ পাতাটি না পড়া পর্যন্ত নিদ্রা যেন আপনাকে, আপনার ভীত সন্ত্রস্ত স্নায়ুপুঞ্জকে কুহক মায়ায় গ্রাস না করে!

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

পূর্ব ইউরোপের এক অজ্ঞাত ও দুর্গম জঙ্গলে ছিলো এক ভয়ঙ্কর অঞ্চল। একবার জোনাথন হার্কার নামে সলিসিটরের এক ক্লার্ক লণ্ডন থেকে ঐ ভয়ঙ্কর অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

হাঙ্গারীর সেই ট্রানসিক ভ্যানিয়া নামে অঞ্চলে এক অদ্ভুত অভিজাত মানুষ বাস করতো। তারা কাউন্ট ড্রাকুলা নামে পরিচিত। বিশাল এক রহস্যপূর্ণ দুর্গে তারা থাকতো। তিনি ইংলণ্ডে একটি প্রাসাদ ও জমিদারী কিনতে চান। সেই ব্যাপারে লণ্ডনের সলিসিটার মিঃ হকিন্সের প্রতিনিধি হার্কার ঐ প্রাসাদ দুর্গের উদ্দেশ্যে চলেছে।

মিউনিগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট ছাড়িয়ে সে কার্পেথিয়াম পর্বতমালার সেই দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশ করলো। এখনো এখানকার মানুষরা অন্ধ কুসংস্কারে ডুবে আছে।

বিসট্রিজ নামে এক জায়গায় গোল্ডেন ক্রোম হোটেলে এসে হার্কার উঠলো।

হোটেলের মালিক বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন খুব ভাল মানুষ। জার্মানী। প্রথমেই হেসে বৃদ্ধা তাকে অভ্যর্থনা করলো—জের ইংলিশম্যান ?

—হ্যাঁ, আমিই জোনাথন হার্কার।

কাউন্ট ড্রাকুলার লেখা একটা পত্র এনে আমার হাতে দিলো বৃদ্ধ।

বন্ধু আমার। আপনাকে কার্পেথিয়াম-এ স্বাগত জানাচ্ছি। আপনার অপেক্ষায় আছি। কাল তিনটের সময় একটা গাড়ী বুকোভিনার যাবে। আপনার জন্য একটা আসন সংরক্ষিত হয়েছে। পথে, বর্গো পাস-এ আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে আপনাকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য। আমার বিশ্বাস, আপনি এখানে এসে আমার চিরসুন্দর দেশকে সত্যিই উপভোগ করবেন।

আপনার বন্ধু,

"ড্রাকুলা"

ড্রাকুলা বা তার ক্যাসল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বৃদ্ধরা কেমন যেন হয়ে গেল। কোন উত্তর তো দিলই না বরং ওদের মুখ চোখে যেন ফুটে উঠলো আতঙ্ক।

পরদিন যাত্রার সময় বৃদ্ধা তো প্রায় কেঁদে ফেললো। ওখানে না গেলেই নয় বাবা? জানো আজ ৪ঠা মে সেন্ট জর্জ ডে'র আগের দিন? আজ মধ্য রাত্রিতে বিশ্বের যাবতীয় অশুভ আত্মারা যত্রতত্র তাণ্ডব লাগিয়ে দেবে। অতএব যেয়ো না বাছা।

কিন্তু হার্কার যাবেই। তখন বৃদ্ধা ওর গলায় একটা ক্রুশচিহ্ন ঝুলিয়ে দিলো। বললো, এটা গলায় রেখো। তোমার সমস্ত অমঙ্গলের হাত থেকে এই পবিত্র ক্রুশ রক্ষা করবে।

হার্কার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ঐ বৃদ্ধা আর জমায়েত নরনারী শিশু বিষণ্ণ বদনে তাকিয়ে হাত দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে ওরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়। মনে হলো, হার্কার এমন এক ভয়ঙ্কর জায়গায় যাচ্ছে, যেখান থেকে কেউ আর ফেরে না। শক্ত মানুষ হার্কারের মনও ভয়ে দুলে উঠলো।

কোচ গাড়ি রওনা হলো। পথে যেতে যেতে সহযাত্রীদের মুখে নানারকম জার্মান শব্দ শোনা গেল। যেমন—অরডগ মানে শয়তান। পোকল—নরক। ভ্রলক ও ভলকোশ্ল্যাক যার মানে হলো ড্যাম্পায়ার ও নয়—নেকড়ে। সবই যে হার্কারের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হলো না। হার্কার বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো।

অদ্ভুত নয়নভিরাম দৃশ্য সমন্বিত চড়াই উৎরাই পথ কেটে গাড়ি চলতে লাগলো। একসময় এত উঁচু পর্বত চূড়ায় উঠে এলো গাড়ি যে সারা পথটা তুষারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

বর্গো পাস পার হয়ে কেচে যাবে বুকোভিনা। কার্পেথিয়াম পর্বতমালার সবুজ ও তুষার শুভ্র নানারূপের মধ্য দিয়ে এ পথ চলে গেছে। সূর্যাস্তের পর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়েছে! গাড়ির অনুজ্জ্বল আলো ছাড়া আর চারিদিকে অন্ধকারে ঢাকা। গাড়ি বর্গো পাস-এ ঢুকছে।

সহযাত্রীরা সকরুণ চোখে হার্কারের দিকে তাকাচ্ছে। ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ, মিটমিটে আলো, আশে পাশে গভীর অন্ধকার—সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ভুতুড়ে পরিবেশ। একসময় বর্গো পাসের সীমান্তে এসে গাড়ি থামলো। কিন্তু কাউন্টের গাড়ির দেখা নাই। সবাই যেন একটু আশ্বস্ত হলো। কেচেরাম

হার্কারকে বললো—চলুন সোজা বুকোভিনা। দিনের বেলা আবার সেখান থেকে ফিরে যাবেন।

বলতে না বলতেই হঠাৎ পেছনে খড় খড় শব্দে কাজল কালো রঙের চারটে চমৎকার ঘোড়া একটা গাড়ি টেনে নিয়ে এসে কেচের পাশে দাঁড়ালো।

দীর্ঘকায় একজন লোক চালকের সাটে বসে। মাথায় বিরাট টুপীটার জন্য তার মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে কেচে গাড়ির আলোতে লোকটির চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো।

এ গাড়ি থেকে হার্কারের জিনিসপত্র ওগাড়িতে তুলে একটি কঠিন শীতল হাত হার্কারকে টেনে তুললো তার গাড়িতে। সে মুঠিতে যেন দানবের শক্তি।

তারপর লাগামে ঝাঁকুনি পড়তেই কালো ঘোড়াগুলি একলাফে সজাগ হয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলো।

নিশীথ রাত্রি। হার্কারের কেমন গা ছমছম করতে লাগলো। পাশে বসে আছে রহস্যময় চালক।

একসময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুর্গম জঙ্গলের আড়াল থেকে শুরু হলো ভয়ানক নেকড়েদের ভয়ঙ্কর চিৎকার। সেই গা শিরশিরে করা গর্জন রাত্রের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। আওয়াজ শুনে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে আর নড়তে চায় না। তখন চালক গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাদের কানে কানে কি বলে আদর করে শান্ত করে আবার গাড়িতে ফিরে আসে।

হঠাৎ একটা মিটমিটে নীল আলো হার্কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অন্ধকারের মধ্যে দূরে জ্বলছে। গাড়ির চালক গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে আবার গাড়ি চালাতে লাগলো। ঐ নীল আলোর রেখা অনেকবার দেখা গেল। ঐরকম ভাবে চালক বারবার নামতে লাগলো।

একবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য হার্কার দেখলো। দূরে নীল আলো জ্বলছে, চালক এগিয়ে গেল। তার দেহ ভেদ করেও সেই নীল আলো দেখা যেতে লাগলো। নীল আলো কমার সঙ্গে সঙ্গে আবার নেকড়েদের চিৎকার শোনা গেল।

একবার চালক নেমে অনেক দেরী করলো ফিরে আসতে। ঘোড়াগুলো এমন চিঁহিচিঁহি ডাক শুরু করলো যে প্রথমে হার্কার হতভম্ব হয়ে গেলো। সেই মুহূর্তে আকাশের মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের আলো দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো এমন এক জিনিস, হার্কারের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। গাড়ীর চারপাশে

ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার হিংস্র নেকড়ে মুখব্যাদন করে। আর প্রাণপণ চিৎকার করে গাড়ী সমেত খেয়ে নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

হার্কার চিৎকার করে উঠলো। কোথা থেকে চালক এসে নেকড়েদের উদ্দেশ্যে সগর্জনে কি যেন বলে আদেশ করলো। তাজ্জব ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ভদ্র ছেলের মত নেকড়েরা চুপ করে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

অনন্তকাল পথ পরিক্রমণ করে একসময় গাড়ি এসে এক বিশালাকার প্রাসাদসম দুর্গের চত্বরে প্রবেশ করলো। দৈত্যের মত যেন দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটা, জনমানবহীন। বিরাট বিরাট জানালাগুলো খোলা, কিন্তু কোন আলোর চিহ্ন দেখা গেল না।

সেই অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন চালকের হিমশীতল হাতের সাহায্যে গাড়ী থেকে নামলো হার্কার। তারপর তাকে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে গাড়ি নিয়ে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কড়কড কড়াৎ শব্দে দুর্গের বিরাট দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ, হাতে তার মশাল জ্বলছে। লোকটির সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা। বেশ লম্বা সাদা রঙের পাকা গোঁফ।

লোকটির কথায় জোনাথন হার্কার ভেতরে ঢুকলো। লোকটির বরফ ঠাণ্ডা হাতের পাঞ্জা এসে ধরলো তার হাত। এত ঠাণ্ডা মনে হলো, এটা যেন মৃত মানুষের হাত।

প্রবল শক্তিতে বৃদ্ধ যেভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ডসেক করলো, হার্কারের মনে পড়ে গেল, গাড়ির চালকের কথা। দুজনের একরকম শক্তি।

—আপনার নামই কি·····?

—কাউন্ট ড্রাকুলা। তারপর বৃদ্ধ মশালটা নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো। এক সময়ে একটা ঘরে এসে প্রবেশ করলো দুজনে।

ফায়ার প্লেসের আগুনে ঘর গরম। টেবিলে রাত্রের খাবার। অন্য একটি দরজা ছোট্ট একটি ঘর পেরিয়ে এক ঘরে ঢুকলো তারা। চমৎকার শোবার ঘর, পরিপাটি বিছানা, ফায়ার প্লেসের তাজা আগুন, একটি সুন্দর আলো জ্বলছে।

হাত মুখ ধুয়ে হার্কার খেতে বসলো। বৃদ্ধের নাকি একটু আগে রাত্রের খাওয়া হয়ে গেছে।

এবার ভালো করে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলো কাউন্ট ড্রাকুলাকে। বেশ

কঠিন মুখ, শক্তিশালী চোয়াল, বড়া নাসা, বড় বড় নাকের গর্ত। বিরাট ডিমের মত কপালের কাছাকাছি সামান্য চুল, পেছনে অনেক। নিষ্ঠুর আকৃতির ঠোঁট। সাদা গোঁফের তলায় ঠোঁটের ফাঁকে অস্বাভাবিক সাদা ধারালো দুপাটি দাঁত, ঠোঁট দুটি যেন উঁচু উঁচু দাঁতগুলোকে আর সামলাতে পারছে না। থুতনি বড় ও শক্ত। আসলে কেমন যেন একটা দানবিক আকৃতি ও অভিব্যক্তি।

একটা জিনিস দেখে হার্কার অবাক না হয়ে পারলো না। বৃদ্ধের হাতের তেলোতে লোম। আর নখ লম্বা এবং ছুঁচালো করে কাটা। মুখের কাছে মুখ আসতে ড্রাকুলার নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে পড়লো। কেমন যেন বমি বমি মনে হলো তার। একটা ভয় ভয় ভাব এসে জমা হলো হার্কারের মনে। ওদিকে জানলা দিয়ে ভেসে আসছে দুরাগত হিংস্র নেকড়ের চীৎকার।

—শুনুন ঐ রাত্রির শিশুদের ডাক। কি সুন্দর গানের মত মনে হয়, না? কাউন্ট ড্রাকুলার ঠোঁটে ভয়ঙ্কর বিশ্রী হাসি। আচ্ছা, আপনি ঘুমোন। আমি একটু বেরোচ্ছি। কাল বিকেল নাগাদ ফিরবো।

কাউন্ট বিদায় নিল। হার্কার বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভীত ও ক্লান্ত যুবক নিদ্রায় ডুবে গেলো।

ঘুম থেকে উঠে দেখে ব্রেকফাস্ট তৈরী। কাউন্ট কোথায় যেন গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয়, এতবড় দুর্গের ঘরগুলো সব সুন্দর করে সাজানো, মূল্যবান আসবাব, চমৎকার লোভনীয় মুখরোচক খাদ্য-সামগ্রী, কে এসব করে! হার্কার তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। প্রাণী বলতে ঐ কাউন্ট ড্রাকুলা আছে। একটা লাইব্রেরী ঘরও আছে। বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ রয়েছে সেখানে। কিন্তু একটা আয়না নেই কেন সেটা বোঝা গেলো না।

কাউন্ট হার্কারকে দুর্গের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে বললো। কিন্তু যে ঘরগুলো তালা বন্ধ সেগুলোতে যাওয়া নিষেধ। বেশীরভাগ তালাবন্ধ। নীল অগ্নিশিখাগুলি কি জানতে চাওয়ায় বৃদ্ধ জানায় যে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস যে এই রাত্রে অর্থাৎ সেন্ট জর্জ ডে'র রাত্রে যত সব দুষ্ট আত্মারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কথা বলবার সময় মাঝে মাঝে হেসে উঠেছিল কাউন্ট ড্রাকুলা। আর তার ধারালো শ্বাপদের মত ধার দাঁতগুলি বিশ্রীভাবে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল।

মাঝে একবার হার্কার নিজের ঘরে যখন গেল ফিরে এসে দেখে ওর জন্যে

খাবার ড্রাকুলা নিজেই টেবিলে সাজিয়ে রাখছে। কাউণ্টের কি কোন চাকর-বাকর নেই? এতবড় দুর্গে একটিমাত্র মানুষ থাকবে তাও তো ভাবা যায় না।

জোনাথন হার্কার এবার জানালো ওর ফার্ম পারফ্লিটে কাউণ্টের জন্য একটি এস্টেট কিনেছে। কুঁড়ি একর জমির ওপর প্রাচীন ঘেরা অতি প্রাচীন পাথরে নির্মিত একটি দুর্গপ্রাসাদ। এটা করেফ্যাক্স এস্টেট নামেও পরিচিত। একটি একটি ছোট লেকও আছে। পাশেই একটা পুরোনো চ্যাপেল আছে। এছাড়া তেমন কোন ঘরবাড়ি নেই। একটা প্রাইভেট মানসিক হাসপাতাল বা পাগলা-গারদও আছে।

শতাব্দীর পুরোণো কাউণ্ট খুব পছন্দ করে। শুনে খুব খুশী। আর পছন্দ বাড়ি সংলগ্ন গীর্জার কবরস্থানে সমাহিত হওয়া। ঝোপ-ঝাড়, অন্ধকার নির্জন বিশাল দুর্গই তার বেশী পছন্দ।

জোনাথন হার্কার একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছে, মনে হয় এই বিশাল দুর্গে সে-ই একমাত্র জীবিত প্রাণী। কাউণ্টকে তাব জীবিত বলে মনে হয় না।

একদিন ভোরবেলা হার্কার আয়না বুলিয়ে দাড়ি কামাতে বসেছে এমন সময় কাউণ্টের শীতল হাতের স্পর্শ তার কাঁধে পড়লো—গুড মর্নিং।

দারুণ আশ্চযের ব্যাপার, ঐ ঝুলন্ত কাউণ্টকে সে দেখতে পাচ্ছে না। পেছন ফিরে দেখলো, কাউণ্ট দাঁড়িয়ে, কিন্তু আয়নায় তার যেন প্রতিচ্ছবি পড়ে নি। তবে কি আয়নায় কাউণ্টের কোন প্রতিফলন হয় না। অ্যা: অদ্ভুত! জীবিত মানুস হলে তো একশোবার হবে। তাহলে? ক্ষুরের ঝাঁকুনি লেগে গাল কেটে গেল হার্কারের আর রক্ত পড়তে লাগলো।

রক্ত দেখে ড্রাকুলায় ভয়ঙ্কর চোখের তারা ভয়াবহভাবে কয়েকবার লকলক করে জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্ট তার গলাটা টিপে ধরার চেষ্টা করতেই হার্কার পাশে সরে গেল। আর কিভাবে তার হাতটা বুড়ির দেওয়া গলায় ঝোলানো ক্রশের উপর পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে কাউণ্টের অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেলো।

বললো—হুঁশিয়ার, এভাবে গাল কাটতে হয়। আর এই আয়নাটা হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। বলেই আয়নাটা টেনে নিয়ে কাউণ্ট জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর আর কোন কথা না বলে কোথায় যেন চলে গেলো।

এবার হার্কার খেয়ে নিয়ে ঘুরতে বেরোলো। প্রায়ই ঘর তালাবন্ধ। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দুর্গের শেস প্রান্তে এসে হাজির হলো। উঃ, দুর্গটা কত

উঁচুতে অবস্থিত। বহু নিচে সবুজ গাছের মাথা সুউচ্চ পাহাড়ের একেবারে কাছ ঘেঁষে শেষ হয়েছে দুর্গের শেষ প্রান্ত। একটা পাথর ফেললে হাজার ফুট নিয়ে বিনা বাধায় সেটা নিচে গিয়ে পড়বে।

একটা ব্যাপার ভাবতে হার্কারের গা শিউরে উঠলো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানলা ছাড়া এই দুর্গ থেকে বের হবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তার দু-খানা ঘর ছাড়া সব তালাবন্ধ। তাহলে কি এটা একটা কারাগার! তাহলে জোনাথন হার্কার সেই কারাগারে বন্দী!

প্রথমে পাগলের মত কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে নিজেকে সংযত করলো সে। বোধহয় কাউণ্ট ইচ্ছে করে এই ব্যবস্থা করেছে। এখন তাকে ভয় পেলে চলবে না। আর ভয় যে পেয়েছে এটাও প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

কাউণ্ট ফিরে এলো। হার্কার আড়ালে থেকে লক্ষ্য করলো, কাউণ্ট তার বিছানা করে দিচ্ছে। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। তাহলে রান্না-বান্না, সাজানো-গোছানো, দেওয়া-শোওয়া সবই কি এই একটি অলৌকিক ভয়াবহ মানুষ করে চলেছে। এ কি মানুষ! তবে কি এই কাউণ্টই সেদিন হার্কারকে ভিন্ন পোশাকে সে রাতে ঘোড়ার গাড়ি করে নিয়ে এসেছিল? হার্কারের গায়ের কাঁটা খাড়া হয়ে উঠলো। এ কোন ভুতুড়ে দুর্গে এসে সে বন্দী হলো।

সে রাতে নিয়ে আসার চালক যদি কাউণ্ট হয় তাহলে কোন মন্ত্রবলে সে সময় সে বারবার বন্য হিংস্র নেকড়েগুলোকে মাত্র হস্তসঞ্চালনে বশীভূত করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল? গায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো হার্কারের। নিজের থেকেই গলায় ঝোলানো ক্রশে তার হাত চলে গেলো।

একসময় ড্রাকুলা তাকে জানিয়ে দিল, যদি সে তার ফার্মকে চিঠি লেখে তাহলে যেন তাতে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা ছাড়া আর কিছু না থাকে। আর যদি কিছু লিখতে হয় তাহলে সর্বদা যেন উল্লেখ থাকে হার্কার এখানে অতি সুখে ও শান্তিতে আছে।

তার মানে চিঠিতে সত্য প্রকাশ করা যাবে না। এই চিঠি লেখা নিয়েই ঘটলো কিছু অস্বস্তিকর ও ভীতিপ্রদ ঘটনা।

একসময় ড্রাকুলা জানালো, বিশেষ কাজে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। হার্কারের প্রয়োজনীয় সবকিছু এখানেই আছে। আর এই বলে সাবধান করে গেল, হার্কার যেন ভুলেও দুর্গের এ অংশ ছেড়ে অন্য কোন অংশে না যায়। তার চেয়েও আরও সতর্ক বাণী হলো—দুর্গের অন্য কোন অংশের। কোন ঘরে না

ঘুমোয়। কারণ এটা অনেকদিনের দুর্গ। অনেক ইতিহাস এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেখানে সেখানে বোকার মত ঘুমিয়ে পড়লে সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত হতে পারে। তার ফলে হয়তো—। কথাটা শেষ না করে কেবল একটা ভয়ঙ্কর মুখ বিকৃতি করেছিল কাউণ্ট।

কাউণ্ট চলে যেতেই তার নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে হার্কার দুর্গের দক্ষিণ দিকে অপর অংশে চলে গেলো। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। কেবল একটা কথাই হার্কারকে পাগল করে তুলেছে—এই বিশাল প্রাসাদ দুর্গে সে-ই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী।

দক্ষিণের একটা জানালা দিয়ে হার্কার উঁকি মারলো। অদ্ভুত দৃশ্য। তার জানলার ঠিক নিচের তলায় একটা জানলা দিয়ে কি একটা বিশাল বস্তু যেন মাথা নীচু করে টিকটিকির মত পাথরের দেয়াল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একজন মানুষ আরে, কাউণ্ট ড্রাকুলা স্বয়ং। নিচে বিশাল গহ্বর। কিন্তু লোকটা একটা টিকটিকির মত চার হাত পা দেয়ালে ভর রেখে মাথা নীচু করে বেয়ে বেয়ে নামছে।

হায় ঈশ্বর! এ কোন দুর্গে এসে বন্দী হলো হার্কার? একি স্বপ্ন না সত্যি? সত্যি? একি মানুষ? ভয়, সাংঘাতিক ভয় এসে হার্কারকে গ্রাস করলো।

তিনদিনের মধ্যে আর একবার ঐ একই পদ্ধতিতে কাউণ্টকে জানালা দিয়ে নামতে দেখলো সে। এই অপূর্ব সুযোগ। জোনাথন হার্কার পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘরের দরজা একটু জোরে ধাক্কা দিতে খুলে গেল। ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। বহুকাল ব্যবহার হয়নি, তাই ধুলো পড়েছে।

শুরু হলো বিপদের সূত্রপাত। এত ঘুম এলো চোখে যে কাউণ্টের সাবধান বাণী ভুলে গিয়ে কাউণ্ট একটা সোফায় শুয়ে পড়লো।

একটু ঘুমও বোধহয় হয়েছিল। একটু বাদে চোখ মেলে দেখে ঘরের এককোণে রূপসী তিন যুবতী দাঁড়িয়ে। হার্কার অনড় হয়ে পিটপিট করে ঐ তিন তন্বীকে লক্ষ্য করতে লাগলো। দুটি মেয়ের গায়ের রং শ্যামবর্ণ, নাক ঠিক কাউণ্টের মত খড়্গনাসা। চোখ দুটি লাল, তীব্র ও তীক্ষ্ণ। অন্য মেয়েটি ফর্সা, মাথায় সোনালী চুল। চোখের তারা দুটি নীল তারার মত জ্বলছে। তিনটি মেয়েরই রক্তের মত লাল ঠোঁট আর মুক্তোর মত সাদা দাঁত।

এদের গড়নে এমন একটা ভাব ছিল যেটা লক্ষ্য করে তার গা ঝিনঝিন করা ভয় জেগে উঠলো।

তিন তরুণী নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলো—লোকটা যুবক ও শক্তি আছে। আমরা সবাই ওকে চুমু দিতে পারি। যা, তুই প্রথমে যা। আমরা তোর পেছনে যাচ্ছি।

ফর্সা মেয়েটি এগিয়ে এলো।

অবৈধ এক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে হার্কার ঘুমের ভান করে চুপ করে শুয়ে রইলো।

মেয়েটি তার মুখের কাছে মুখ আনতেই একটা গরম নিঃশ্বাস অনুভব করে জোনাথন হার্কার। একটা বিশ্রী টাটকা রক্তের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। মেয়েটি তার ঠোঁট দুটি একবার জিভ দিয়ে চেটে নিল। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতগুলো দেখা যেতে লাগলো। মুখের ওপর থেকে মুখটা নেমে এলো চিবুকে, তারপর আরো নেমে দাঁড়ালো গলায়। মেয়েটির ঠোঁট এসে স্পর্শ করলো হার্কারের কণ্ঠনালী, ধারালো দাঁতের ছোঁয়া অনুভব করল। একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, বিশ্রী শিহরণ। মেয়েটির ঠোঁট ভিজে, জিভ যেন শ্বাপদের মতো লকলক করছে, কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে দাঁতগুলো। কাঁপা মুখটি ওর কণ্ঠ একবার ছুঁয়ে আবার উঠছে, আবার নামছে।

ভয়, আতঙ্ক, উত্তেজনা ও আবেশ এসে একসঙ্গে ঘিরে ধরলো হার্কারকে। আর ঠিক সেই সময় কাউণ্ট ড্রাকুলা স্বয়ং ঘরে এসে ঢুকলো।

বাঘের মত থাবাওয়ালা হাত দিয়ে এক ঝটকায় মেয়েটির শীর্ণ কণ্ঠ ধরে আমার কণ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। তারপর সবাইকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে গর্জে উঠলো—তোমাদের এতবড় সাহস, একে স্পর্শ করেছো। আমি তোমাদের বারণ করে দিয়েছি। তবু তোমরা আমার কথা অমান্য করেছো। যাও, এই মুহূর্তে তিনজনেই এখান থেকে চলে যাও।

অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে মেয়ে তিনটি হেসে উঠলো। ঘরের এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে আছড়ে পড়লো।

আগের চেয়ে আরো নীচু স্বরে কাউণ্ট বললো, বেশ তোমাদের কথা দিচ্ছি। আমার কাজ মিটে গেলে তোমরা ওকে যত পারো চুম্বন করো। এখন সব যাও। ওর সঙ্গে আমার অনেক কাজ আছে। ওকে এখন জাগিয়ে দেবো।

—তাহলে আজ রাত্রে আমরা উপোস থাকবো। বলেই একটি মেয়ে হাসতে হাসতে কাউন্টের হাতে ঝোলানো ব্যাগটার দিকে তাকালো। ব্যাগের মধ্যে জিনিসটা এমনভাবে নড়ছে, মনে হয় কোন জীবন্ত প্রাণী।

কাউন্টের সম্মতি পেয়ে ব্যাগের ওপর মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং খুলতেই শিশুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শোনা গেলো।

হার্কার চোখ পিটপিট করে দেখলো, জানলার বাহিরে জ্যোৎস্নালোকে আবছা তিনটি মূর্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সঙ্গে নিয়ে গেলো সেই শিশু ভরা ব্যাগটা। রক্তমাংসের শরীর এইসব ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও ঘটনা কতক্ষণ সহ্য করতে পারে। জ্ঞান হারালো হার্কার।

*　　　　*　　　　*

জ্ঞান ফিরতেই দেখলো নিজের ঘরে শুয়ে আছে। আর কাউন্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। এখন কেবল মৃত্যুর জন্য দিন গুনতে হবে নয়তো পালাবার জন্য ফন্দী আঁটতে হবে।

১৯শে মে কাউন্ট তাকে দিয়ে বড় অদ্ভুত পত্র লেখালো। তারিখ দিলো ১২ই, ১৯শে এবং ২৯শে জুন। প্রথমটিতে লেখা হলো—সে ভালো আছে, কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যাবে। দ্বিতীয়টিতে—আগামীকাল সে রওনা দিচ্ছে এবং সবশেষে লেখা হল—আমি দুর্গ ত্যাগ করে বিসট্রীজ নামক স্থানে এসে পৌঁছেছি।

জোনাথন হার্কার বোকার মত লিখে গেলো, বাধা দিলো না। সে বুঝতে পেরেছে, মৃত্যু তার আসন্ন। এসব পত্র তার মৃত্যুর পরে ছাড়া হবে। এবং লণ্ডনের সলিসিটার ও আত্মীয়স্বজনরা জানবে যে কাউন্ট ড্রাকুলার ওখান থেকে দেশের পথে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। কাউন্ট নির্দোষ।

নয় দশ দিন বাদে স্বদেশে একটা খবর পাঠাবার সুযোগ এলো। একদিন সকালে হার্কার দেখলো একদল সিজগানি (জিপসী) এসে তাঁবু গেড়েছে দুর্গ চত্বরে। এদের নির্দিষ্ট কোন থাকবার জায়গা নেই। সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এদের হাবভাব আলাদা।

একটি চিঠি সলিসিটারকে, আর একটা মীনার উদ্দেশ্যে লিখলো। মীনারটা শর্টহ্যাণ্ডে লিখলো। এখানকার ভয়াবহ ঘটনার কথা কিছুই জানালো না। তাহলে মীনা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেবে।

এর মধ্যেই জিপসীদের দু'একজনের সঙ্গে হার্কার আকার ইঙ্গিতে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল।

হার্কার ওদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে, এই চিঠিগুলো যেন কোন ডাকে ফেলে দেয়। ওপর থেকে পত্রগুলো এবং একটা স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিয়েছে হার্কার জিপসীদের। জিপসী লোকটা চিঠি আর স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে কোমর বাঁকিয়ে টুপি খুলে অভিবাদন জানালো হাসিমুখে। তারপর ওগুলো টুপির মধ্যে মাথায় রেখে দিল।

চিঠি দুটো নিয়ে হাকার নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। আধঘণ্টার মধ্যে ঘরে এসে ঢুকল ড্রাকুলা। হাতে তারই লেখা চিঠি দুটি। চমকে উঠলো হার্কার। কাউন্ট বললো—জিপসীটা চিঠি ফেরত দিয়েছে। একটা পত্রে সলিসিটার পিটার হকিন্সকে উদ্দেশ্য করে আর অন্যটি—রাগে মুখ লাল হয়ে উঠলো কাউন্টের। শর্টহ্যাণ্ডে লেখা মীনার পত্র দেখে বললো—আমার আতিথেয়তার প্রতি চরম অপমান—ফায়ার প্লেসের আগুনে পত্র দুটি ছুঁড়ে দিতেই নিমেষের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। এরপর কাউন্ট ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন দেখা গেল ঘরে একটা কাগজও নেই। এমনকি এখানে পড়ে আসার স্যুটও উধাও। ড্রাকুলাই সরিয়ে রেখেছে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি মারলো হার্কার। বিরাট দুটো গাড়ি এসেছে চৌকোনা অজস্র বাক্স দিয়ে। চালক দুজন জিপসী।

এরপর জানলার ফাঁকের নীচের দিকে তাকাতেই তার চোখ স্থির হয়ে গেলো। টিকটিকির মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে নামছে ড্রাকুলা আর গায়ে তারই স্যুট। এবার স্যুট অন্তর্ধান হওয়ার রহস্যটা। কাঁধে ঝুলছে সেদিনকার সেই ভয়ঙ্কর ব্যাগটা। বোঝা গেলো আজও দানব নতুন শিকারের সন্ধানে যাচ্ছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হার্কার লক্ষ্য করলো, অন্ধকারের মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র আলোর স্ফুলিঙ্গ দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে একপাল কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। আলোক বিন্দুগুলো যেন নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। অবশেষে সেই ভুতুড়ে আলো তিনটি সেদিনের দেখা তিনটি মেয়েতে পরিণত হয়ে এগিয়ে আসছে। হাকার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরের এক কোণে ছুটে গেলো।

কয়েক ঘণ্টা পরেই ড্রাকুলার ঘর থেকে একটি শিশুর প্রবল চীৎকার দপ করে

উঠে সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেলো। তাহলে......তাহলে কি......হার্কার আর ভাবতে পারলো না।

প্রায় সেই মুহূর্তে নিচের প্রাঙ্গণ থেকে একটি নারীর মরাকান্না শুনতে পেয়ে হার্কার ছুটে যায় জানলার কাছে। একটি স্ত্রীলোক, এলোমেলো তার চুল, বুক চাপড়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। ওকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললো—এই শয়তান, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে। দে রাক্ষস।

পাগলের মত দাপাদাপি করতে লাগল স্ত্রীলোকটি। কাউন্ট ড্রাকুলা একটা বিকট চীৎকার করে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের বনের নেকড়েরা বীভৎস গর্জন করে সাড়া দিলো। এগিয়ে এলো তারা দুর্গ প্রাঙ্গণে। অবশেষে স্ত্রীলোকটির একটি শেষ আর্তনাদ উঠে মিলিয়ে গেল অনন্ত নিস্তব্ধতায়। হার্কার যেমন দুঃখ বোধ করলো তেমনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। পুত্রশোকের দারুণ কষ্ট থেকে নেকড়ের পেটে যাওয়া অনেক ভাল।

এখন যেভাবেই হোক পালাতে হবে। দরজা বন্ধ। তাই কাউন্ট যেভাবে জানলা বেয়ে নামে সেরকমভাবে সে জানলা পথে কাউন্টের ঘরে এসে হাজির হলো। ঘরের এককোণে শত শত বছর আগেকার নানা ধরণের অনেক স্বর্ণমুদ্রা পড়ে আছে।

সেই ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়ে ঘোরানো একটা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো হার্কার। তারপর স্যাতসেঁতে মাটির দুর্গন্ধ ভরা একটা সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ পথে এসে হাজির হলো সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে গাড়িতে আনা সেই চারকোনা বাক্সগুলি মাটি ভর্তি হয়ে পড়ে আছে।

এবার বিস্ময়ে আতঙ্কে বিস্ময়াভিভূত হবার পালা হার্কারের। এরকম অবস্থায় পড়লে যে কোন মানুষ জ্ঞান হারাতো। সাহস ও শক্ত মনের হার্কার দেখলো, ঐ বিশাল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে কাউন্ট ড্রাকুলা নিজে। হয় সে মৃত নয়তো ঘুমন্ত। কিন্তু তার পাথরের মতো স্থির চোখ দুটি খোলা। গাল দুটি দেখে মনে হয় জীবিত লোকের গাল। ঠোঁটে রয়েছে রক্তের আভা। কিন্তু দেহ ঠাণ্ডা, নাড়ী নেই, বুকের স্পন্দন থেমে গেছে। একটা নীল ঘৃণা মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

সেখান থেকে কাঁপতে কাঁপতে হার্কার ফিরে এলো নিজের ঘরে, একমনে ভাবতে বসলো। এখন কি করা যায়। এক মারাত্মক মৃত্যুপুরীতে সে বন্দী। পালাতে হবেই, নয়তো অপঘাতে অনতিবিলম্বে মৃত্যু নিশ্চিত। আর এর মধ্যে

হয়তো চিঠি তিনটে তাকে দেওয়া হয়েছে। সবাই জানবে জোনাথন হার্কার ড্রাকুলা প্রাসাদ থেকে নিজের দেশের দিকে রওনা হয়েছে।

পরদিন ভোরে ড্রাকুলার উপস্থিতি আবার তাকে নতুন করে চমকে দিলো। বললো—বন্ধু, এবার তোমার দেশে ফেরার পালা। কাল সকালে তৈরী থেকো। বর্গো পাস পর্যন্ত আমার গাড়িতে গিয়ে বিসস্ট্রীড-এর চলতি গাড়িতে উঠিয়ে দেবে।

হার্কারের সন্দেহ হল—আজ নয় কেন? কাউন্ট মৃদু হেসে বললো—বেশ তো, আজই চলো। ওরা নিচে নেমে এলো। বড় গেট ফাঁক করতেই দেখা গেল লোভী হিংস্র নেকড়ের দল হাঁ করে শিকার পাবার লোভে সগর্জনে চিৎকার করছে। না না, আজ থাক। কালই যাব। হার্কার নিজের ঘরে ফিরে এলো। তিন রমণীর ফিসফিসানী বাইরে শোনা গেল।

তারপরেই কানে এলো ড্রাকুলার কণ্ঠস্বর—অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। আজ রাত আমার। কাল তোদের। পরক্ষণেই খিলখিল হাসির শব্দ।

শুনে হার্কারের রক্ত জমে যেন বরফ হয়ে গেলো। হে ঈশ্বর, মৃত্যুমুখী এই পাতককে তুমি দয়া করে ক্ষমা করো, সাহায্য করো। বিদায় আত্মীয়-পরিজন। বিদায় মীনা!

পরদিন আবার সেই কবরখানার সেই ভল্টে এসে দাঁড়ালো। বড় বাক্সটার ডালা বন্ধ। কিন্তু পেরেক ঠোকা হয় নি। একটান মারতেই ডালা খুলে গেল। আবার চমকে উঠলো হার্কার।

যেমন কি তেমনভাবে শোয়ানো রয়েছে ড্রাকুলার দেহ। কিন্তু সে যেন যুবকে পরিণত হয়েছে। ঠোঁট দুটি টাটকা রক্তে রাঙা। ঐ রক্ত গাল বেয়ে গলায় ও বুকে গড়িয়ে পড়েছে। দরজার তালা খুলবার জন্যে চাবি খুঁজে বেড়ালো নিথর নিস্পন্দ দানব দেহের সর্বাঙ্গে। না, চাবি নেই। কাউন্ট যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। ঐ দেখে রাগে দুঃখে রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো হার্কারের। এই রক্তচোষা দানবটাকে সে কিনা সাহায্য করতে এসেছে লণ্ডনে নিয়ে যাবার জন্যে। পাশে পড়ে থাকা একটা শাবল তুলে নিয়ে শায়িত ড্রাকুলার মুখে সজোরে আঘাত করলো? সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখটা ফিরিয়ে নিল কাউন্ট, হার্কারের দিকে সোজাসুজি তাকাল। সেই চোখে ঝরে পড়ছে সাংঘাতিক ঘৃণা। এ দৃশ্য দেখে হার্কারের দেহ অবশ হয়ে গেল। হাত থেকে পড়ে গেল শাবলটা আর তারই ধাক্কায় ডালাটা পড়ে গিয়ে কাউন্টের বীভৎস মুখটা সমেত ঢাকা পড়ে গেল।

হার্কার প্রাণ নিয়ে পালালো। উপরে উঠতেই বাইরে গাড়ির শব্দ। তারপর দরজায় তালা খোলার আওয়াজ। ঠুক ঠুক বাক্সগুলির ডালা বন্ধ হওয়ার শব্দ। অবশেষে গাড়িতে বাক্সগুলো যেন তোলা হল। আবার দরজায় চাবি পড়লো। গাড়ি ছুটলো। এদিকে হঠাৎ একটা দমকা ঝড়ের মত বাতাসে সিঁড়ির উপরের একটা দরজা বন্ধ হয়ে হার্কারকে উদ্ভট একটা স্থানে বন্দী করে দিলো।

এদিকে ইংলণ্ডে বসে মীনা মারে ভাবছে আর দিন গুণছে কবে ফিরে আসবে জোনাথন হার্কার। এই মেয়েটির সঙ্গে জোনাথনের বিয়ে হবার কথা। মীনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী লুসি ওয়েস্টেনরার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা আছে এক ধনী যুবকের সঙ্গে। নাম আর্থার হোমউড ।

হুইউতী বন্দরে লুসিদের বাড়ীতে এসে উঠেছে মীনা। প্রাচীন বন্দর, শহরও প্রাচীন। প্রাচীন কবর রয়েছে এখানে। বেশীর ভাগ নাবিক বা সমুদ্র ফেরা মানুষ মনের ; বেশ কিছু অপঘাতে মরা মানুষের কবর রয়েছে ওখানে। একদিকে রয়েছে একটি পাগলা গারদ। সেখানকার ডাক্তার জন সিওয়ার্ডের সঙ্গে লুসী ও তার মায়ের বিশেষ পরিচয় আছে।

লুসীর এক অদ্ভূত রোগ রয়েছে। সে ঘুমের মধ্যে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। ইংরেজীতে একে বলে স্লিপ ওয়াকর। ভারী বাজে অসুখ। অজ্ঞান অবস্থায় যেখানে সেখানে এরা হেঁটে যেতে পারে। তারপর হঠাৎ জেগে উঠে ভয়ে আতঙ্কে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এদিকে পাগলা গারদের রেনফিল্ড নামের উনষাট বছরের এক রোগীর কাণ্ড-কারখানা দেখে ডঃ সেওয়াড কিছু অবাক হলো এবং চিন্তায়ও পড়লো। নিজের খাবার সে খেতো না। বড়ো বড়ো মাছি ছিল তার খাদ্য। তারপর সে ঠিক করলো মাকড়সা পুষবে। মাছিগুলো মাকড়সাদের খাইয়ে দিল। হঠাৎ খেয়াল হলো চড়ুই পাখী পুষবে। মাকড়সা খাইয়ে বেশ কয়েকটা চড়ুই পাখী ধরলো। তারপর বেড়াল পোষার নেশা উঠলো চড়ুই পাখীগুলো দিয়ে। কিন্তু এরই মধ্যে সে নিজেও কয়েকটা চড়ুই খেয়ে নিয়েছে। ডাক্তার বুঝলেন, এ শ্রেণীর খুনী পাগলেরা যত বেশী সংখ্যক প্রাণী মারতে পারে ততই তাদের দানবীর তৃপ্তি পায়। কাঁচা রক্ত, কাঁচা মাংসে এঁদের নেশা ধরে যায়।

*　　*　　*

ইংলণ্ডে জোনাথন ফিরে আসছে, চিঠি পেয়েছে মীনা। কিন্তু আজও ইংল্যাণ্ডে ফিরলো না। মীনা চিন্তিত।

হঠাৎ আকাশে ঝড় উঠেছে। উপকূলবর্তী জাহাজ ও নৌকা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। একটি রাশিয়ার জাহাজ বহুদূরে সমুদ্রের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথায় যাবে যে কিছুই ঠিক করা নেই। জাহাজের লোকগুলো কি পাগল হয়ে গেল। শুরু হলো তুফান। পাহাড়ের মত ঢেউ, প্রচণ্ড হাওয়ার ফোঁস ফোঁসানি, সমস্ত কিছুকে যেন ছনছ করে দিলো। এই ঝড়ের মধ্যেও দূরে সমুদ্রে ভাসছে সেই অদ্ভুত জাহাজটি।

হঠাৎ তীরভূমির দিকে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে এলো সেই জাহাজ। বন্দর থেকে তীব্র ফোকাশের আলো জাহাজের ওপর ফেলা হলো। একসময় জেটির থেকে কিছুটা দূরে বালির চড়ায় এসে আটকে গেল।

বন্দরের সব কর্মীরা ছুটে গেল সেদিকে। ফোকাশের আলোয় দেখা গেল সামনের হুইলে হাত বাঁধা অবস্থায় একটা মৃতদেহ আটকে থেকে দোল খাচ্ছে, আর একটা বিরাটাকার কুকুর জাহাজ থেকে লাফিয়ে তীরের উপর গীর্জার কাছের কবর স্তম্ভগুলির ফাঁক দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাহাজে কোন লোক জীবিত নেই। কেবল খোল ভর্তি কতকগুলো বড় বড় ...। যেন মাটি ভরা।

পরে জানা গেল, ঐ মৃত মানুষটি হল, রাশিয়ান জাহাজ 'ডিমিটার'-এর ক্যাপ্টেন। জাহাজটি ভার্মা থেকে হুইউবীই আসছিল।

মৃত লোকটির পকেটে পাওয়া ডাইরি থেকে জানা গেল এক লোমহর্ষক কাহিনী। জাহাজে ক্রু পাঁচজন, মেট দুজন, একজন পাচক ও ক্যাপ্টেন, এই ...জন মানুষ। সমুদ্র এগোতে এগোতে এক এক করে নাবিকেরা নিরুদ্দেশ হতে লাগলো। কজন দেখলো দীর্ঘাঙ্গ, সরু চেহারার একটা মানুষ ডেকের উপর ...য়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে প্রায় পাগল হয়ে উঠতে লাগলো নাবিকেরা। একে একে সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

একজন মেট খুব সাহসী ছিল। সেও ঐরকম লম্বা, ফ্যাকাশে পাংশুবর্ণের ছায়া মূর্তি দেখেছে। বললো, নিশ্চয়ই ঐ কাঠের বাক্সের মধ্যে এই রহস্য আছে। ক্যাপ্টেনের নিষেধ সত্ত্বেও সে শাবল ও লণ্ঠন নিয়ে নিচে নেমে গেল। শোনা গেল ডালা খোলার শব্দ। তারপরেই আর্ত চীৎকার করে উদ্ভ্রান্তের মত বাঁচাও বাঁচাও বলে ডেকের উপর উঠে এলো। ক্যাপ্টেন অপঘাতে প্রাণ দেবেন!

আসুন, ঐ সমুদ্রের জল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এক সময় সে লাফ দি
জলে পড়ে কোথাও হারিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন একা। অশরীরী এক দীর্ঘাঙ্গ মানুষও আছে। ক্যাপ্টেন হুই
ধরে বসে রইলো। জাহাজ বন্দরে তুলতেই হবে। পরে ঝড় আসতেই নিজে
হাতদুটোকে হুইলের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে
আর বইছে না···হে ঈশ্বর বাঁচাও। একটি ক্রুশদণ্ড এবং জপের মালার একখণ্
বস্তু হাতের বন্ধনের সঙ্গে জড়িয়ে দিল। যতক্ষণ এগুলো আছে, ততক্ষণ কে
অশরীরী তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

মিছিল করে সমাধিস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ। অন্যান্যে
মত মীনা ও লুসিও এ দৃশ্য দেখলো। লুসি যেন বেশী বিচলিত হলো। কেম
সাংঘাতিক অবস্থা ও চাঞ্চল্য দেখা দিল তার মধ্যে।

লুসির ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যেসটা যেন আবার জেগে উঠেছে
মীনা সাবধান হয়ে ঘরের খিল দিয়ে রাখে। লুসির মা মিসেস্ ওয়েস্টেমরার
খুবই ভাবিত হয়ে পড়েছেন তার মেয়ের জন্য। সামনের শরতে লুসির বিয়ে হবে
লর্ড গডালমিং-এর একমাত্র সন্তান আর্থার হোমউডের সঙ্গে। সম্প্রতি বাবা
অসুখের খবর পেয়ে দেশে গেছে।

মাঝরাতে হঠাৎ একদিন মীনার ঘুম ভেঙে গেল। লক্ষ্য করলো লুসির বিছান
ফাঁকা। সে ঘুমের ঘোরে হেঁটে দরজা খুলে কোথায় বেরিয়ে গেছে। লুসি
মাকে কিছু না জানিয়ে বাড়ীর সব ঘরগুলি খুঁজলো। না, কোথাও নেই। মীন
আতঙ্কে পাগলের মত খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। নিশুতিরাত
সেন্ট মেরী গীর্জার সেই বিশেষ বেদীটার উদ্দেশ্যে যেখানে সে ও লুসি একসঙ্গে
প্রায়ই বসতো ও বসতে ভালবাসতো। সেইদিকে হাঁটতে লাগলো মীনা
সত্যিই তাই, লুসি বেদীর ওপর শুয়ে আছে। আরে ওটা কি? মীনা চমকে
ওঠে। লুসির দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে ওটা কি? ওটা কি কো
ছায়া?

চীৎকার করে ডাকলো লুসির নাম ধরে। উপুড় হয়ে থাকা ছায়াটা এবার
মুখ তুলে তাকালো। সাদা মুখ ও রক্তবর্ণ চোখ। মীনা দৌড়তে দৌড়তে যখ
বেদীটার কাছে এসে দাঁড়ালো তখন দেখলো লুসি হেলান দিয়ে শুয়ে আছে,
ফ্যাকাসে তার মুখ। কিন্তু ওর ওপর যেটা ঝুঁকে পড়েছিল সেটা তো নেই।
কোথায় গেল সেটা? এবং কি ওটা?

মীনা দেখলো, লুসি যেন তখনও ঘুমুচ্ছে। শীতে কাঁপছে। নিজের গায়ের শাল জড়িয়ে দিলো ওর গায়ে। লুসি ঘুমের ঘোরেই নিজের কণ্ঠে হাত ছুঁইয়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো। নিজের জুতো খুলে বান্ধবীর পায়ে পরিয়ে দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিলো। জেগে উঠে লুসি তেমন বিস্ময় প্রকাশ করলো না। সে যে কোথায় আছে বুঝতেই বুঝি পারলো না। কম্পিত দেহ নিয়ে বান্ধবীর হাত ধরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

বাড়ী ফিরে দরজায় তালা দিয়ে মীনা নিজের কাছে রেখে দিলো। ততক্ষণে লুসি নিজের বিছানায় শুয়ে আবার গভীর ঘুমে ডুবে গেলো। মীনাকে লুসি এর আগে অনুরোধ করেছিল যেন সে রাত্রের ঘটনা প্রকাশ না করে।

পরদিন লুসিকে খুব ভাল ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। পোশাক পাল্টাবার সময় দেখা গেলো তার গলায় দুটো পিন ফোটানোর দাগ আর তার নাইট গাউনে এক বিন্দু শুকনো রক্ত লেগে আছে।

পরদিন বেশ ভালই কাটলো দুই বান্ধবীতে। আবার অন্যদিনের মত দরজায় তালা দিয়ে নিজের কাছে চাবি নিয়ে ঘুমোলো মীনা। রাত্রে দুবার বাইরে বেরোবার জন্য লুসি ঘুমন্ত অবস্থায় দরজার কাছে এসেছে। কিন্তু বাধা পেয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন ঘটলো এক সাংঘাতিক ঘটনা। মীনা নিজের চোখে সেটা দেখলো। অন্যান্য দিনের মতো দরজায় চাবি দিয়েছিল মীনা। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙতেই মীনা দেখে, লুসি বিছানায় উঠে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। মীনা উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই এক ঝলক চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়লো।

একটা বিরাটাকায় বাদুড় বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে একবার কাছে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর মীনাকে লক্ষ্য করে ভীত হয়ে বন্দরের দিকে উড়ে চলে গেলো। মীনা জানালা বন্ধ করে দিলো। ততক্ষণে লুসি আবার বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

পরদিন বেড়াতে বেড়াতে লুসি যেন আপনমনেই একটা অদ্ভুত কথা বললো—আবার তার সেই লাল চোখ। ঠিক তেমনটি, আগের মত।

লুসির শরীর খারাপ। তাই সে আগেই শুয়েছিল। মীনা বাগানে পায়চারি করছিল। জোনাথনের জন্যে তার মন ভারাক্রান্ত। এমন সময় দেখে, লুসি জানালার বাইরে মাথা বের করে রয়েছে। আরে ও তো ঘুমিয়ে রয়েছে।

চোখ বোজা। সর্বনাশ ওটা কি। পাখীর মত বিশাল চেহারার একটা জীব ওরই মুখের গোড়ায় বসে আছে। মীনা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সেই জীবের আর চিহ্নও দেখতে পেলো না।

পরদিন লুসির মা মীনাকে একটা গোপন খবর জানালো। ভালোয় ভালোয় লুসির বিয়ে হয়ে গেলেই বাঁচোয়া। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছে, ওর হার্ট এত বেশী দুর্বল ও জখম হয়ে গেছে যে, যেকোন আঘাতেই সেটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লুসির আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস।

দিন দিন লুসি ক্লান্ত ও ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগলো। তার লাল গাল দুটো হলদে রঙে পরিণত হয়েছে। মীনা দেখলো ঘুমন্ত লুসি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক মত নিতে পাচ্ছে না, হাঁপাচ্ছে। তার গলার সেই সবচেয়ে বিন্দুর মত ক্ষতটা মীনা দেখলো। এখনো শুকোয়নি। ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।

এর মধ্যে সেই অভিশপ্ত জাহাজে করে আসা মাটিতে ভর্তি কাঠের পঞ্চাশটি বাক্স পারফ্লিটের কাছে কারফ্যাকস নামক প্রাচীন দুর্গের সকল বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ঘুমের মধ্যে হাঁটবার সময় লুসি যে বিচিত্র স্বপ্ন দেখে সেটা সে মেনে নিলো। সে যেন মাঠঘাটের উপর দিয়ে আকাশ পথে উড়ে যায়। অজস্র কুকুরের চীৎকার কানে আসে। লম্বা দীর্ঘ কালো রক্ত লাল চোখওয়ালা একটা কিছু চোখের ওপর অস্পষ্ট ভাসে। সে এক দিকে আনন্দ পায় আবার একদিকে বিরক্তি বোধ করে।

এর মধ্যে মীনার কাছে একটা চিঠি অদ্ভূত খবর বয়ে নিয়ে এলো। সুদূর বুদাপেস্টের সেণ্ট জোসেফ ও সেণ্ট মেরী হাসপাতালের জনৈক সিস্টার আগাথা লণ্ডনের সলিসিটার মিঃ হকিন্স-এর কেয়ার অফ-এ মীনাকে এক পত্রে জানিয়েছে— জোনাথন হার্কার যেন কিভাবে ভুগছে এবং তাদের ওখানে চিকিৎসাধীনে আছে। এখন একটু সুস্থ। মীনা যেন তাড়াতাড়ি সেখানে চলে আসে। হার্কার ক্লউসেমবার্গ থেকে পাগলের মত ট্রেনে করে চলে আসছে। সে বিকারের ঘোরে কখনও নেকড়ে, কখন বিষ-বিধ, রক্ত, খুন, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বলে চিৎকার করতে থাকে। খুব সম্ভব যুবকটি মনের দিক থেকে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে।

কোন আঘাত বা ভয়াবহ শক থেকে ওকে বহুদিন দূরে রাখতে হবে। এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আর কয়েক সপ্তাহ লাগবে।

সেই সঙ্গে সলিসিটার মীনাকে একটি পত্রে লিখেছে—সে যেন এক কাপড়ে চলে আসে। তার বুদাপেষ্ট যাবার সব ব্যবস্থাই করা আছে। তিনি এটাও আভাস দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে তারা দুজনে (মীনা ও জোনাথন) এখানে বিবাহ করে মিলিত হতে পারে।

* * *

রেনফিল্ডের হালচাল দেখে ডঃ সেওয়ার্ড অবাক হয়ে গেলো। পাগলটির আর ইঁদুর, চড়ুই-এর উপর কোন লোভ নেই। চুপচাপ শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে আছে। কারোর সঙ্গে কথা বলছে না। কেমন প্রফুল্ল হয়ে নিজের মনেই বলছে—আমি আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমি কাউকে চাই না। প্রভু এসে গেছেন ?

এক রাত্রে শোনা গেল রেনফিল্ড জানালা ভেঙে পালিয়েছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ও ডাক্তার ছুটলো। চাঁদের আলোয় দেখা গেল মাঠের ওপর দিয়ে শ্বেতশুভ ছায়ার মত রেনফিল্ড ছুটছে। তারপর কোন দিকে দৃকপাত না করে খুব উঁচু এক দেয়াল উপচে মুহূর্তে কারফ্যাক্স নামক পরিত্যক্ত বাড়ির চত্বরে ঢুকে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মই বেয়ে লোকজন ওপরে গিয়ে দেখলো গীর্জার কবরখানার বিরাট ওকের দরজার কাছে মাথা রেখে কি যেন ফিসফিস করে বলছে।

একটু আড়াল থেকে ডাঃ সেওয়াড শুনতে পেলো রেনফিল্ড বলছে—আমি আপনার আদেশ পালন করতে এখানে এসেছি প্রভু। আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস। আমি আপনাকে বহুদিন ধরে পূজো করে আসছি। এতদিন দূরে ছিলেম, এবার কাছে এসেছেন।

রেনফিল্ডকে অতর্কিতে ধরে নিয়ে আবার গারদে পুরে হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। তখনও সে সমানে বলে চলেছে—আমি অপেক্ষা করবো। ঐ আসছে, আসছে।

* * *

মীনার মাথায় দুশ্চিন্তা এসে ভীড় করলো। ঐ অবস্থায় সে বুদাপেষ্টের হাসপাতালে গিয়ে পৌছোলো। জোনাথনের বিশ্রী চেহারা দেখে মীনা ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। আগেকার কোন কথা তার মনে নেই, সেটা মীনাকে সে জানালো। জোনাথন রোগা হয়ে গেছে, ছাইয়ের মত পাংশুটে গায়ের রঙ। জোনাথনের ইচ্ছায় হাসপাতালের বিছানায় বসে পাদরীর সাহায্যে জোনাথন বিয়ে

করলো মীনাকে। বিয়ের পর সে স্ত্রীকে একটি নোট বুক দিল। তাতে অনেক কিছু লেখা। মীনা সেটা খুললো না, দেখলেও না। ভালো করে বেঁধে গালা লাগিয়ে সীল করে রেখে দিলো।

মীনা তার বান্ধবী লুসিকে বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি দিলো। লুসির চিঠির জবাব পাঠালো। সে ভাল আছে। আর্থার তার কাছে ফিরে এসেছে। তার আর ঐ অসুখটা বেশী একটা হয় না। ২০শে সেপ্টেম্বর মানে আর মাত্র এক মাস বাদে সে আর আর্থার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

* * *

বেশ কিছুদিন ভদ্রভাবে কাটালো রেণফিল্ড। তারপর একদিন আবার পালালো সে। সেই চ্যাপেলের দরজায় গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলছে। অর্তকিতে তাকে ধরা হলো। সে বাধা দিলো না, শান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঐদিক লক্ষ্য করে সবাই দেখলো; চাঁদের আলোয় বিরাট একটা বাদুড় সোজা একদিকে উড়ে যাচ্ছে। অবাক কাণ্ড, ঐ বাদুড়টার সঙ্গে রেণফিল্ডের কোন অদৃশ্য যোগ আছে নাকি? নয়তো ওটার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো কেন?

আবার এর আগে দেখা গেছে, রাত্রে সে শান্ত। কিন্তু দিনের বেলা তার মূর্তি পাল্টে যেতো। সন্ধ্যা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সে চুপ করে থাকতো। তবে কি সূর্য বা চাঁদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে?

* * *

হুইটবী থেকে লুসি হিলিংমামে গেছে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য। তার মনে হচ্ছে, ফুসফুসে কিছু একটা হয়েছে। অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুঃস্বপ্ন দেখছে অনর্গল। কিন্তু মনে রাখতে পারে না। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে শুনতে পেলো জানলার ফাঁকে কি যেন আঁচড়াচ্ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

লুসিকে একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্যে অনুরোধ করলো আর্থার হোমউড বন্ধু ডাঃ সেওয়াডকে। কিন্তু বাবার অসুখের জন্য আর্থার বাড়ি চলে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে লুসির কোন ধরতে পারলো না। রক্তশূন্যতা তাও নয়। অথচ মেয়েটা দিন দিন শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানসিক ব্যাধি নয়তো। ভ্যান্ হেলসিংগ লুসিকে পরীক্ষা করে ডাঃ সেওয়ার্ডকে জানালো, এর সাধারণ রোগ নয়। এর সঙ্গে জীবন-মরণের সম্পর্ক জড়িত।

এরপর লুসি কদিন ভাল হইল। কিন্তু অকস্মাৎ ভয় পাওয়ার মত আকৃতি হলো তার। বিছানার সঙ্গে মিশে গেল তার দেহ। ডাঃ হেলসিংগ জানালেন, এখুনি রক্ত দরকার। কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। আর্থার হোমউডের রক্ত নিয়ে লুসিকে দেওয়ায় সে একটু সুস্থ হলো॥ কিন্তু তার গলায় দুটো ক্ষতের চিহ্ন দেখে অধ্যাপক চিন্তিত হলেন।

ওদের দুজনকে লুসির ওপর রাতদিন নজর রাখার আদেশ দিয়ে ডাঃ হেলসিংগ আমস্টারডামে চলে গেলেন। রাত্রি জেগে ডাঃ সেওয়ার্ড ক্লান্ত হওয়ায় লুসির অনুরোধে পাশের ঘরে গিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। পরদিন ডাঃ হেলসিংগ ফিরে এসে লুসিকে দেখে চমকে উঠলেন। আবার মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে লুসির শিয়রে। বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ, তা আছে। কিছু ব্রাণ্ডি খাইয়ে আবার তাকে রক্ত দেওয়া হলো।

পরদিন ডাঃ হেলসিংগের নামে ওদের বাড়ী আসা পার্শেলে ছিল ফুলের মত রসুন, আসলে একরকম ওষুধ। এর কিছু জানালায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো, আর একটা মালা করে লুসির গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো। সারারাত জানালা খোলা রইলো। এর ফলে অশুভ প্রভাব থেকে লুসি পরিত্রাণ পাবে।

লুসির মা রাত্রে মেয়ের ঘরে এসে দেখে জানালা দরজা বন্ধ, রসুনের বিশ্রী গন্ধ। মেয়ের শরীর খারাপ হবে ভেবে মুক্ত বাতাসের জন্যে জানলা খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

এই সর্বনেশে ব্যাপার শুনে ডাঃ হেলসিংগ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। তার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। তাহলে কি ঐ অশুভ পৈশাচিক শক্তিরই জয় হলো? না, ডাঃ হেলসিংগ পরাজিত স্বীকার করলেন ঐ শয়তানের শয়তানির কাছে।

কুইনসে পি. মরিস লুসিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার দেহ রক্ত নিয়ে লুসির দেহে দেওয়ায় সে আপাতত সুস্থ হয়ে উঠলো।

*   *   *

লুসির এক ডাইরী থেকে জানা যায়, ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে সে আবার খুব দুর্বল ও ভীত বোধ করে। ডাক্তারের উপদেশ মত শোবার আগে জানলায় রসুন ছড়িয়ে দিয়ে শুতে যায়। জানলার কাচের ঝটপট শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। আবার ঘুমিয়ে পড়ে সেবারের মত বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার চোখে যেন রাজ্যের ঘুম। বাইরে কুকুরগুলো বীভৎসভাবে চীৎকার করে চলেছে।

জানলার কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখলো একটা বিরাট বড় বাদুড়। এমন সময় তার মা ঘরে আসায় লুসি একটু সাহস পায়। মা ও মেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বাগানে বিকট গর্জন। পরক্ষণেই জানলার কাঁচ কিসের আঘাতে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে। মা-মেয়ে চমকে ওঠে। একটা নেকড়ে জানলার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। মা মেয়ে জড়াজড়ি করবার সময় লুসির গলা থেকে রসুনের মালাটা ছিঁড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। মা প্রাণ হারিয়ে বিছানায় পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে লুসিও কেঁদে মায়ের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। ততক্ষণে বাইরে নেকড়ের ডাক মিলিয়ে গেছে।

একসময় জ্ঞান ফিরে এলো লুসির। পরিচারিকারা তার মায়ের সর্বাঙ্গে সাদা চাদর চাপা দিয়ে দিলো। বাইরে নেকড়েদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লুসির মনে হলো সে-ও হয়তো আর বাঁচবে না।

হেলসিংগ বিষাদ কাতর মুখে মুমূর্ষু লুসির দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে আপশোষের ভঙ্গিতে বললেন—হায়রে, মেয়েটা আর বাঁচবে না।

ঘরের ম্লান আলোতে দেখাতে লুসির ডাইনে বাঁয়ের দুটি দাঁত অন্যান্যগুলোর চেয়ে দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। লুসি চোখ মেলে আর্থার হোমউডকে ক্ষীণ কণ্ঠে কাছে যেতে ডাকলো। আর্থার ঝুঁকে পড়ে সেই তার প্রণয়িনীকে বিদায় চুম্বন দিতে গিয়ে বাধা পেলো। আর্থার অতি দুঃখের মধ্যেও বিস্মিত হলো। ডাক্তার হেলসিংগ বললেন, মেয়েটির আত্মার এবং ছেলেটির জীবনের মঙ্গলের কারণে এখন মৃত্যুপথ যাত্রীনীকে স্পর্শ কবা উচিত হবে না।

লুসির মৃত্যু হলো। ডাক্তারের কঠিন মুখে ফুটে উঠলো চ্যালেঞ্জের ভাব। কম্পিত দেহে চীৎকার করে বললেন—না না, হার স্বীকার করলে চলবে না। অশুভ শক্তির কাছে কিছুতেই মাথা হেঁট করা উচিত নয়। এই সঙ্গে লড়াইয়ের সূত্রপাত।

*　　　　*　　　　*

কতগুলো কাঠের বাক্স নিয়ে, দুটো লোক একটা গাড়ি নিয়ে, যে বাড়ির মধ্যেকার চাপেল গীর্জার রেনফিল্ড পালিয়ে গিয়ে বসে থাকতো সেখানে ঢুকতে দেখে সে জানলা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এলো। রেনফিল্ড রেগে গিয়ে দুজনের একজনকে ধরে প্রায় মেরে ফেলবার দাখিল করলো।

তাঁর সহানুভূতি। বললেন—আমি জানি, ওর মৃত্যুতে তুমি খুব শোক

পেয়েছো। কিন্তু·····কিন্তু গভীরতর এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। পরে যখন আমি সব খুলে বলবো, তখন আমাকে তুমিও ধন্যবাদ দেবে। মৃত্যুপথযাত্রিনী লুসিকে বিদায় চুম্বন দিতে বাধা দিয়েছিলাম আর্থারকে। তোমরা দুজনেই তখন আমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলে। জেনে রেখো কঠোর কর্তব্যবোধে এবং একজন জীবিত মানুষকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার মানসেই আমি সেই আপাত নিষ্ঠুর কাজটি করেছিলাম।

·· আমি আজও যে কাজের কথা বলছি, সেটা হাজার হলেও বীভৎস, তবু আমাকে করতে হবে। এ কয়দিনে যেসব অলৌকিক রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে তার পরিণতি দেখতে চাই। মনে রেখো, আমাদের সামনে এখনও আরও ভয়াবহ ও আতঙ্কপূর্ণ দিন অপেক্ষা কর এবং অমঙ্গলকে দূরে ঠেলে রাখার জন্য সাহায্য কর।

ডাঃ সেওয়াড রাজি হতে ডাঃ হেলসিংগ তখনকার মত বিদায় নিলেন। গভীর রাতে ডাঃ সেওয়ার্ড দেখলেন বাড়ির একজন পরিচারিকা লুসির ঘরে ঢুকছে। হয়তো মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

পরদিন ডঃ হেলসিংগ এসে জানালেন, আর সব ব্যবচ্ছেদ করার দরকার নেই। কারণ তিনি যে ক্রশ চিহ্নটা মৃতা লুসির বুকে রেখেছিলেন সেটা রাত্রেই নাকি চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং সেই রাত্রে লুসির ঘরে যাওয়া এক পরিচারিকার কাছ থেকে সেটা পাওয়া যায়। এখন নাকি অপেক্ষা করতে হবে।

ডাঃ সেওয়ার্ডের এসবের মর্ম কিছুই বুঝলো না। ডাঃ হেলসিংগ চলে গেলেন।

আর্থার বিকেলে এলো। শোকে মর্মাহত। একদিকে তার বাবার মৃত্যু, অন্যদিকে ভাবী পত্নীর হঠাৎ মৃত্যু ওকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আর্থার মৃতা লুসির ঘরে ঢোকবার আগে ডাঃ সেওয়ার্ডের গলা জড়িয়ে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। দুজনেই লুসিকে ভালবাসতো। ঘরে ঢুকলো দুজনে। চাদরে ঢাকা লুসির মৃতদেহ। সেওয়ার্ড গিয়ে মুখের ঢাকা খুলে দিতেই লুসির নিষ্পাপ ফুলের মত সুন্দর মুখটি দেখা গেলো। তাজা ও উজ্জ্বল মুখাবয়ব দেখে ডাঃ সেওয়ার্ড বিস্মিত হলো।

লুসি যে মারা গেছে, সেটা আর্থার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। না, সত্যিই লুসি মারা গেছে। শেষ চুম্বন এঁকে দিলো লুসির কপালে। তারপর জলভরা চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আর্থার।

ডাঃ হেলসিংগ শুনে জানালেন, লুসির বর্তমান চেহারা দেখে তাঁর মনেও সন্দেহ জেগেছিল, জীবিত না মৃত।

আর্থার ডাঃ হেলসিংগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো।

ডাঃ হেলসিংগ বললো—আপনি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক এটা, তবে ভবিষ্যতে দিন আসবে যখন আমার এতাবৎ তিক্ত কাজের জন্য তখন আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন, অভিনন্দন জানাবেন। আমার আপনার সেওয়ার্ডের এবং মৃতা লুসির ভালর জন্যই আমি সব কিছু করেছি এবং এখনও চালিয়ে যাবো যতদিন না কার্য সিদ্ধি হয়।

……মৃতা লুসির যাবতীয় চিঠিপত্র ও কাগজপত্র আমি একবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে চাই। অবশ্য আপনার যদি সম্মতি থাকে। কারণ উইল অনুযায়ী আপনিই এখন লুসির মায়ের যাবতীয় সম্পত্তির মালিক।

—আমার কোন আপত্তি নেই।

—বেশ। জানি, আপান বুঝবেন। সর্বদা মনে রাখবেন জীবনে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে এবং দুঃখকে জয় করা সবচেয়ে বড় কাজ। স্বার্থপরতার শিখরে থেকে আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং দুঃখ-বেদনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে জয়ী হতে হবে। সে রাত্রে ডাঃ সেওয়াড ঘুমোলো কিন্তু ডাঃ হেলসিংগ অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে রইলো। সারারাত্রি সারা বাড়ি ধরে পায়চারি করে গেলেন।

*　　　*　　　*

এক্সেটারে মীনা তার স্বামীকে নিয়ে ফিরছিল। শহরে পৌছে ওরা হাইড-পার্কে হাত ধরাধরি করে কিছুক্ষণ ঘুরলো। বেশ ভালো লাগছিল ওদের। এমন সময় জোনাথনের সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে গেল। আর্ত চীৎকার করে উঠলো। মীনা দেখলো তার স্বামীর চেহারা ভয়ার্ত ও হলদে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মীনা লক্ষ্য করলো, জোনাথন একটি রোগা লম্বা লোকের দিকে তাকিয়ে আছে। খড়্গা নাক, কালো গোঁফ ছুঁচালো দাড়ি। ঝকঝকে সাদা দাঁত, ঠোঁট দুটি রক্তের মতো লাল। জন্তুর মতো তার দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ ও ধারালো।

—ঐ লোকটিকে দেখেছ? ওকে চেনো? জোনাথন প্রশ্ন করলো।

—না তো।

—ঐ হলো রক্তলোলুপ সেই পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা।

মীনার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো।

—কী আশ্চর্য লোকটা, যেন যুবক হয়ে গেছে। জোনাথনের মুখ দিয়ে যেন অজান্তে বেরিয়ে এলো।

গ্রীনপার্কে একটু বসে চিন্তিত মনে দু-জনে বাড়ী ফিরলো। এত বিরাট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েও ওদের মনে শান্তি নেই। লণ্ডনে কাউন্ট ড্রাকুলাকে দেখে হার্কারের বুক শুকিয়ে গেল এদিকে লুসি ও তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ লিখে চিঠি পাঠিয়েছেন ডাঃ ভ্যান হেলসিংগ। মীনাও দুঃখিত ও শোকাহত।

ইতিমধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বরের দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট-এর পরপর একই দিনের দুটি লোমহর্ষক এক সংবাদ বের হলো।

"হ্যাম্পস্টেডের এক রহস্য।"

স্থানীয় লোকেরা সাম্প্রতিক কতকগুলো নিদারুণ ও আতঙ্কপূর্ণ ঘটনায় ভীত হয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় বহু শিশু অভিভাবকদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। পরে তারা সবাই বাড়ী ফিরে আসে যখন তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে একটা করে ছোট্ট ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। শিশুরা নাকি একজন নারীর সঙ্গে গিয়েছিল।

এরপর পত্রিকাটি বিশেষ সংস্করণে জানিয়েছে, গত রাত্রে যে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল, তাকে আজ সকালে স্নুটারস হিল নামক স্থানের এক ঝোপের কাছে পাওয়া গেছে। তারও কণ্ঠে সেই ক্ষতচিহ্ন ছিল। এ শিশুর কাছ থেকে জানা যায়, একজন নারী তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

* * *

ডাঃ হেলসিংগের কাছ থেকে মীনা আর একটা চিঠি পেলো। তিনি জানিয়েছেন, মৃতা লুসির কাগজপত্র ঘেঁটে মীনার বহু তথ্য পান। তিনি লুসি ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা জানতে পেরেছেন। এবং তার স্বামী জোনাথন হার্কারের বিষয়ও ভালোভাবে জানতে পেরেছেন। এখন তিনি মীনার সাহায্য নিতে চাইছেন যাতে ভবিষ্যতে বহু মানুষকে সাংঘাতিক অশুভ এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে তিনি বাঁচাতে পারেন। ডাঃ হেলসিংগ এক্সেটারে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

মীনার সম্মতি পেয়ে ডাঃ হেলসিংগ ঘুরে গেছেন। ডাক্তারকে মীনার খুব ভালো লাগলো। মীনা স্বামীর ডাইরী পড়েছিল তাই সহজেই বিশ্বাস করলো।

ডাঃ হেলসিংগ ঐ ডাইরী পড়ে কাউন্ট ড্রাকুলারের প্রাসাদে থাকাকালীন সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানতে পারলেন।

ডাক্তারকে জোনাথনেরও খুব ভালো লেগেছে। কাউন্ট ড্রাকুলাকে জব্দ করার একমাত্র মানুষ সম্ভবতঃ উনি। ডাঃ হেলসিংগ ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত জোনাথন।

জোনাথন ডাক্তারকে স্টেশনে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। তখন একটা ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পত্রিকা কেনেন ডাঃ হেলসিংগ। পত্রিকার পাতায় চোখ দিতেই তাঁর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। মেইন গেট! মেইন গেট!! হাঁ ঈশ্বর। তারপর বললেন—আপনি যদি মনে করেন তাহলে মীনাকে নিয়ে শহরে চলে আসবেন।

এই বলে ডাঃ হেলসিংগ ট্রেনে উঠে বসলো।

উত্তেজিতভাবে ডাঃ হেলসিংগ পত্রিকাখানা ডাঃ সেওয়ার্ডকে পড়তে দিয়ে পড়লেন, এটা পড়ে দেখো।

দেখলো, এক্ষেত্রেও শিশুগুলির কণ্ঠে সেই সূক্ষ্ম মত চিহ্ন। মৃতা লুসির যেমন হয়েছিল ঠিক তেমন।

—দুটি ক্ষেত্রে একই কারণ রয়েছে। লুসিকে যে বা যারা আহত করেছে সে বা তারাই শিশুগুলিকে আহত করেছে জেনো। তোমার কি কখনো সন্দেহ হয়নি যে লুসির মৃত্যুর জন্য দায়ী কি এবং কে? কিসে তার মৃত্যু হয়েছিল?

—যে কোন অজ্ঞাত কারণে রক্তাল্পতা বা রক্তক্ষরণজনিত নার্ভাস প্রস্ট্রেশনে মৃত্যু হয়েছে।

—দেখ বন্ধু, সর্বদা চোখ কান সজাগ রাখতে হয়। পৃথিবীতে এমন সব ব্যাপার আছে এবং আকচার সংঘটিত হচ্ছে বা তুমি, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বিচার দিয়ে সমাধান করতে পারবে না। হয়তো ভাবতে পারবে না, তবু শুনে রেখো, আত্মা বিভিন্ন দেহকে আধাররূপে অবলম্বন করতে পারে, আত্মা কখনো বাস্তব স্থূলরূপ জীবনধারণ করতে পারে। আবার কখনো সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে পারে। এ বিশ্বে সম্মোহন বলে একটি বস্তু আছে, আর আছে অপরের চিন্তাপাঠের ক্ষমতা। আমার জীবন নষ্ট করে দিতে চাইছে। নিজেকে কিছুতেই তিলে তিলে শেষ হতে দেবো না। আমি আমার ও লর্ডের জন্য সমানে যুদ্ধ করে যাবো। এই বলে সে চেঁচাতে লাগলো। তারপর অনেক কায়দা করে আবার দানব শক্তির অধিকারী রেনফিল্ডকে ধরে গারদে পুরে দিলো।

* * *

এদিকে মীনা ও হার্কারের জীবনে এক নতুন পরিবর্তন এলো। তারা দেশে ফিরে এসে মিঃ হকিন্সের বাড়ীতেই উঠলো এবং মিঃ হকিন্স ওদের স্বামী-স্ত্রীকে একরকম পোষ্যই করে নিল। তারপর একদিন হঠাৎ মিঃ হকিন্স মারা গেল। উইল অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হল জোনাথন হার্কার ও মীনা হার্কার।

* * *

লুসি ও তার মায়ের সৎকারের দিন ধার্য্য হল এবং মা মেয়ের সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করার ভার পড়লো ডাঃ সেওয়ার্ড ও ডাঃ হেলসিংগের উপর।

ডাঃ হেলসিংগ লুসির বিছানার চারপাশে কতকগুলো রসুনের কোয়া ছড়িয়ে দিয়ে নিজের গলা থেকে একটা ক্রশ চিহ্ন খুলে লুসীর কপালের উপর রেখে দিল। তারপর আবার তার গায়ের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে দিল।

ডাঃ হেলসিংগ বললেন—আমি অস্ত্র দিয়ে মৃত মেয়েটির হৃৎপিণ্ড কেটে নেবো আর ওর মুণ্ডচ্ছেদ করবো। তুমি কেবল আমাকে একাজে সাহায্য করবে। আগে আর্থার এসে দেখুক তারপর। তবে মুশকিল আগে করা যাবে না। সমাধি পর্ব শেষ হলে তুমি ও আমি লুকিয়ে গিয়ে কফিন খুলে লুসির মুণ্ডচ্ছেদ করবো। আর হৃৎপিণ্ড খুলে নেবো।

ডাঃ সেওয়ার্ড প্রতিবাদ করে, কেন এই অকারণ যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ঠুরতা। কি লাভ এতে?

ডাঃ হেলসিংগ তাকালো ওর চোখের দিকে.....যখন অপরাপর মাকড়সারা অল্পেই মরে যায় তখন ভাবতো পারো কি করে স্প্যানিশ চার্চের সেই বিশাল আকারের মাকড়সটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে আছে এবং গীর্জার যাবতীয় প্রদীপের তেল খেয়ে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে? তুমি কি জানো, প্যাম্পাস এবং আরও অনেক জায়গায় রাত্রিবেলা বাদুড়রা এসে গরু জোড়াদের শিরা ফুটো করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নেয়।

—তাহলে কি প্রফেসর আপনি বলতে চান, লুসিও ঐরকম কোন বাদুড় দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে? এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই লণ্ডন শহরে এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য?

ডাঃ হেলসিংগ গম্ভীরভাবে নিজের মনে বলে চললেন—কেন কচ্ছপেরা মানুষের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত অতি সহজেই বেঁচে থাকে? জানো কোন কোন মানুষের ইচ্ছামৃত্যু আছে। শুনেছো কি অনেক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে তার ইচ্ছে মত

গর্ত খুঁড়ে তাকে সমাধি দেওয়া হয়। ওপরে শস্য ফলে বড় হয়, শস্য কাটা হলে পর একদিন মাটি সরিয়ে দেখা যায় সন্ন্যাসী মরে নি। সে আবার উঠে হেঁটে চলে বেড়ায় আগের মত।

ডাঃ সেওয়ার্ড মুগ্ধ বিস্ময়ে ডাঃ হেলসিংগের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে—প্রফেসর, আপনার কথা শুনতে আমি রাজি।

—তবে, আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ বন্ধু। শুনে রাখো, শিশুদের কণ্ঠে ক্ষতচিহ্নগুলি হয়েছে লুসিরই দাঁতের কামড়। বুঝলে ?

—সেকি ! তা কি করে সম্ভব ? ডাঃ সেওয়ার্ডের গলায় কথা বেরোয় না।

—বন্ধু, তুমি যেহেতু মেয়েটিকে ভালোবাসতে তাই একথা বিশ্বাস করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি যদি প্রমাণ চাও, তাহলে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে যাবে। পারবে যেতে ?

—কোথায় ?

—প্রথমে সেই বালকটিকে দেখতে যাবো। তিনি পকেট থেকে একটা চাবি বের করলেন। তারপর যেখানে লুসিকে সমাহিত করা হয়েছে সেইস্থানে। এ চাবি সমাধি ক্ষেত্রের। আর্থারকে দেবো বলে কফিন ম্যানের কাছ থেকে এটা জোগাড় করেছি।

প্রথমে ওরা হাসপাতালে গিয়ে বালকটিকে দেখলো। সত্যিই ছেলেটির গলায় লুসির মত একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

তারপর শেস রাত্রিতে ওরা পাঁচিল টপকে অন্ধকারের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে ওয়েস্টেনরাদের সমাধি স্তম্ভের কাছে গেল। চাবি দিয়ে দরজা খুলে দু-জনে সেই সুপ্রাচীন কফিন রাখা প্রকোষ্ঠে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ; সাংঘাতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ডাঃ হেলসিংগ দেশলাই জেলে একটা মোমবাতি ধরিয়ে লুসির কফিনের কাছে গেলেন এবং একটা লোহার রড কফিনের ডালা খুলে ফেললেন।

অবাক কাণ্ড, কফিন ফাঁকা। লুসির মৃতদেহ নেই।

সেওয়ার্ড দিশেহারা হলেও ডাং হেলসিংগের মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কিন্তু সেওয়ার্ড বললেন, নিশ্চয়ই কোন শব অপহরণকারী লুসির মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। তখন আরো প্রমাণ দেখানোর জন্য তাঁরা এগিয়ে চললেন।

কফিনটা যেমন ছিল তেমনভাবে রেখে আলো নিভিয়ে আবার দরজায় তালা

লাগিয়ে ডাঃ হেলসিংগ ডাঃ সেওয়ার্ডকে কবরখানার একদিকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে অপরদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজলো। সমাধি ক্ষেত্রের ভুতুড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডাঃ সেওয়ার্ডের সারা শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে এলো। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানোর পর হঠাৎ একটা আবছা সাদা মূর্তি দেখতে পেলো। অন্ধকার পথ ধরে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে ডাঃ হেলসিংগের ছায়ামূর্তিও এগিয়ে চলেছে। ডাঃ সেওয়ার্ড পেছনে পেছনে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যে আবছা মূর্তিটা গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলো। তারপর প্রফেসর একটা শিশু কোলে নিয়ে সেওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কে আনলো একে এখানে? ও কি আহত?

—চলো, দেখি। এই বলে একটু দূরে গিয়ে দেশলাই জ্বেলে পরীক্ষা করে ডাঃ হেলসিংগ বললেন—না, ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। খুব জোর বেঁচে গেছি।

পরের দিন দুপুর দুটোর সময় আবার তারা সেই সমাধি ক্ষেত্রের লুসির প্রকোষ্ঠে গিয়ে ঢুকলেন। ডালা খুলে গেল, লুসির শব শোয়ানো আছে। ভারী সুন্দর মুখ। যেন তাজা গোলাপ।

—এবার বলো কি দেখছো। বিশ্বাস হচ্ছে এ তাজ্জব ব্যাপার? বলেই তিনি লুসির ঠোঁট দুটো ফাঁক করতেই প্রাণীদের শ্ব-দন্তের মত দাঁতগুলো দেখা গেলো। বুঝতে পারছো, এই দাঁত অতি সহজেই শিশুদের কণ্ঠে দাঁত বসানো বা ছিদ্র করা সহজ। এবার ঘটনা তো মানছো?

এই অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ঘটনার স্রোতে ডাঃ সেওয়ার্ড যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

ডাঃ হেলসিংগ বললেন—অন্যান্য শবের শব্দের থেকে এর অনেক পার্থক্য। বেঁচে থাকতে ঘুমের মধ্যে যখন হাঁটতো। সে সময় লুসিকে ভ্যাম্পায়ারে কামড়েছে। সম্মোহিত অবস্থায় লুসি মারা গেছে এবং এখন তার যা অবস্থা তাকে অ-মৃত (un-dead) বলা উচিত। চেয়ে দেখো এখন ওর চেহারায় কোন বীভৎসতা নেই। তাই এই ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে মারতে হবে ভেবে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।

—কি ভাবে আপনি এই হত্যাকাণ্ডটি করবেন?

—প্রথমে ওর মুণ্ডুটা কেটে দিয়ে মুখে রসুন ভরে দেবো। তারপর ওর দেহ ভেদ করে একটা কাঠের শলাকা বসিয়ে দেবো।

এই প্রক্রিয়া শুনে ডাঃ সেওয়ার্ড চমকে উঠলো। এককালে যাকে সে ভালোবাসতো, তাকে তার চোখের সামনে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড করা হবে।

—অবশ্য এখন করলেও চলতো। কিন্তু করা ঠিক হবে না। কারণ আর্থার হলো লুসির মৃত স্বামী। সব কিছু দেখেশুনেও তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছো না এই অলৌকিক বীভৎসতাকে। আর আর্থারের পথে ভুল বোঝা তো স্বাভাবিক। ভাবছি, কিভাবে আর্থারের কাছে এ প্রসঙ্গ তুলবো। ভাববে বুঝি, লুসিকে জীবিতাবস্থায় আমরা সমাধিস্থ করেছি। যাক, আজ আমি সমাধিক্ষেত্রে থাকবো। তুমি কাল বার্কলে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর্থার আর লুসিকে যে মার্কিণ যুবক রক্ত দিয়েছিলো তাকে ডেকে পাঠাবো। এই বলে ডাঃ হেলসিংগ প্রকোষ্ঠে তালা চাবি দিয়ে সেখান থেকে দু-জনে চলে এলেন।

*　　*　　*

রাত্রে সমাধিক্ষেত্রে যাওয়ার আগে ডাঃ হেলসিংগ একটি কাগজ লিখে পোর্টম্যান্টোতে রেখে গেলেন—

—এটা যদি আমার শেষ যাওয়া হয় তাই লিখে রাখলাম। লুসি বেরোতে পারবে না। কিন্তু জোনাথনের ডাইরীতে যার কথা লেখা আছে সেই জবরদস্ত অ-মৃত মানুষটিকে নিয়ে ভয়। সেটাও ঐ বাক্সেই রয়েছে। সেই অ-মৃত মানুষটি ভয়ানক শক্তিশালী এবং ভীষণ চালাক, সে এসে হয়তো আমাকে শেষ করতে পারে। অথবা সে নিজে না এসে তার বশীভূত নেকড়েকে পাঠিয়ে দিতে পারে। যাক, যদি আমার কিছু হয়, তাহলে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ো না। জোনাথনের ডায়েরী পড়ে লোকটাকে খুঁজে বের করবোই। তারপর তার মাথা কেটে বুকে কাঠের শলাকা ঢুকিয়ে দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে বিপদ থেকে মুক্তি দেবে।

*　　*　　*

২৮শে সেপ্টেম্বর রাত দশটার সময় আর্থার, কুইন্সে পি. মরিসকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ হেলসিংগের ঘরে ঢুকলো।

ডাঃ হেলসিংগ একটু দ্বিধাবোধ করে বললেন—এক ভয়ানক এবং গুরুতর ব্যাপারের সম্মুখীন হয়েছি আমি। আর্থার, তোমার সহায়তা আমি আশা করি। কিংস্টেড সমাধি ক্ষেত্রে সবাইকে যেতে হবে। আমি লুসির কফিনটা খুলবো।

—না না, কেন? আর্থার আঁৎকে ওঠে এবং ভয়ানক রেগে যায়।

—উত্তেজিত হবেন না। শুনুন, মিস লুসি মৃত নয় কি? বেশ, এখন কথা হল সে মৃত হলে কোন কথাই নেই। কিন্তু যদি সে মৃত না হয়ে অমৃত হয়?

—অমৃত! আপনি কি হেঁয়ালী করছেন প্রফেসর? আর্থার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে—আপনার মাথার বোধহয় ঠিক নেই।

—ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করুন, আমরা এই মুহূর্তে একটি অপার রহস্যের সম্মুখীন হয়েছি। অবিলম্বে এর সমাধান প্রয়োজন। আমি কি মিস লুসির মাথাটা কেটে ফেলতে পারি?

—অ্যাঁ, আপনি কি বলছেন? কখনো নয়; আমি বেঁচে থাকতে লুসির মৃতদেহের কোন অপমান হতে দেবো না।

—দেখুন, আমার একটা কর্তব্যবোধ আছে। প্রত্যেকের প্রতি, আপনি কি চান তার মৃত্যুই হোক। তবে জেনে রাখুন, আমি যা স্থির করেছি তা করবোই। তবে আপনি আমার সব কথা শান্তভাবে শুনুন। সহযোগিতা করুন। জেনে রাখবেন, প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যেই আমাকে এই কঠিন কর্তব্যসাধন করতে হচ্ছে। আমিও রক্তমাংসের মানুষ।

অগত্যা আর্থারকে রাজী হতে হলো।

* * *

রাত পৌনে বারোটার সময় সবাই নিচু দেওয়াল পার হয়ে সমাধিক্ষেত্রে হাজির হলো। মেঘের আড়ালে আড়ালে মাঝে মধ্যে চাঁদ উঁকি মারছে।

সমাধি প্রকোষ্ঠে সবাই ঢুকলে ডাঃ হেলসিংগ বললেন—আচ্ছা, সেওয়ার্ড কাল যখন ডালা খুলেছিলাম, তখন কি কফিনের মধ্যে লুসির দেহ ছিল?

—ছিল, প্রফেসর।

এবার কফিনের ডালা খুলে আলো তুলে দেখতেই দেখা গেলো কফিন ফাঁকা। মৃতদেহ নেই।

—কে সরালো লুসির দেহ? আপনি? মরিস প্রশ্ন করলো।

—আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি কিছু করিনি। দু-রাত আগে আমি ও সেওয়ার্ড এসে কফিন খুলে দেখলাম লুসির দেহ এতে নেই। তখন বাইরে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আলো-আঁধারির মধ্যে লক্ষ্য করলাম এক সাদা রঙের ছায়ামূর্তি সমাধি প্রকোষ্ঠের দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে। পরের দিন দিনেরবেলায় এসে দেখি কফিনে, ঠিক তেমনভাবে রয়েছে লুসির মৃতদেহ।

…সেদিন রাতে ভাগ্যবশতঃ একটি শিশুকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। গতবার সন্ধ্যের আগে আমি এখানে আসি। সূর্যাস্তের পর সকল অমৃতরা জেগে ওঠে। আমি সমাধি প্রকোষ্ঠের সামনে রসুন ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। রসুনের গন্ধ ওদের কাছে সাংঘাতিক। তাই তারা আর বেরোতে পারে নি। আজ বিকেলে সেগুলো সরিয়ে ফেলেছি, তাই অ-মৃতটি জেগে বাইরে বেরিয়ে গেছে। তাই কফিন খালি পড়ে আছে।

আতঙ্কপূর্ণ মনে মরিস ও আর্থার সব শুনছিল। ডাঃ হেলসিংগ বললেন, চলুন আজ আপনারা অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবেন।

তারপর লণ্ঠন নিভিয়ে সবাই সমাধি প্রকোষ্ঠের বাইরে চলে এলো।

গা ছমছমে রাত। বাইরে আকাশে জ্যোৎস্না ও মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে।

তারপর ডাঃ হেলসিংগ ব্যাগ থেকে কতকগুলো রসুনের কোয়া বের করে সমাধি প্রকোষ্ঠের দরজা ও কবরখানার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিলেন। বললেন—এর দ্বারা আমি অমৃতদের কবরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলাম। এগুলো আপস্টার ডাম থেকে নিয়ে এসেছি।

একে রাত্রি। তার ওপর ইউ এবং জুনিয়ার গাছেয় ছায়া ঘেরা সমাধিক্ষেত্রের ভৌতিক পরিবেশ। সবাই এক অপার্থিব ভয়ে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হঠাৎ সবাই সচকিত হয়ে লক্ষ্য করলো। ইউগাছের অন্ধকারের আড়াল থেকে একটি সাদা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে এগিয়ে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তিটি একটি কালো শব আচ্ছাদনে আবৃতা এক রমণী। কোলে একটি শিশু। অকস্মাৎ সেই শিশুকণ্ঠে এক অন্তিম আর্তনাদ শোনা গেল। আরও কাছে এগিয়ে আসতে ছায়ামূর্তিটি মুখ তুলে তাকাতেই যে ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হলো তাতে ডাক্তার ছাড়া সবাই মুখ থেকে একটা ভীতিপূর্ণ আত্মস্বর বেরিয়ে এলো একসঙ্গে।

স্বয়ং লুসির ছায়ামূর্তি। কী বীভৎস তার রূপ! সেই সুন্দর সুমধুরা কোমল স্বভাবা ফুলের মত মেয়ে লুসিকে আচ্ছন্ন করে আছে ভয়ঙ্কর সেই বিভীষিকা। যেন রক্তচোষা ডাইনী।

ডাঃ হেলসিংগের পেছন পেছন তিন সঙ্গী আতঙ্কগ্রস্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল। ডাক্তার হাতের লণ্ঠন তুলে ধরতেই দেখা গেল, লুসির দুই ঠোঁট তাজা রক্তে লাল। আর গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে শবাচ্ছাদানের ওপর পড়ছে।

এই অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে সবাই কিংকর্তব্য বিহ্বল হয়ে অবশ দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। আর্থার তো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ডাঃ সেওয়ার্ড ওকে ধরে ফেললো। ঐ ভয়ঙ্কর মূর্তিটাকে লুসি বলে ভাবতে তাদের ঘেন্না হলো।

ক্রোধ, লোভ, হিংসা, কাম সব কিছু মিলিয়ে একটা অসহ্য অভিব্যক্তিসহ লুসি ওদের দিকে এগোতে লাগলো। তারপর এক অবিশ্বাস্য কামার্ত ভঙ্গীতে তার জীবিতকালের প্রেমিক আর্থারের দিকে এগোতে থাকলো। হাত থেকে ইতিমধ্যে ফেলে দিয়েছে শিশুটিকে।

ভয়ে আতঙ্কে পিছু হটে আর্থার দুহাতে মুখ ঢাকলো।

কাঁচভাঙ্গা শব্দের মত খ্যানখ্যানে গলায় অমৃত লুসি বলে—এসো, প্রিয় আর্থার। আমরা দুজনে এখানে বিশ্রাম করবো। এসো আমার স্বামী।

সেই আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আর্থার একপা একপা করে এগোতে গিয়ে বাধা পেলো। ডাঃ হেলসিংগ দ্রুত গতিতে ওদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে হাতে তুলে ধরলেন ছোট সেই সোনালী ক্রুশ চিহ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে লুসি ছুটে গেলো সমাধি প্রকোষ্ঠের দিকে। কিন্তু সেখানেও বাধা। দরজার সামনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। স্থাণুর মত। তার পর পেছন ফিরে তাকালো। সবাই চমকে উঠলো। তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে নারকীয় অগ্নি। রক্তাক্ত ঠোঁট দুটি ক্রমশঃ হাঁ হয়ে গিয়ে গ্রীক বা জাপানী মুখোশের আকৃতি ধারণ করলো। যেন মৃত্যুরূপী খুনে মুখ।

—এবার বলুন বন্ধু, আমি কি আমার কার্যে এগোবো। ডাঃ হেলসিংগের কণ্ঠ অপার্থিত মনে হল।

আর্থার তাঁর হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ চেপে চাপা কণ্ঠে বললো—প্রফেসর, আপনার যা খুশী করুন। শীগগির এই ভয়াল ভয়ঙ্কর ঘটনার অবসান করুন।

মরিস এবং সেওয়ার্ড গিয়ে ওর হাত ধরলো। রসুনের কোয়াগুলো ডাঃ হেলসিংগ প্রকোষ্ঠের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে চারজন দর্শককে হতবাক করে লুসির সেই প্রায় বাস্তব দেহ বায়ুভূতের মত দরজার

ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে কবরখানার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো। আবার প্রফেসার সেই লম্বা দড়ির মত নরম সাদা পদার্থগুলোকে দরজার সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

তারপর ডাক্তার ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এবার ফেরা যাক।

*　　　　*　　　　*

২৯শে সেপ্টেম্বর, রাত দেড়টা। কালো পোশাক পরিহিত চারজন মানুষ সমাধিক্ষেত্রের সামনে হাজির হলো। ডাঃ হেলসিংগের হাতে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। বেশ ভারী বলে মনে হচ্ছিল। সবাই এগিয়ে গিয়ে সমাধি প্রকোষ্ঠের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। লণ্ঠন ও মোমবাতি জ্বেলে কফিনের ডালা খোলা হলো।

তাজা ফুলের মত সুন্দর মুখের মেয়ে লুসি শুয়ে আছে। সবাই বিস্ময় প্রকাশ করলো। শায়িত লুসিকে কফিনের মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন মূর্তিমতী এক দুঃস্বপ্ন। তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত, মুখে রক্ত, কামভাবা রয়েছে সর্বাঙ্গে।

ব্যাগ থেকে ডাঃ হেলসিংগ বের করলেন সব ঝালাই করার লোহা, একটা প্রদীপ। প্রদীপটা জ্বালাতেই তীব্র উত্তাপ সহ নীল আলো জ্বলতে লাগলো। হাতে একটা ছুরি। আর দুই থেকে তিন ইঞ্চি চওড়া ও তিন ফুট লম্বা একটা গোল কাঠের টুকরো। একটা কয়লা ভাঙা হাতুড়িও বের করলেন।

ডাক্তারের কাজকর্ম আর্থার ও মরিসের কাছে ভীতিপূর্ণ বিস্ময় বলে মনে হলো। সাহস এনে তারা চুপ করে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলো।

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ডাঃ হেলসিংগ বললেন, কিছু করার আগে আমি বলে নিতে চাই, অ-মৃতদের সম্বন্ধে আমাদের আদিপুরুষদের মতাম লব্ধ অভিজ্ঞতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি এ কাজে নেমেছি। যখন কোন মৃত অমৃতে রূপান্তরিত হয়, তখন তার মধ্যে অভিশাপস্বরূপ আসে অমরত্ব। যুগের পর যুগ বেঁচে থেকে তারা একের পর এক অমঙ্গল ঘটিয়ে মানুষ মারে এবং তাদের অমৃতে পরিণত করে। ফলে অমৃতের সংখ্যা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। মনে আছে আর্থার; আপনাকে আমি লুসির মৃত্যুর মুহূর্তে ওকে বিদায় চুম্বন দিতে বাধা দিয়েছিলাম। কাল রাতেও যদি আপনি ওর কাছে ধরা দিতেন তাহলে আপনি মৃত্যুর পর হয়ে যেতেন নসফেরাতু। যদি আজ তার মৃত্যু ঘটে সত্য ও পবিত্রপন্থায়, তাহলে চিরকালের মত সমস্ত অমঙ্গলের শেষ হয়ে যাবে। গলাই ক্ষতের দাগ মিলিয়ে যাবে। শিশুরা আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। লুসি অ-মৃত থেকে গিয়ে মৃতের পরম শান্তি লাভ করবে এবং তার আত্মার মুক্তি হবে

চিরতরে। আসুন মেয়েটিকে নরক থেকে আমরা স্বর্গের দুয়ারে পৌছে দিই। বলুন, কার হাতে ও মুক্তি পাবে?

আর্থার কম্পিত দেহে এগিয়ে এলো—বলুন আমায় কি করতে হবে? আমি করবো।

—সাবাস। এই তো পুরুষের মত কথা। এই কাঠ কীলকটা বাঁ হাতে নিয়ে এবার লুসির বুকের মধ্যে ডান হাতের হাতুড়ি দিয়ে পিটে ঢুকিয়ে দিন। আমি বই এনেছি। মৃতের সংকারের মন্ত্র পাঠ করবো। এই ভাবেই মেয়েটি অ-মৃত থেকে মৃতে পরিণত হয়ে চিরমুক্তি পেয়ে যাবে।

আর্থার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হাতে এগিয়ে এলো। প্রফেসরের নির্দেশ মত সে করতে লাগলো। আর তিনজনে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলো। আশ্চ.. আঘাত পাওয়া মাত্র লুসির দেহটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠলো। মুখ দিয়ে একটা ছোট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতগুলো ঠোঁট দুটিকে কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো। আর্থার যেন অবিচল প্রতিমূর্তি। ক্রমাগত সে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে যেতে লাগলো বনস্থিত কীলকটার উপর। একসময় লুসির দেহটা শান্ত হয়ে গেলো। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে উঠলো পবিত্রতার মধুর সৌন্দর্য। এবার যেন পরিচিত ও চেনা মেয়ে সেই মানসী লুসিকে চেনা গেল। মৃত্যুর প্রশান্ত কোলে যেন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ডাঃ হেলসিংগের মুখে ফুটে উঠলো আনন্দ ও তৃপ্তির ভাব—আর্থার, আশা করি এবার আপনি আমাকে মার্জনা করতে পারবেন?

-মার্জনা। আর্থার আবেগে জড়িয়ে ধরলো ডাঃ হেলসিংগকে। যিনি আমার প্রিয় লুসিকে তার আত্মা ফিরিয়ে দিলেন এবং আমাকে দিলেন পরম শান্তি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

এরপর যে কাজটুকু বাকি ছিল সেটুকু ডাঃ হেলসিংগ করলেন, আগেই আর্থার ও মরিসকে সমাধি ক্ষেত্রের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে কীলকটাকে নামার দিক থেকে করাত দিয়ে কেটে ফেললেন। তারপর লুসির মৃতদেহের মাথাটি কেটে মুখে রসুন পুরে দিলেন।

কিছু বাদে কফিনের ডালা লাগিয়ে ডাঃ হেলসিংগ ও ডাঃ সেওয়াড সমাধি ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাঃ হেলসিংগ বললেন এখন আমাদের আর একটা কঠিন কাজ বাকি। এসব হীন কাজের যিনি নষ্টের গোড়া তাকে খুঁজে

বের করে শেষ করতে হবে। সে সম্বন্ধে আমার কাছে কিছু কিছু সূত্র আছে। তুমি থাকবে আমার পাশে। আমি আমস্টারডামে ফিরে যাচ্ছি, কাল রাত্রে আসবো। তারপর শুরু হবে আমাদের বিরাট সেই অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্য। মনে রেখো, এবারকার শত্রু সাংঘাতিক দুর্বার।

*　　*　　*

মীনা আসতে খবর পেয়ে ডাঃ হেলসিংগ সেওয়ার্ডকে বলে গেলেন, তার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য জোনাথন হুইটবী গেছে।

পাগলাগারদের উপর তলায় সেওয়ার্ডের কোয়ার্টারে মীনা এসে উঠলো। ইতিপূর্বে সেওয়ার্ড মীনা ও জোনাথনের ব্যক্তিগত ডাইরি পড়ে কাউন্ট সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে। লুসির মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে মীনা খুব অভিভুত হলো।

মীনা নিজে টাইপ রাইটার মেসিন এনেছিল। সে সেওয়ার্ডের ফনোগ্রাফ শুনে শুনে সমস্ত ডাইরীটা টাইপ করে ফেললো। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কাটিং-গুলো থেকে টাইপ করলো। হুইটবীতে যেদিন কাউন্ট ড্রাকুলার আবির্ভাব ঘটে তখন কি কি ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ পাওয়া গেল।

জোনাথন হার্কার পরদিন এলো, সেওয়ার্ড বুঝলো, সত্যিই যুবকটি দুঃসাহসী। নয়তো ড্রাকুলা ক্যাসলে কেউ সজ্ঞানে দু-দুবার সেই সাংঘাতিক ভল্টে যেতে পারে?

জোনাথন জানালো, পাগলাগারদের পাশের ঐ বিরাট বাড়ি চ্যাপল গীর্জা সমেত স্বয়ং ড্রাকুলা কাউন্ট কিনে এসে উঠেছে। এছাড়া মাটিভরা সেই পঞ্চাশটি বাক্সও ঐ বাড়িতেই রাখা হয়েছে।

তাহলে কি কাউন্ট ড্রাকুলার রহস্যময় অবস্থিতি ও অনুপস্থিতির সঙ্গে বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষ রেনফিল্ডের কার্যকরণ যুক্ত আছে?

জোনাথন সলিসিটার মিঃ সিলিংটনের কাছ থেকে খবর পেল চতুর কাউন্টের রহস্যময় বাক্যগুলি কারফ্যাশে গেছে। জোনাথন ঘুরে ঘুরে হুইটবী বন্দরের কোস্টগার্ড, কাস্টম অফিসার, আর বড় মাস্টার সকলের কাছ থেকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে।

সেখানে আর্থার ও মরিস এসে পৌছালো। এদের জন্যে ভারী দুঃখ হলো মীনার। ডাঃ সেওয়ার্ড, আর্থার ও মরিস—তিনজনেই লুসিকে ভালবাসতো,

বিয়ে করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর্থারকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়। লুসির কথা উঠতে আর্থার কান্নায় ভেঙে পড়লো। আর্থার মীনাকে ছোট বোনের মত করলো এবং মরিস। দুজনেই জানালো, মীনা কোন বিপদে পড়লে খবর দিলেই তারা বোনকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসবে।

* * *

মীনা রেনফিল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

—গুড ইভিনিং মিঃ রেনফিল্ড।

—গুড ইভিনিং ম্যাডাম। আপনিই কি সেই মেয়ে যাকে আমাদের ডাক্তার বিয়ে করতে চেয়েছিল? না না, তা কি করে হয়। সে তো মরে গেছে জানি।

নানারকম কথা হলো দুজনে। মনেই হবে না, সে একজন পাগল। কত উচ্চাঙ্গের কথা। অবশেষে স্বীকার করলো তার পোকা মাকড়, চড়ুই পাখি খাওয়ার কথাটি।

ডাঃ হেলসিংগ পথে আসতে আসতে ডাঃ সেওয়াডকে বললেন—মীনার মত মেয়ে খুব কম দেখা যায়। মেয়েটির মস্তিষ্ক পুরুষের মত আর অন্তরটি মেয়েদের মত। বর্তমানে ওরা যে ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাচ্ছে, সেটা পুরুষদেরই মানায়। দানব তাড়ানো কাজ মেয়েদের নয়। তাই কাল থেকে ঐ রহস্যময় দানবের অনুসন্ধান ও তাকে খতম করার কাজ শুরু করবো আমরা পুরুষেরা। অভিমান হলে নারী বিবর্জিত।

একটা মিটিং ডাকা হলো। ডিনারের পর ডাঃ হেলসিংগ হলেন সভাপতি, তার ডানপাশে বসলো মীনা, তারপর জোনাথন। বাঁ পাশে আর্থার, ডাঃ সেওয়ার্ড ও মরিস বসেছে।

ডাঃ হেলসিংগ এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন—আমরা যে প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়তে চলেছি তার নাম হলো ভ্যাম্পায়ার। প্রাচীনদের লেখায় আমরা এদের অস্তিত্ব পেয়েছি। আমরা আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় একটি মেয়েকে এই শয়তানের অনিবার্য আঘাতে হারিয়েছি। এই ভয়াল ভ্যাম্পায়ার আমাদের কাছা-কাছিই ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কুড়ি জন মানুষের শক্তি রাখে। অত্যন্ত চালাক আর পাজি। যখন খুশী, যেখানে খুশী যেতে পারে, যে কোন আকৃতিতে। আর ইদুর পেঁচা, বাদুড়, শেয়াল প্রভৃতি এর আয়ত্বাধীনে থাকে। খুশীমত অতি ক্ষুদ্র আকারের হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে। এমন শত্রুকে আমাদের

খুঁজে বের করতে হবে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে হারলে মৃত্যু নিশ্চিত। এবং আমরাও এক একটি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবো। আপনারা কি এই ভয়াবহ কাজে এগিয়ে আসতে রাজী আছেন ?

সকলে একবাক্যে সম্মতি জানিয়ে উচ্চারণ করলো—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

ডাঃ হেলসিংগ আবার বললেন—সারা বিশ্বে ভ্যাম্পায়ারদের কার্যকলাপ ছড়িয়ে আছে। মানুষ আজও ভয়ঙ্কর এই ভ্যাম্পায়ারদের নিদারুণভাবে ভয় পায়।

মজা এই, ভ্যাম্পায়ারদের এমনিতে মৃত্যু হয় না। শুধু একটা প্রক্রিয়াতেই এদের মৃত্যু হয়। সেটা পরে বলছি। রক্ত খেয়ে খেয়ে ওরা যৌবন ফিরে পায়। এরা আমাদের মত খায় না। জোনাথন ড্রাকুলাকে কখনও খেতে দেখিনি। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব পড়তে দেখেনি। সে নিজেকে নেকড়েতে রূপান্তরিত করতে পারে। যখন কাউন্ট হুইটবীতে এলো তখন জাহাজ থেকে বিশাল কুকুরের মত একটা জীব বেরিয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল।

তাকে বাদুড়ের রূপে মীনা, সেওয়ার্ড, মরিস লুসির জানলায় দেখেছে। সে কুয়াশা সৃষ্টি করে আসতে পারে, ডিমিটার জাহাজের ক্যাপ্টেন যার মুখোমুখি পড়েছিল। চন্দ্রালোকে সে ক্ষুদ্র ধূলিকণারূপে ভাসতে ভাসতে মূর্তি পরিগ্রহণ করতে পারে। জোনাথন যেমন ড্রাকুলা ক্যাসল-এর বাইরে সেই ছায়ামূর্তি নারী তিনজনকে দেখেছিল। অন্ধকারে সে দেখতে পায়। তবু সে মানুষের মত মুক্ত বা স্বাধীন নয়।

এদের যা কিছু কাজ সারা রাত ধরে হয়। দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে এদের ক্ষমতা লোপ পায়। আর রসুন ও রসুন ফুলকে এরা ভীষণ ভয় পায়। আর ভয় পায় ক্রুশচিহ্ন। বুকে কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করানো এবং মুণ্ডচ্ছেদ করা প্রভৃতিতে এরা চিরশান্তি লাভ করে। অতএব যদি এই দানব শত্রুকে তার কফিনে ধরতে পারি তাহলে অতি সহজেই শেষ করে ফেলা যাবে, কোন সন্দেহ নেই।

এই সব কথা শোনার সময় মরিস বার বার জানলার দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর বাইরে চলে গেলো। হঠাৎ একটা গুলি এসে জানলার কাঁচে লেগে চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো। সবাই চমকে উঠলো। দেখা গেলো মরিস গুলি করেছে। সে একটা বাদুড়কে জানালার ধারে বসে থাকতে দেখে গুলি করে।

কিন্তু গুলিটা মনে হয় লাগেনি। বাদুড়টা ঐ ঘন বনের দিকে পালিয়ে যায়।

* * *

মীনাকে ঘুমোতে বলে ওরা রওনা দিল কাউন্ট ড্রাকুলা ক্রীত সেই চ্যাপেল সহ প্রাচীন দুর্গবিশেষ বাড়িতে ঢুকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। আর্থার সঙ্গে একটা বাঁশি এনেছিল, প্রয়োজনে বাঁশি বাজিয়ে কাদের যেন তলব করবে সে।

দেওয়াল টপকে ওরা জ্যোৎস্নালোকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চললো প্রাচীন দুর্গ বিশেষে বাড়ির দিকে। প্রফেসর হেলসিংগ ব্যাগ থেকে অনেক বিচিত্র বস্তু নামিয়ে বাড়ির কাছে কয়েক ভাগে সাজিয়ে রাখলেন। বললেন—বন্ধুগণ, আমরা এক ভয়াবহ কাজ করতে চলেছি। আমাদের শত্রু যদিও সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট তবু তার শরীরে কুড়িজনের শক্তি। ধরলে রক্ষে নেই! তাই যাতে আমাদের স্পর্শ করতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা করে রাখছি।

একথা বলে প্রত্যেকের হাতে একটা করে রূপোর ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে বুকে রাখতে অনুরোধ করলেন। প্রত্যেকের হাতে দিলেন রসুন ফুল, ছুরি, রিভলবার আর ইলেকট্রিক ল্যাম্প। নকল চাবি দিয়ে সদর দরজা খুললেন। ভেসে এলো ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ। ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে।

ল্যাম্পের আলোয় এগোতে লাগলো তারা। মনে হলো তাদের সঙ্গে অদৃশ্য কেউ উপস্থিত রয়েছে। আরেকটা দরজা খুলে ওরা ওক কাঠের এক বিরাট বন্ধ দরজার সামনে এসে হাজির হলো। অনেক কষ্টে দরজা খুলে ঢুকতেই একটা তীব্র ও অদ্ভুত বাজে গন্ধ তাদের নাকে এলো। রক্তের পচা গন্ধ। এখন পিছু হাঁটা যায় না। কারণ হাতে তাদের বিরাট এক কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব।

গুণে দেখা হলো, সেই বিরাট ওজনদার মাটি ভরা বাক্স মাত্র ২৯টি রয়েছে আর ২১টি নেই। সে ইতিহাসও জানা। যখন গাড়ি করে ওগুলো নিয়ে যায়, তখন মানসিক রোগী রেনফিল্ড ক্ষেপে গিয়ে চালকদের আক্রমণ করেছিল। এবার সেগুলোরই অনুসন্ধান করতে হবে।

হঠাৎ জোনাথনের মনে হল যেন ঘরের এক কোণে সেই ভয়াবহ কাউন্ট ড্রাকুলার ক্রুর মুখটাকে আবছা দেখতো পেলো। একটুবাদে আর্থারও জানালো, সেও নাকি একটি অদ্ভুত একই ধরণের মুখ অন্ধকারে দেখেছে। আলো নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সবাই কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তবে কি জোনাথনের

ভীতির ফলে এই রকম মূর্তি দেখেছে, হতেও পারে। কিন্তু আর্থারও কি তাহলে একইভাবে ভুল দেখলো।

এরপরেই মরিস লক্ষ্য করলো, সারা ঘর বিন্দু বিন্দু আলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথা থেকে অসংখ্য ইদুর বেরিয়ে আসতে লাগলো।

আর্থার দরজা খুলে তীব্র ভাবে বাঁশি বাজালো। এক মিনিটের মধ্যেই তিনটে প্রবল বিক্রম টেরিয়ার কুকুর সেওয়ার্ডের বাড়ি থেকে চীৎকার করতে করতে এসে হাজির হলো।

কিন্তু দরজার কাছে এসে তারা থমকে গেলো। কি যেন খুঁজল। তারপর ভয়পূর্ণ স্বরে ডাকতে লাগলো। আর্থার কুকুরগুলোকে তুলে ধরে চৌকাট পার করে দিলো। কুকুরগুলোর প্রবল আক্রমণে নিমেষের মধ্যে ইদুরগুলো কোথায় মিলিয়ে গেলো। ব্যাপার দেখে মনে হলো, এ বাড়িতে কাউন্টের আজ্ঞাধীন বলতে এই সামান্য ইদুররাই আছে।

সকাল হতে যে যার বাড়ি তারা ফিরে এলো। মীনা তখনও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মীনা যে ঘুমের মধ্যে দু'বার জেগে উঠেছে, জানলার কাছে গেছে কেউ জানতে পারলো না। কোথা থেকে একটা অকথ্য গোঙানীর শব্দ কানে ভেসে আসছে। তবে কি রেনফিল্ড ওরকম করছে? কি হয়েছে তার? মীনার শরীরটাও দুর্বল লাগছে। ওটা কি দুঃস্বপ্ন—ঘর ভর্তি হয়ে গেলো শিশির কুয়াশায়। তার মধ্যে দুটি লাল চোখ। সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে গেলো। মনে হলো ভয়ে সে জ্ঞান হারাবে, চারিদিক অন্ধকার।

*　　　*　　　*

জোনাথন গাড়ির চালকদের খুঁজে বের করে আরেকটি খালি বাড়ির খোঁজ পেলো পিকাডিলি সার্কাসের কাছে। সেখানে কিছু মাটি ভর্তি বাক্স নিয়ে রাখা হয়েছে। ডাঃ হেলসিংগ সমস্ত বাক্সগুলির অবস্থিতি জানতে চান। না হলে রহস্যের উদঘাটন বা সমাধান হবে না। পিকাডিলির বাড়ীতে দিনে বা রাত্রে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। কি করে প্রবেশ করা যায়, সেটাই কথা।

এদিকে মানসিক রোগী রেনফিল্ডের পাগলামী ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। সে কেবল চীৎকার করে বলছে—আত্মা চাই, জীবন চাই। মনে হয় কোন অদৃশ্য অজ্ঞাতের কাছ থেকে সে আশ্বাস পেয়েছে। তবে কি কাউন্ট ড্রাকুলার সঙ্গে তার অদৃশ্য যোগাযোগ আছে? ডাঃ সেওয়ার্ড ও ডাঃ হেলসিংগ চিন্তিত হলেন। কাউন্ট ড্রাকুলা তাহলে ওকেও প্রভাবান্বিত করেছে?

অনুসন্ধান করে জানা গেল, ৩৪৩নং পিকাডিলির বাড়িটি নাকি কাউন্ট ত ভিলে নামক একজন বিদেশী কিনে নিয়েছে। যে ভাবেই হোক সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে কাউন্টকে খতম করতে হবে।

অকস্মাৎ এক দুঃসংবাদ এলো ডাঃ সেওয়ার্ডের কাছে। মানসিক রোগী রেনফিল্ড দুর্ঘটনায় পড়েছে। তার দেহ কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, প্রায় সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায়। ওকে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত করলো কে?

ডাঃ হেলসিংগ এলেন সেখানে। খুব ক্ষীণ ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। ডাক্তারের ইচ্ছে রোগীকে জ্ঞান ফিরিয়ে তার মুখ থেকে কিছু কথা শোনা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করলেন রেনফিল্ডের দেহে।

এক সময় জ্ঞান ফিরলো রেনফিল্ডের। শোনা গেল বিস্ময়কর কাহিনী—সে এসেছিল। স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা। কখনো আসতো আলোক বিন্দুতে, কখনো শিশিরে কুয়াশায়। ওকে মশামাছি, মাকড়সা পাখী দিয়ে প্রলুব্ধ করতো। কখনো হাজার হাজার বীভৎস, তাঁর মত রক্তচক্ষুয়ালা ইঁদুরের পাল মনে হয় সে বলতে চাইতো—আমার ভজনা কর। তাহলে তোমাকে এই সব প্রাণী দেবো। রেনফিল্ড অবশেষে তার এই মনিবের কাছে মাথা নত করেছে।

এর পরে এক আশ্চর্য কথা শোনালো লোকটা। মীনা নাকি ওর ঘরে গিয়েছিল। ওর ফ্যাকাসে মুখ দেখে রেনফিল্ড রেগে যায়। এমন ভাল মেয়েটাকে ঐ 'মাস্টার'ই শেষ করে ফেলেছে তিলে তিলে। কিন্তু তার দৃঢ় শপথ, আর কোন মেয়ের জীবন সে নিতে দেবে না। কিন্তু তার প্রভুর কি উগ্রমূর্তি। জলন্ত চোখ। তার শক্তির কাছে ওর শক্তি অতি তুচ্ছ হয়ে গেল। সহসা একটা লাল মেঘ এসে ঘর ভরে গেল এবং 'প্রভু' ওকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে দুই ডাক্তার পাগলা গারদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো! মীনাকে এখুনি দেখতে হয়। মীনার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ওরা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকে যে দৃশ্য দেখলো তাতে ওদের রক্ত জল হয়ে গেল।

ফুটফুটে চমৎকার জ্যোৎস্না জানালা পথে এসে ঘরে ঢুকেছে। সেই আলোতে দেখা গেল জানলার কাছে জোনাথন হার্কার শুয়ে আছে। আচ্ছন্নের মত জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

বিছানার ধারে সাদা রাত্রি পোশাক পরে হাটু গেড়ে বসে আছে মীনা। তার বাঁ দিকে কালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে মীনার

দুহাত টেনে ধরে ডান হাতে পেছন থেকে ধরেছে তার ঘাড় ও গলা। তারপর মীনার মুখটি চেপে ধরেছে নিজের বুকে। লোকটার মুখ জানলার দিকে। তবু এরা ঢুকে বুঝতে পারলো, এ তো স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা। মীনার সাদা পোশাক রক্তে ভিজে গেছে।

ওরা ঘরে ঢুকতেই ড্রাকুলা ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ ভয়াবহ হিংস্র আকার ধারণ করলো। লাল চোখ দিয়ে আগুন ঝরা দৃষ্টি বেরিয়ে এল। রক্ত ঝরা ঠোঁট দুটির ফাঁকে হিংস্র করাল হাঁ-টা বেরিয়ে এলো। এক ঝটকায় মীনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই রক্ত পাড়ি দানব এগিয়ে এলো ভীম বেগে ওদের অক্রমণ করতে……! সঙ্গে সঙ্গে হেলসিংগ একটা পবিত্র বস্তু ভরা খাম সামনে উঁচিয়ে ধরলে। আর সবাই হাতে নিলো পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন। নিমেষের মধ্যে সমস্ত শক্তি লোপ পেলো দানব ড্রাকুলার। তারপর একপা একপা করে পেছোতে লাগল। হঠাৎ কালো মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেল। কাউন্ট মুহূর্তে বায়ুভূত হয়ে মিলিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি সবাই মীনার কাছে গেল। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে এমন একটা আর্তচিৎকার করে উঠলো যেটা কোন দিন শ্রোতারা ভুলবে না। তার মুখের আকৃতি একেবারে পাল্টে গেছে।

জোনাথন তখনও জ্ঞানহীন। ভিজে তোয়ালে দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে তাকে জাগানোর প্রচেষ্টা হলো। হঠাৎ দ্রুতপথে মরিস ও আর্থার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে জোনাথনের মুখে ফুটে উঠলো বুনো বিস্ময়। কি ব্যাপার; সবাই এখানে কেন? আমার কি হয়েছে? এ কি রক্ত কেন? একি সর্বনাশ। আমি দানবটাকে এক্ষুনি খুঁজে বার করবো। আপনারা মীনাকে দেখুন!

মীনা কান্নায় ভেঙে পড়লো, স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হার্কারের সাদা পোশাক মীনার মুখের রক্ত লাগতেই সে চমকে উঠলো। তাহলে তার কি লুসির মত অবস্থা হলো। তার নিঃশ্বাসে স্বামী আর বাঁচবে না। ডাক্তাররা তাকে ক্রুশচিহ্ন প্রভৃতি দেখিয়ে অভয় দিলেন, কোন ভয় নেয়। এগুলো থাকলে কোন অশুভ শক্তি স্পর্শ করতে পারবে না।

আর্থার ও মরিস ফিরে এলো। আর্থার জানালো, দানবটির কোথায়ও খোঁজ পেলো না। তবে স্টাডিতে ঢুকে সব প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপিগুলো

গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। ফনোগ্রাফের ওয়াক্স-এর সিলিণ্ডারগুলিও অক্ষত নেই। ডাঃ সেওয়ার্ড জানালো পাণ্ডুলিপির আর একটি কপি সিন্দুকের মধ্যে আছে।

আর্থার নিচে আসতে আসতে রেনফিল্ডের ঘরের দিকে তাকাতেই দেখে, সে মরে পড়ে আছে। একথা শুনে চমকে উঠলেও ডাঃ হেলসিংগ শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে মরিসকে বললেন সে কিছু বলবে কিনা।

—কাউণ্ট কোথায় আছে তা সে জানে না, মরিস বলতে থাকে। তবে রেনফিল্ডের জানালার কাছ থেকে একটা বাদুড়কে তার কুৎসিত ডানা মেলে পশ্চিম দিকে উড়ে চলে যেতে দেখেছে সে। আজ আর ড্রাকুলার এদিকে আসার সময় নেই কারণ ভোর হয়ে এসেছে।

ডাঃ হেলসিংগের অনুরোধে মীনা নিজেকে শান্ত ও সংযত করে কান্নাভেজা কণ্ঠে বললে—

ঘুমের ওষুধ খেয়েও মীনার ঘুম আসছিল না। কেবলই মৃত্যু, ভ্যাম্পায়ার, রক্ত, বেদনা, ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং গাঢ় ঘুমই হয়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে, ঘর কুয়াশায় ভরে গেছে। স্বামী জোনাথনকে জাগাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। তারপরেই সেই দানবটার আবির্ভাব হলো তার চোখের সামনে।

কুয়াশা ভেদ করে একটা রোগা লম্বা লোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কালো পোশাক পরণে। বুঝলাম তাকে। সেই পাখীর মত নাক, ফাঁক হওয়া ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ণধার দুপাটি দাঁত। সবার উপরে তীব্র লাল দুটি চোখ। আর জোনাথনের শাবলের আঘাতে ড্রাকুলা ক্যাসেলের সমাধি প্রকোষ্ঠে কফিনের মধ্যে যে দাগটা হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করলাম। আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম কিন্তু আওয়াজ বেরোলো না। কানে এলো দানবের ফিনফিনে গলা—চুপ। নয়তো তোর স্বামীর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। এই বলে সেই ভয়ঙ্কর ড্রাকুলা মীনাকে দুহাতে চেপে ধরে ওর কণ্ঠে দুই ঠোঁট লাগিয়ে দাঁত বসালো।

মীনা দুর্বল হয়ে পড়লো। কতক্ষণ যে এভাবে কেটেছে জানে না। এক সময় সেই দানব মুখ তুলে বললো—তুমিও ওদের মতো আমার পেছনে লেগেছো, না? তুমি টের পেলে, ওরা কিছুটা পেয়েছে। আমার পথে যারা কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় তার পরিণাম হয় সাংঘাতিক। তুমি তাদের সবচেয়ে ভালবাসার পাত্রী। এখন আমার মাংসের মাংস, রক্তের রক্ত, আত্মীয়ের আত্মীয়। আর খুব

মীগগির হয়ে যাবে আমার সহচরী, আমার সাহায্যকারিণী। তখন ওদের বিরুদ্ধে তুমিই আমার হয়ে প্রতিশোধ নেবে। আমার আজ্ঞাবহ হয়ে আমি বললেই চলে আসতে হবে।

এই বলে ড্রাকুলা তার বুকের জামা ছিঁড়ে তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে একটা শিরা কেটে ফেললো, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুলে সে একহাতে আমার দুহাত আর অন্য হাতে ঘাড়টা ধরে তার বুকের ওপর আমার মুখটা গুঁজে দিল। হয় আমি দম বন্ধ হয়ে মরবো, নয়তো তার ঐ কাল রক্ত পান করবো। এই বলে মীনা প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। উঃ মা! আমি বুঝি শেষ হয়ে গেলাম।

* * *

রেনফিল্ডের রক্তাক্ত দেহ ঘাড় ভাঙা অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। দূর থেকে জোরে জোরে কথা শুনে মনে করেছিল গার্ডরা ওর ঘরে কেউ আছে। তারপর আর্ত চীৎকার শুনে তারা ঘরে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

ড্রাকুলা মাটি ভর্তি যেসব বিরাট মাপের বাক্সগুলো এনেছে, ওগুলো আসলে অ-মৃত বা ভ্যাম্পায়াররূপী কাউণ্ট ড্রাকুলার মৃতশয্যা বা আমার রাত্রে সে বেরিয়ে আসে। আর দিনের বেলা ঐ আমীররূপী কফিনের যে কোন একটাতে শুয়ে থাকে।

কাউণ্ট ড্রাকুলার ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্য হলো লণ্ডন এবং তার আশে-পাশে বাক্সগুলি ছড়িয়ে রেখে তার রক্ত চোখ কার্যক্রমের পরিধি বাড়িয়ে তোলা। এই হল মতলব।

এখন ডাঃ হেলসিংগ ও পার্টির কাজ হলো ঐসব বাক্সগুলি খুঁজে বের করে সেগুলো ধর্মীয় ও দ্রব্যগুণের মাধ্যমে নির্বিষ করে দেওয়া, যাতে ড্রাকুলা দিনের বেলা কোথাও গিয়ে বিশ্রাম করতে না পারে। কারফ্যাক্স-এ ৫০টির মধ্যে ২৯টি পাওয়া গেছে। জানা গেছে কাউণ্ট কারফ্যাক্স ছাড়া পিকাডিলি, বারমণ্ডসে এবং মাইল এণ্ড নামক স্থানেও বাড়ি কিনেছে।

পিকাডিলির বাড়ীতে ঢোকা অসুবিধা, তালা বন্ধ। দরজা জানালা ভেঙে যাওয়া মানে পথচারীদের ও পড়শীদের মনে সন্দেহ জাগানো।

আর্থার বললো—আমি একজন চাবিওয়ালাকে দিয়ে তালা খুলিয়ে নেবো। আমি একজন লর্ড। কেউ সন্দেহ করবে না। আপনারা কিছুটা দূরে অপেক্ষা করবেন। লোকটাকে বিদায় দিলে আসবেন।

ঠিক করা হলো, একসঙ্গে সমস্ত মাটিভরা বাক্স নির্বিষ করা হবে। দিনে ড্রাকুলা সূক্ষ্ম শরীরে যাতায়াত করতে পারবে না। তাকে মানুষের মতই সাধারণ ভাবে দরজা জানালার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। প্রথমে কারফ্যাক্সে গিয়ে ২৯টি বাক্স নির্বিষ করে পিকাডিলির বাড়ীতে যাওয়া হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থার ও মরিসকে বারমণ্ডসে এবং মাইল এণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রওনা হবার আগে একটা গা শিরশিরানি ঘটনা ঘটে গেল। মীনা একা থাকবে। যাতে কোন অশুভ শক্তি তাকে স্পর্শ করতে না পারে তাই ডাঃ হেলসিংগ বললেন, আমি এই পবিত্র ওয়াফার তোমার কপালে ঠেকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ব্যস, স্পর্শ করানো মাত্র মীনা বিকট আর্তনাদ করে উঠলো। দেখা গেল পবিত্র বস্তুটি মীনার কপালে গরম লোহা ছোঁয়ালে যেমন হয় তেমনি ভাবে চামড়া পুড়িয়ে বসে গিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। সবাই বুঝলো মেয়েটা ভ্যাম্পায়ারের প্রভাবে পড়েছে। এখন দেখতে হবে সেই প্রভাব লুসির মত মারাত্মক কিনা।

মীনাকে এভাবে মন্ত্রপুত করে সবাই কারফ্যাক্সের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সেখানকার কাজ শেষ করে সবাই এলো পিকাডিলিতে। লর্ড গডালমিং অর্থাৎ আর্থারের সহায়তায় লোক দিয়ে তালা খুলে সবাই খালি বাড়িতে ঢুকলো। ঐ রকম রক্ত পচা গন্ধ। আটটি বাক্স পাওয়া গেল। কারফ্যাক্সে ২৯টি, মারমণ্ডসে ৬টি এবং মাইল এণ্ডে ৬টি, পিকাডিলিতে ৮টি। মোট ৪৯টি। আরেকটি। সর্বনাশ। শয়তানটা একটা লুকিয়ে রেখেছে?

এখানকার কাজ শেষ করে আর্থার ও মরিস মাইলএণ্ডে ও বারমণ্ডসের বাক্সগুলিতে নির্বিত করার উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

ওরা তিনজন অপেক্ষা করতে লাগলো। ডাঃ হেলসিংগ বলছিলেন, বুদাপেস্ট ইউনিভারসিটির প্রফেসর, আমার বন্ধু আরমিনাসের রিসার্চ মারফৎ জেনেছি, কাউন্ট ড্রাকুলা জীবিতকালে একজন অসাধারণ মানুষ ছিল। এমন কোন জ্ঞানের বিভাগ ছিল যেখানে সে যাতায়াত করতো না। মৃত্যুর পরে তার দৈহিক প্রতিভা মরেনি। এখনও একের পর এক নিজের সুবিধার্থে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে চলেছে এই অ-মৃত ভ্যাম্পায়ার কাউন্ট ড্রাকুলা।

এমন সময় সদর দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। ফুটো দিয়ে সেওয়ার্ড দেখলো টেলিগ্রাম বয় দাঁড়িয়ে।

মীনার টেলিগ্রাম—

'ভি'-র প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ঠিক ১২-৪৫-এ সে কারফ্যাক্স থেকে দ্রুত এসে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। সম্ভবতঃ আপনাদের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছে।

—মীনা।

শত্রু আসছে। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, মানুষের আকৃতি ধারণ করা এক ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার। এবার সামনাসামনি একটা কিছু ফয়সালা হয়ে যাবে।

এক একটি মিনিট যেন অনন্তকাল।

দরজায় করাঘাত। ওরা চমকে উঠলো। মন্ত্রগুপ্তি ও জাগতিক অস্ত্রাদি নিয়ে অতি সাবধানে সেওয়ার্ড দরজা খুলে দিল। মরিস ও আর্থার। এখনও একটা বাক্স নির্বিত করা বাকি। সেটা সূর্যাস্তের আগে খুঁজে বের করতে হবে এবং কাউন্ট ড্রাকুলাকে উদ্বাস্তু ও নির্বিষ করে দিতে হবে।

এবার পাঁচজনে ড্রাকুলার প্রতীক্ষায় রইলো। নিশ্চয় আসবে। আসবে আশ্রয়ের লোভে।

খচ !! কিসের শব্দ ! সদর দরজার বাইরে থেকে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ না ? হ্যাঁ তাই। তাহলে দানবটা এসে গেছে।

পাঁচজনে ত্রস্তে সশস্ত্র হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। আক্রমণের কায়দাও ঠিক হলো। সামনে থাকবে ডাঃ হেলসিংগ, ডাঃ সেওয়াড ও জোনাথন। পেছনে আর্থার ও মরিস।

হলঘর থেকে ধীর পদক্ষেপ এগিয়ে আসছে। মনে হয় বিপদের আঁচ পেয়ে কাউন্ট খুব সতর্ক হয়ে পা বাড়াচ্ছে।

এরপর নিমেষের মধ্যে কেউ বাধা দেবার আগেই যেন লাফ দিয়ে ড্রাকুলা সামনের তিনজনকে পার হয়ে এসে এঘরে প্রবেশ করলো। তারপর চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় এদিক ওদিক করতে লাগলো কাউন্ট। ঘরে ঢুকে এদের দেখে হায়নার মত হিংস্র হয়ে উঠলো কাউন্ট। তীক্ষ্ণ শ্ব-দন্তগুলি পাশবিক লালসায় চকমক করে উঠলো।

এবার আক্রমণের ভঙ্গিতে, পরিকল্পনাহীনভাবে এগিয়ে এলো। প্রথমে জোনাথন তাকে লক্ষ্য করে কুঁকরি ছুরি নিয়ে আক্রমণ করলো। কিছুই হলো না। আবার আঘাত করতে কোট ছিঁড়ে গেল। আর ঝমঝম শব্দে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও নোটের বাণ্ডিল পড়লো।

তারপর ডাঃ সেওয়ার্ড ক্রুশচিহ্ন ও পবিত্র ওয়াফার নিয়ে আক্রমণ করলো।

কাউন্টের মুখে সীমাহীন ঘৃণা ও তীব্র হিংস্রতা ফুটে উঠলো। কপালের সেই আঘাত চিহ্নটা যেন এখুনি রক্তে ফেটে পড়বে।

তারপর এক লাফে কাঁচের জানলা ভেঙে লাফিয়ে পড়লো পেছনের উঠোনে। তারপর একটা আস্তাবল বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো। অদ্ভুত অপার্থিব গা শিরশির করা গলায় রক্তচক্ষুসহ বলে উঠলো—

—আমাকে তোরা কায়দা করবি। শুনে রাখ, এরপর ভেবে কূল পাবি না। মনে করেছিস্, সব বাক্স নষ্ট করে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করবি। আমার আরও :বাক্স আছে। এইবার আমার প্রতিহিংসা শুরু হলো। ইতিমধ্যে, ঐ মেয়েটা আমার হয়ে গেছে, যাকে তোরা ভালোবাসিস। ওর সাহায্যে তোরাও একদিন আমার বশে আসবি। হায়না, নেকড়ে, শেয়ালের দল যেমন আমার আজ্ঞাবহ ঠিক তেমনি। এই বলে এক লাফে ভেতরে চলে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে বাইরে অদৃশ্য হলো।

* * *

ওরা বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ফিরে এলো। সব কথা মীনাকে বললো, মীনার চেহারা যেন ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ঘুমের ঘোরে দুবার মীনা জেগে উঠেছে। একবার জোনাথন জোর করে শুইয়ে দিল। কে যেন করিডোর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। কিন্তু কিছুই না।

মীনা প্রফেসরকে ডাকতে বললো। তার ইচ্ছা তাকে সম্মোহন করে সব কিছু জেনে নিক। ভোর হয়ে আসছে। ডাঃ হেলসিংগ এলেন। শুরু হলো ইচ্ছাপূরণ।

চোখে চোখ স্থির রেখে ডাক্তার হাত ওঠাতে নামাতে লাগলেন মীনার সর্বদেহ উদ্দেশ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যে বসা অবস্থায় মীনা সম্মোহিত হলো।

এর মধ্যে বাকি সবাই এঘরে উপস্থিত হয়েছে।

ডাঃ হেলসিংগ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—

—তুমি এখন কোথায় ?

—বলতে পারছি না। বড় বিচিত্র পরিবেশ মনে হচ্ছে আমার কাছে।

—এখন তুমি কোথায় ? প্রফেসারের এক প্রশ্ন।

—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব অন্ধকার। মীনার নিষ্প্রাণ গলা। কানে আসছে কুলকুল ঢেউয়ের শব্দ। বাইরে থেকে এসব আওয়াজ আসছে।

—তাহলে তুমি কোন জাহাজে আছো ? প্রফেসার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ। ওপরে লোকজনের আসা-যাওয়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি? শেকল বা নোঙরের আওয়াজ হচ্ছে ওপরে।

—তুমি কি করছো?

—আমি মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ।

এরপর তার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আস্তে হতে হতে মিলিয়ে গেলো সে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

প্রফেসার ডাঃ হেলসিংগের বুঝতে বাকি রইলো না যে কাউন্ট সেদিনই টের পেয়েছে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। পেছনে প্রবল শত্রু ধাওয়া করেছে। তাই তার একমাত্র আশ্রয় মাটির বাক্সটা নিয়ে জাহাজে করে পাড়ি দিচ্ছে।

এখন ওদের কাজ হলো সে জাহাজে করে কখন কোথা থেকে রওনা হয়েছে জেনে তার বাক্সটি শেষ করা। এক সময় মীনা বলে—কি দরকার? সে যখন এদেশ ছেড়ে চলে গেছে তখন তাকে খোঁজার প্রয়োজন কি?

—প্রয়োজন খুব আছে বুঝেছো ম্যাডাম মীনা, রাশভারী কণ্ঠে বলে ডাঃ হেলসিংগ। নয়তো ও শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে অ-মৃতের সংখ্যা বাড়াবে।

স্থির হলো, ওরা চারজন এই অভিযানে বেরোবে। জোনাথন মীনার পাহারায় থাকবে। কিন্তু মীনা এ প্রস্তাবে রাজী নয়। সে-ও তাদের সঙ্গে যাবে এই দুঃসাহসিক অভিযানে। এখনো সে যখন কাউন্টের প্রভাবে আছে তাহলে তাকে প্রয়োজন মত সম্মোহন করে তার অবিস্থিতি ও গতিবিধির খবর জানা যাবে।

এখন মীনার দেহে একটু জৌলুস এসেছে। তবে কথাবার্তা কম বলে। ডাঃ হেলসিংগ অনুমান করলেন, কাউন্ট নিশ্চয়ই ট্রানসিলভানিয়া ফিরে যাবে। তাহলে তাকে ড্যানিউবের মোহানা দিয়ে অথবা ব্ল্যাক সী দিয়ে যেতে হবে। অতএব খোঁজ নিতে হবে। আর্থার খোঁজ নিয়ে জানালো—গতকাল জারিনা ক্যাথারিণ নামে একটি মাত্র পাল তোলা জাহাজ কৃষ্ণ সাগরের দিকে রওনা দিয়েছে। আরও জানা গেল, একজন লম্বা রোগা উন্নত নাসা লোক একটি বিরাট বাক্স সমেত এই জাহাজে উঠেছে।

দুজন ডাক্তার মীনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। প্রফেসার ডাঃ সেওয়ার্ডকে জানালেন, এককালে লুসির মধ্যে যেগুলো দেখা গিয়েছিল, সেইসব ভয়াবহ লক্ষণ

মীনার মধ্যে কিছু কিছু প্রকটিত হয়েছে। মীনার দাঁতগুলো কেমন ধারালো ও শূঁচালো হয়ে গেছে।

*　　*　　*

জারিনা ক্যাথারিণ-এর সমুদ্র দিয়ে ভার্মা পৌছতে তিন সপ্তাহ লাগবে আর স্থলপথে এরা গেলে মাত্র তিনদিনে যেতে পারবে। তাই ধীরে সুস্থে এমনভাবে ওরা যাত্রা করবে যাতে কাউন্টের জাহাজ ভামা পৌছবার একদিন আগে সেখানে উপস্থিত হতে পারে।

স্থির হলো, ভামা পৌছে প্রথমেই বাক্সটা খুঁজে একটা বুনো গোলাপের ডাল রেখে দেবে। তাহলে অর্ধেক কাজ হয়ে থাকবে। তারপর সুযোগ মত কাজ সারবে।

হঠাৎ অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় মীনা ছটফট করতে লাগলো। এক সময় সে বললো—তার রক্ত ভ্যাম্পায়ারের দ্বারা ভুক্ত হয়ে কলুষিত হয়েছে। তাই সে মরে গেলে হয়ে যাবে ভ্যাম্পায়ার, অভিশপ্ত অ-মৃত? তখন যারা এতদিন তাকে ভালবেসে এসেছে, স্নেহ করেছে তারা যেন তার আত্মার মঙ্গলের জন্য যথাবিহিত করতে দ্বিধা না করেন। অর্থাৎ লুসিকে যেমনভাবে মুক্তি দিয়েছে, তেমনিভাবে তাকেও উদ্ধার করে। এইটুকু কৃপা সে সকলের কাছে প্রার্থনা করছে।

পাঁচজন পুরুষের চোখে জল। তারা মীনাকে সান্ত্বনা দেয়, তার কথা তারা রাখবে। যদি ঈশ্বর না করুন, সে রকম কোন বিপত্তি ঘটে।

মীনা এবারে একটু শান্তি পায়।

বারোই অক্টোবর ওরা চেরিংক্রশ স্টেশন থেকে যাত্রা করে। ভার্মা পৌছে ডি ও ডেসার্স হোটেলে ওঠে।

কাল জারিনা ক্যাথারিণ জাহাজ এসে পৌছবে। মাঝে মাঝে ডাক্তার হেলসিংগ মীনাকে সম্মোহিত করে শোনেন—জল, ঢেউ, কলকল, শোঁ-শোঁ।

তার মানে জাহাজ বন্দরের দিকে আসছে। এখানে পৌছে বাদুড়ের রূপ নিয়ে জল পার হতে পারবে না। আবার মানুষের রূপ নিতেও সাহস হবে না। অতএব ঐ বাক্সর মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে। এবং ঐ সময় তাকে শেষ করতে হবে।

পনেরোই অক্টোবর কেটে গেল, ষোল সতেরো পার হলো। পঁচিশ এলো। এখনও জাহাজের দেখা নেই। মীনার মুখ থেকে জানা গেল, এখনও জাহাজ সমুদ্রে। ঐদিন টেলিগ্রাম, ২৪শে সকালে জাহাজ দার্দেনেলিসে প্রবেশ করেছে।

মীনার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। সে এখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

২৮শে অক্টোবর টেলিগ্রাম এলো আর্থারের নামে—আজ বেলা ১টায় জারিনা ক্যাথারিণ প্রবেশ করেছে 'গ্যালাটজ' বন্দরে।

এই খবর শুনে যতটা অবাক হওয়ার কথা ছিল ততটা কেউই হলো না। ভার্না না এসে গ্যালাটজ। মতলব তো ভাল নয়।

মীনার কাছ থেকে জানা গেল, গ্যালাটজ যাবার পরবর্তী ট্রেন কাল সকাল ৬-৩০-এ। ওর কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে বললো, তুমি কি করে জানলে, মীনা বললো—টাইম টেবিলের আমি ভক্ত। তাছাড়া এখানে আসার আগে আশেপাশের যাবতীয় যানবাহনের খবর মুখস্থ করেছি।

ডাঃ হেলসিংগের নির্দেশে আর্থার গেল ট্রেনের টিকিট কাটতে।

গ্যালাটজে যাতে জাহাজটা সার্চ করা যায়, সে অনুমতি আনতে জোনাথন গেল জাহাজ এজেন্টের কাছে। মরিস গেল, এখানকার ভাইস কন্সালের কাছ থেকে একটি চিঠি লিখিয়ে আনতে যাতে গ্যালাটজ-এর ভাইস কন্সাল ওদের সর্বপ্রথম সুবিধে করে দেয় এবং প্রয়োজন মত সাহায্য করে।

এদিকে মীনার মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল। সে দারুণ হালকা বোধ করছে। মনে হচ্ছে সমস্ত কিছুর প্রভাব থেকে সে মুক্ত।

প্রফেসার ও সেওয়ার্ড এ বিষয়ে আলোচনা করে বললেন—কাউণ্ট তার অশুভ প্রভাব থেকে মীনাকে মুক্তি দিয়ে ছেড়ে চলে গেছে। মীনা বেঁচে গেল। সে চেয়েছিল, মীনার সাহায্যে চারদিকের খবর জানবে। কিন্তু টের পেলো, আমরা এখানে রয়েছি। এবারে মস্তিষ্কটা তার শিশুর মত তাই মীনার প্রতি নিজ ক্ষমতাকে লুপ্ত করে পালিয়েছে। কিন্তু মীনার মাধ্যমে প্রফেসাররা যে তার খবরাখবর জানতে পারবে সেটা নষ্ট করে যায়নি। ফলে সে ঠকে গিয়ে প্রফেসারদের জিতিয়ে দিয়ে গেল।

বিচিত্র চরিত্র এই ড্রাকুলার। সে নিজ ক্ষমতা লুপ্ত করে মীনার দেওয়া ক্ষমতা তুলে নেয় না। সে-ই আবার প্রফেসারদের বোকা বানিয়ে অন্য পথে চলে গেল।

চালাক কাউণ্ট দলটিকে ধোঁকা দিয়ে ভার্না বন্দরে না এসে জারিনা ক্যাথারিণ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে, ঘন কুয়াশাবৃত সমুদ্র দিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুততায় জাহাজটাকে গ্যালাটজ বন্দরে নিয়ে চলে গেছে।

প্রফেসাররা গ্যালাটজের দিকে রওনা দিল, পথে মীনাকে সম্মোহিত করে জানা গেল—এখন কেউ নেই, দাঁড়ের শব্দ। দূরে কোথায় গুলির আওয়াজ।

তাহলে কি বাক্সটা জাহাজ ছেড়ে জলপথে কোন নৌকায় চলেছে? দেখা যাক। বুদাপেস্ট দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। মীনাকে আরও দুবার সম্মোহিত করা হলো···দূরে অদ্ভুত শব্দ···ভয়ঙ্করভাবে জল পড়ার শব্দ···নেকড়ের গর্জন।

৩০শে অক্টোবর ওরা গ্যালাটজ পৌছল। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো সবাই।

জাহাজটি বন্দরেই নোঙর করা হয়েছে। ক্যাপ্টেনের মুখে শোনা গেল, বিস্ময়কর গতিতে ওর প্রায় অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে 'জারিনা ক্যাথারিণ'—কুয়াশাবৃত হয়ে গ্যালটজ-এ পৌছে গেছে।

ক্যাপ্টেন ডোনেলসন জানায়, বন্দরে পেঁছিবার পর সেদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে একজন লোক ইংলণ্ড থেকে লেখা এক পত্র নিয়ে এসে 'কাউন্ট ড্রাকুলা' নামে চিহ্নিত এই বাক্সটাকে ডেলিভারী নেয়, লোকটির নাম ইমানুয়েল, হিলডেসইম ঠিকানা ১৬নং বার্গেন-স্ট্রাসে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লোকটা হিব্রু। সে জানায় লণ্ডনের মিঃ ডি, ভাইল নামক একব্যক্তির কাছ থেকে সে একটি পত্র পায় এই নির্দেশসহ যে বাক্সটা যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ডেলিভারী নেওয়া হয়। তাতে আরও নির্দেশ ছিল বাক্সটা যেন পেট্রিক ফিনস্কি নামক স্লোভাকদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা একজন লোককে দিয়ে দেওয়া হয়।

পেট্রিক ফিনস্কির সন্ধান নিয়ে জানা গেল সেন্টপিটার গীর্জা প্রাঙ্গনের প্রাচীরের তলায় বীভৎসভাবে গলায় এক ক্ষতসহ মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে প্রফেসরের দল নিম্নলিখিত রূপ সিদ্ধান্তে পেঁছিলো কাউন্টের গতিবিধি সম্বন্ধে—

কাউন্ট ড্রাকুলা নিজ বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে এবং একজনের সাহায্যেই যাবে। মানুষরূপে, বাদুড় অথবা নেকড়ে রূপে যাওয়ার তার শক্তি নেই। নিশ্চয়ই বাক্সের মধ্যে শায়িত অবস্থায় যাবে। স্থলপথে যাবে কি? না, অনেক ঝামেলা? তার ওপর কতগুলো জবরদস্ত লোক তার পেছন ধাওয়া করেছে। রেলে? সেখানেও পার্শেল করাতে নানা ঝামেলা। তার ওপর সময় নষ্ট। অতএব জলপথই হল একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। সবদিক থেকে নিরাপদও। যদিও মনের মধ্যে রাত্রে ছাড়া সে একান্ত অসহায় তবু ড্রাকুলা

কুয়াশা, ঝড়, বন্যা, তুষার এবং নেকড়েদের আদেশ-নির্দেশ দিতে সমর্থ হবে।

এইভাবে কাউণ্টের আধার বাক্সটি সূর্যাস্তের আগেই ডেলিভারি নেওয়া হয়েছে কিনস্কির দ্বারা। সূর্যোদয়ের পর কাউণ্ট নিজের রূপ ধারণ করতে পারবে।

তারপর নিজমূর্তি ধারণ করে কাউণ্ট ড্রাকুলা কিনিস্কিকে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নেয় এবং সাথী সাবুদ নিশ্চিহ্নের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর স্লোভারকদের সাহায্যে ক্রুন নদী বা সেরেথ নদী দিয়ে নৌকো করে নিজের দেশের দিকে রওনা দেয়। এই পথে বিসট্রিটজা মারফৎ বর্গো-পাস-এ পৌঁছে যাবে। এটাই হল ক্যাসল ড্রাকুলা যাবার সবচেয়ে কাছের

রুত ধরে ফেলায় এবং ধাওয়া করে তার পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ায়, তার ওপর ৪১টি আধার নষ্ট করে ফেলায় শত্রু এখন পালাচ্ছে।

কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এ সময়ের সদ্ব্যবহার না করতে পারলে নিজেদের তথা ভবিষ্যৎ জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন করা হবে। শত্রুকে এখন অতি সহজেই শেষ করা সম্ভব। কারণ পাছে নৌকাবাহকরা তাকে দেখে ভয় পায় তাই সে বাক্স থেকে বেরোবে না।

স্থির হলো, একটি লঞ্চে করে লর্ড গডালমিং বা আর্থার এবং জোনাথন যাবে জলপথে। আর নদীর তীর বরাবর রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে ডাঃ সেওয়ার্ড এবং মরিস এগোবে। এবং মীনাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে ডাঃ হেলসিং যাবেন। জলপথে প্রথম দল পেছু নেবে। যদি তীরে ওঠে তাহলে দ্বিতীয় দল ধরবে এবং শেষ করবে। আর মীনারা কাউণ্ট ড্রাকুলার দুর্গসম প্রাসাদের দিকে এগোবে। ওখানে না পেলে সবাই একসঙ্গে ড্রাকুলা ক্যাসল-এ ড্রাকুলাকে আক্রমণ করবে। যুগ যুগ ধরে বিচরণ করে বেড়ানো এই অশুভ শক্তিকে চিরতরে মুক্তি দিতে হবে।

যদি এবার কাউণ্ট ড্রাকুলাকে শেষ করা না যায়, তাহলে কে জানে। যা চালাক ও শক্তিধর, হয়তো শতাব্দীখানেক ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে। তারপর এ যুগের মানুষের যারা প্রিয় এবং আপনজন, যারা ইতিমধ্যেই এর প্রভাবে পড়েছে, তারাই আবার রক্তচোষার ভ্যাম্পায়ার হয়ে দিকে দিকে সর্বনাশ করে বেড়াবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে যার মতো তিন দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো অভিযানে। ক্রমশ ঠাণ্ডা এবং শীত বাড়তে লাগলো। অল্প অল্প তুষার পড়ছে।

আর্থার নিজেই লঞ্চ চালাচ্ছে। একজন ঘুমুচ্ছে, একজন চালাচ্ছে। আবে-

পাশের নৌকাগুলোকে পেছনে ফেলে তারা এগিয়ে চললো। সামনের দিক থেকে যে নৌকা আসছে, তাদের কাছে আর্থার প্রশ্ন করে জেনছে. কোন বাক্সওয়ালা নৌকা এখান দিয়ে কেউ যেতে দেখেনি। স্থানীয় লোকেরা ওদের সরকারী লোক ভেবে সমীহ করে একটু দূরে দূরে থাকতে লাগলো। দু-একটি ভাটির নৌকাকে জিজ্ঞেস করেও একই উত্তর শোনা গেলো, না, নৌকা দেখেনি। তাহলে কি রাত্রির অন্ধকারে সেবেথ নদী দিয়ে পালিয়ে গেল কাউন্টের নৌকো? ২রা নভেম্বর কাটলো।

*　　　*　　　*

তিনদিন ধরে ঘোড়া চালিয়ে ছুটছে ডাঃ সেওয়াড ও মরিস। মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে থামতে হচ্ছে। তুষারপাতের সম্ভাবনা, যদি তুষারপাত বেশী রকমের হয় তাহলে ওদের শ্লেজ গাড়ির সহোয্যে এগোতে হবে।

*　　　*　　　*

ওদিকে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনার জন্যে লঞ্চটা বিগড়ে যায়। আর্থার অ্যামেচার মেকানিক। কোনরকমে সারিয়ে আবার যাত্রা করলো। তবে পিছিয়ে পড়লো অনেকটা। মনে হয় কাউন্টের বোট ধরা ওদের সাধ্যের অতীত। দেখা যাক, ভাগ্য।

৩১শে অক্টোবর দুপুরে মীনা ও প্রফেসার ভেরেস্তি এসে পৌছালো। মীনাকে সম্মোহিত করে বিশেষ কিছু জানা যাচ্ছে না—অন্ধকার……নিস্তব্ধ। ব্যাস এই পর্যন্ত। গাড়ি ও কয়েকটা ঘোড়া কিনে এবং প্রচুর আহার্য বস্তু সংগ্রহ করে আবার রওনা হলো। গাড়ী চালাচ্ছেন প্রফেসার।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে কোন কৃষকের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরেছে। মীনার কপালে কাটা দাগ দেখে এক বাড়ির গিন্নি কতবার যে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলো তার ঠিক নেই। আর খাবারের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে রসুন মিশিয়ে দিলো যে খাওয়াই কষ্টকর হলো। এরপর থেকে মীনা অন্য কোন বাড়িতে যাওয়ার আগে টুপি নিয়ে কপালটা ঢেকে রাখতো। অক্লান্তভাবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসার। সন্ধ্যের আগে মীনাকে সম্মোহিত করে ঐ একই উত্তর পাওয়া গেল অন্ধকার…জলের শব্দ… কাঠ বা বনের মর্মর ধ্বনি।

তাহলে বোধ হয় শত্রু এখনও জলে। ক্রমে একসময় বাতাস যেন ভারী হয়ে এলো অদ্ভুতভাবে। এত শীত যে কারের কোটেও কিছু হলো না।

মীনার মনটা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, কিছু ভাবা যাচ্ছে না। জোনাথন এখন কেমন আছে? কোথায় আছে? কখন আবার দেখা হবে। মনটা হন্যে হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোথায় চলেছে, কেন চলেছে। মৃত্যু ফাঁদে পা দিচ্ছে না তো? ঈশ্বর জানেন। তিনিই রক্ষা করবেন। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

২রা নভেম্বর। কার্পেথিয়াম পর্বত মালায় প্রবেশ করেছে পথ। রাত শেষ হলে তারা বর্গোপাস-এ পৌঁছে যাবে। বাড়ি ঘর আর দেখা গেলো না।

৪ঠা নভেম্বর। অকল্পনীয় ঠাণ্ডা। দুর্দান্ত শীত। মীনা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেবল ঘুম আর ঘুম তার চোখে। ক্ষিদে তৃষ্ণা বলে কিছু নেই ওর। উৎসাহ উদ্দীপনাও কমে গেছে। ওর সম্মোহিত হবার শক্তি একেবারে কমে গেলো। ডাঃ হেলসিংগ ব্যর্থ হলেন কয়েকবার। বহুকষ্টে মীনাকে একবার আচ্ছন্ন করে জানা গেল···অন্ধকার···জলের কলকল শব্দে···অর্থাৎ কাউন্ট ড্রাকুলা এখনও বাক্যবন্দী হয়ে জলপথেই নৌকো করে চলেছে। গাড়ি চড়াই পথে উঁচু উঁচু আরও উঁচু পথে উঠতে উঠতে চলেছে। চারিদিকের পরিস্থিতি এত পাহাড়ী এবং বন্য যে মনে হয় এ বুঝি পৃথিবীর অন্তিম সীমা।

* * *

একজায়গায় গাড়ি থামানো হলো। মীনা ঘুম থেকে উঠেছে। সে যেন হঠাৎ তাজা হয়ে উঠেছে। এরকম চনমনে চঞ্চলতা অনেকদিন দেখা যায়নি। মীনাকে এরপর বারবার চেষ্টা করেও সম্মোহিত করা গেল না। মীনা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন খোড়া হতে মীনাকে জাগাতে গিয়ে ডাক্তার ব্যর্থ হলেন। মেয়েটাকে দেখে বিস্মিত হলেন। ঘুমের মধ্যেও স্বাস্থ্য যেন অদ্ভুত ভাল হয়ে গেছে, গায়ের রঙ আরও লাল টুকটুকে। ব্যাপারটা তার ভাল মনে হলো না। তিনি সত্যিই ভীত হলেন। নানারকমের ভয় এসে তার মনে ভিড় করলো

এই সময়ে লুসির কথা মনে পড়তেই ডাঃ হেলসিংগের মনটা কেঁদে ওঠে। অমন ভাল মেয়ে! কিন্তু মীনা তার চেয়ে অনেকাংশে সেরা, সে মেয়ে কেমন হয়ে গেল। কেমন আচ্ছন্নভাব। সবচেয়ে বড় কথা কিছু খাচ্ছে না। অথচ বলছে 'খেয়েছি, সব দুর্লক্ষণ যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে।

না, না একে হারালে চলবে না।

অদ্ভুত শক্তির কাছে কিছুতেই মাথা নত করবে না। ড্রাকুলা, তুমি যেখানেই পালাও, তোমার নিস্তার নেই। তোমার অন্তিমকাল আসন্ন।

দৃঢ় শপথ বাক্য মনে মনে উচ্চারণ করলেন প্রফেসার।

পাহাড় পর্বত ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠলো। ভয়াবহ সব পর্বতশৃঙ্গ, টিলা, গহ্বর পথে পড়তে লাগলো। মীনা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে কেবল ঘুমোয়। ডাক্তারের ভয় হলো, ভ্যাম্পায়ারের কোন অদৃশ্য মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে মেয়েটা আচ্ছন্ন হয়ে গেলো না তো?

এবার প্রস্তাবকীর্ণ পথে গাড়ি ক্রমশঃ শীর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই শীর্ষেই ড্রাকুলার বাসস্থান। এসে গেছে। শেষ পরিণতি ভাল হোক, মন্দ হোক, সেইক্ষণ আগতপ্রায়।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। প্রফেসার গাড়ি থামিয়ে একটা আশ্রয় স্থান খুঁজে ঘোড়াগুলোকে খুলে দিলেন মীনা জেগেছে। চমমনে ভাব। প্রফেসার নিজে রান্না করে মীনাকে খেতে বললেন। কিন্তু মীনা জানালো তার একদম খিদে নেই। প্রফেসার মীনার চারপাশে গণ্ডি কেটে পবিত্র ওয়াকার ছুঁইয়ে ওকে অশুভ শক্তির অমঙ্গলকরণের স্পর্শ থেকে মুক্ত করে রাখলেন। মীনা তার মধ্যে মরা মানুষের মত নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। সে নীরব। তার গায়ের রঙ ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে এলো।

প্রফেসার ভীত হলেন, এগিয়ে গেলেন, মীনা তাকে জড়িয়ে ধরলো, অজানা আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

হঠাৎ ঘোড়াগুলো আর্তনাদ করে উঠলো, ডাক্তার গিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে শান্ত করলো, জীবগুলো যেন একটু আনন্দ ও স্বস্তি পেলো। সারারাতে প্রায় কয়েকবার এরকম করতে হয়েছে প্রফেসারকে। তুষার পড়তে শুরু করলো। ডাক্তার সেই তুষারে নানারকম নারীর রূপ দেখতে পেলেন। তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সেই তিনটি মেয়ে, যাদের জোনাথন দেখেছিল ড্রাকুলা ক্যাসলে, সেই তারাই ঐ তুষার কণার মধ্যে মূর্তি সৃষ্টি করে ওদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পবিত্র গণ্ডি দেওয়া আছে বলে খুব কাছে আসার শক্তি নেই ওদের। সেই অলৌকিক মেয়েগুলির উজ্জ্বল রক্তের মত চোখগুলি, সাদা ধবধবে তীক্ষ্ণ দাঁত এবং পুরু মোটা ঠোঁট স্পষ্ট দেখলেন ডাক্তার। তারা যেন মীনার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে। সেই মেয়েটি হাত নেড়ে মীনাকে উদ্দেশ্য করে খ্যানখেনে গলায় বললো—এসো বোন, আমাদের কাছে এসো।

ডাক্তার আঁতকে উঠলেন।

সর্বনাশ। এ ডাক ভীষণ ভয়ঙ্কর। এ ডাকের দুর্নিবার আকর্ষণে সবকিছু মানুষ ছুটে যাবে ঐ মরণের দিকে। মীনা কি এ ডাকে সাড়া দিল ?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডাঃ হেলসিংগ আর শান্ত হয়ে থাকতে পারলেন না।

তিন রূপসী রমণী বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে চলেছে আর ডেকে চলেছে—এসো, এসো বোন, আমাদের কাছে এসো।

আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এখুনি যা করার করতে হবে।

ডাক্তার দ্রুত হাতে সামনের প্রজ্বলিত আগুনে কিছু পবিত্র "ওয়াকার" ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন রূপসী হাসতে হাসতে দূরে সরে গেল।

মীনা খুব একটা ভয় পায় নি, তাই একটু নিশ্চিন্ত। বেচারা ঘোড়াগুলিও এবার চুপ।

সকাল হলো। মীনা তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। তাকে জাগিয়ে সম্মোহিত করার ইচ্ছে ছিল প্রফেসারের, কিন্তু মীনাকে জাগানো গেল না। ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাতেই ডাক্তারের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হলো—সব ঘোড়াগুলো মরে পড়ে আছে! চমৎকার!

* * *

৫ই নভেম্বর। ডাঃ সেওয়ার্ড ও মরিস, লক্ষ্য করলো নদীর দিক থেকে মালটানা গাড়ি নিয়ে তড়িৎ গতিতে সজগ্যানি তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তুষার পড়ছে। মন ভারাক্রান্ত। দূরে নেকড়ের পালের চীৎকার। বিপদ যেন চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে ঘোড়া চালিয়ে ওরা এগিয়ে গেল।

* * *

ডাঃ হেলসিংগ তার দিনলিপিতে লিখেছেন, ৫ই নভেম্বর, বিকেলে। তিনি একেবারে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে আছেন। মীনাকে রক্ষা করার স্বরূপ মন্ত্রপূতঃ গণ্ডির মধ্যে রেখে তিনি ড্রাকুলার ক্যাসল-এর দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে আনা বড় হাতুড়ির আঘাতে দুর্গের দরজার কব্জা ভেঙে দিলেন। পাছে তিনি ভেতরে ঢুকলে কেউ পেছনে দরজা বন্ধ করে দেয় তাই তিনি দরজা ভাঙলেন।

গেটের মধ্যে ঢুকে ডাঃ হেলসিংগ একটু চুপ করে দাঁড়ালেন। কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা পচা পচা দুর্গন্ধ বাতাসে ভাসছে। তিনি জানেন, এর ভেতরে কোন জীবিত মানুষ নেই। বিরাট বিরাট ঘরগুলি ফাঁকা এত বড় এবং এত

ফাঁকা তবুও তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠছেন। যুগযুগান্ত ধরে অনিষ্টকারী এক দানবের আবাসস্থল এই ক্যাসল।

এতক্ষণে চিন্তার ঘোর কাটিয়ে উঠলেন প্রফেসার। না, এবার কাজে নামতে হবে।

হল, সিঁড়ি, অলিন্দ, দালান, আবার সিঁড়ি পেরিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন প্রাচীন চ্যাপেল গীর্জায়। আসল কাজ এখানে অপেক্ষমাণ তা তিনি জানেন বাতাস অত্যন্ত ভারী ও চাপা। হঠাৎ একটা তপ্ত গন্ধকের ফেনার গন্ধ নাকে আসতে তাঁর মাথা যেন ঝিমঝিম করে উঠছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে হিংস্র নেকড়েদের কোরাস গর্জন।

মীনার কথা মনে পড়তে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। যদিও তাকে তিনি পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে রেখে এসেছেন, কিন্তু সেটা কি নেকড়েদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার পথ নেই। যদি মীনাকে নেকড়েরা আক্রমণ করে তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বরের সেই ইচ্ছাই ছিল।

প্রথমে তিনটি কবর পেলেন ডাক্তার। তিনি জানেন, এতে ঐ তিন রূপসী মেয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ ডাক্তারের মনে হলো, তিনি যেন খুন করতে এসেছেন ওদের। তিনি অপরাধী। তাঁর সারা অন্তর একটা অপরাধ বোধে হেরে গেলো। খুব সম্ভব এর আগে আরো অনেকে এদের মুক্তি দিতে এসে দুর্বল হয়ে পড়ে নিজেরাই এবং ওদের কচিলিত হয়ে পরিণত হয় অ-মৃতে। রূপ এদের বিভিন্ন কিন্তু গন্ধ এক। এতসব জানা ও হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ডাক্তার যেন কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। সর্বাঙ্গ তাঁর অবশ হয়ে আসছে। দুচোখের পাতা জুড়ে আসছে।

হে ঈশ্বর, আমায় জাগিয়ে রাখো।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্তব্য সাধন করতেই হবে।

কর্তব্যে অটল রইলেন প্রফেসার। সত্যিই তাঁর মনোবলকে বাহবা দিতে হয়। বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সে কাজ হাসিল করতেই হবে। মনের অনিচ্ছাকে প্রকটভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন তিনি।

এগিয়ে গেলেন কবরগুলির দিকে।

জোর করে পরপর সমাধিস্থ তিনটি সুন্দরী নারীরূপিনী ঐ ভ্যাম্পায়ারদেরই তিনি যথোচিত এবং যথাবিহিতভাবে সংকার সাধন করে দিলেন বীভৎস প্রক্রিয়ায়।

মেয়ে তিনটি অ-মৃত থেকে সাধারণ মৃতে পরিণত হলো। তাদের আত্মা মুক্তি পেলো।

এছাড়াও আরো একটি বিরাট, অভিজাত পূর্ণ ও সুন্দর সমাধিক্ষেত্র রয়েছে। ওপরে মাত্র একটি শব্দ লেখা আছে—

ড্রাকুলা

কিং ভ্যাম্পায়ারের অ-মৃত আশ্রয়স্থান তাহলে এটি। এখন খালি। তাই প্রফেসার যাতে কাউন্টের অ-মৃত অবস্থা কোনদিন এতে প্রবেশ করতে না পারে তাই কিছু পবিত্র ওয়াকার স্থাপন করলেন।

সুন্দরী মেয়ে তিনটির বুকে কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ করার সময় তাদের শবদেহ দুমড়ে মুচড়ে উঠলো, মুখ দিয়ে রক্ত ফেনার গ্যাজলা উঠলো। তারপর ছুরি দিয়ে ওদের একের পর এক মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। দেখা গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিচারণ করা ভ্যাম্পায়ার হওয়া দেহ তিনটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেবল কফিনের মধ্যে পড়ে রইলো ভ্যাপসা পচা গন্ধের মাটি।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। যাতে কাউন্ট দরজা পেরিয়ে ক্যাসল বা চ্যাপেলে প্রবেশ করতে না পারে তাই আবার মন্ত্রপুত গণ্ডি টেনে দিলেন।

ফিরে এসে দেখে মীনা তার মন্ত্রপুত গণ্ডির মধ্যে জেগে বসে আছে। তাঁকে দেখেই সে বলছে—প্রফেসার, এই নরককুণ্ডে আর নয়, ফিরে চলুন। জোনাথনের কাছে চলুন। মীনার দেহটা কেমন দুর্বল আর ক্যাকাসে।

দলের অন্যান্যদের সঙ্গে এবং ভয়ঙ্কর কাউন্ট ড্রাকুলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ডাক্তার মীনাকে নিয়ে পূর্বদিকে এগোলেন।

বিকেলবেলা। ভীষণ খাড়াই পাহাড়ে পথ দিয়ে ওরা নেমে যাচ্ছিল। মাইল খানেক গিয়েই মীনা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বিশ্রামের জন্যে পথের ধারে বসে পড়লো। পেছনে আকাশের নীলিমাসহ কার্পেথিয়াম পর্বতের আড়াল থেকে দূরে কাউন্ট ড্রাকুলার ক্যাসল দেখা যাচ্ছিল। কেমন গা ছমছম করা পরিবেশ। বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল নেকড়ের চীৎকার।

কিছুদূর যাবার পরে একটা গুহার মত স্থান প্রফেসারের নজরে পড়লো। একটা পাথরের দরজা রয়েছে। ভারী সুন্দর আশ্রয়। নেকড়ে এলে একে একে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সুবিধা হবে।

প্রফেসার তার ব্যাগ কিল্ড গ্লাস (দূরবীন) চোখে লাগিয়ে জোরে বলে

উঠলেন—ঐ যে অনেক দূরে একদল লোক ঘোড়ায় করে নিচে থেকে উঠে আসছে। একটা মালটানা ঘোড়ার গাড়িও আসছে। গাড়িতে একটা চৌকো বাক্স বসানো রয়েছে।

ডাক্তারের বুক ধড়াস করে উঠলো। এবার কি সত্যি সত্যিই 'তিনি' আসছেন।

দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসছে। গাড়ি ও মানুষগুলি যেন অসম্ভব গতি পাহাড়ের রাস্তা ধরে এঁকে-বেঁকে নিচ থেকে উপরে আসছে।

ডাক্তার গুহার দরজায় গণ্ডি কেটে দিলেন। আপাতত কাউণ্টের হাত থেকে এইভাবে দূরে থাকতে হবে।

কি সর্বনাশ। সময় আব নেই। কই, ওরা তো এখনো এসে পৌছালো না!

কি ব্যাপার?

পরক্ষণেই ডাক্তার উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন—ঐ তো দুজন ঘোড়সওয়ার প্রচণ্ডবেগে এই দিকেই ছুটে আসছে। বুঝতে দেরি হলো না। ওরা মরিস ও সেওয়ার্ড। এরপর উত্তর দিক থেকে আরও দুজন অশ্বারোহী, আর্থার ও জোনাথন জোর কদমে এগিয়ে আসছে। একবার মীনা, একবার ডাক্তার, বারবার ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগলো।

ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সমস্ত দলটা। আক্রমণ করতে হবে। উইনচেস্টার হাতে নিয়ে ডাক্তার প্রস্তুত হলেন। মীনার হাতে রিভলবার। ঐ ঘোড়ার গাড়ির সামনে পেছনে ডাক্তারের দল লোক। ড্রাকুলা, এবার তোমার ভবলীলা সাঙ্গ। আর পালাবে কোথায়?

পরমুহূর্তেই নেকড়ের হিংস্র ভয়াবহ গর্জন শোনা গেলো। ক্রমশঃ সে চিৎকার স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকলো।

সামনে তুষার পড়ছে। কিন্তু দূরে সূর্যের শেষ আলোর আভাটুকু পর্বত চূড়ায় লেগে আছে।

শিকার ধরার জন্যে হিংস্র নেকড়েগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওৎ পেতে রইলো। তুষার ঝড় শুরু হলো। প্রবল তুফানী বাতাস বইতে লাগলো।

পাহাড় চূড়ার পেছনে ক্রমশঃ সূর্য গা ঢাকা দিচ্ছে। সূর্যাস্ত হলো বলে। জিপসীদের মাল বওয়া গাড়ি অনুসরণ করে অনুসরণকারীর দলও প্রবল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

প্রফেসার আর মীনার হাতে অস্ত্র। পাথরের দরজার আড়াল থেকে দুজনে ওদের আগমন লক্ষ্য করছে। সামনে পেছনে দুদিক দিয়েই আক্রমণ করা হবে।

মিনিট কাটতে না কাটতেই দুটি কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো বাতাসে : আদেশ করছে—হল্ট !!

বোঝা গেল কণ্ঠস্বর দুটি জোনাথন ও মরিসের। জিপসীদল ওদের ভাষা বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওদের কথার ভঙ্গীতে ঘোড়া থামিয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসে গাড়ির এক পাশে দাঁড়ালো লর্ড গডালমিং (আর্থার) ও জোনাথন হার্কার।

অন্য পাশে দাঁড়ালো অন্য দুই ঘোড়সওয়ার ডাঃ সেওয়ার্ড ও মরিস।

প্রথমে সবাই হকচকিয়ে থেমে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু জিপসী সর্দারের অবোধ্য নির্দেশে লোকগুলো ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে আবার চলতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে চারটে উইনচেস্টার রাইফেল তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। থামতে আদেশ দিল। অকস্মাৎ সামনের গুহা থেকে রাইফেল হাতে মীনা ও প্রফেসর বেরিয়ে এলেন।

চারদিক দিয়ে আক্রান্ত দেখে লোকগুলো আবার গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো। জিপসী সর্দার তাদের দিকে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতেই তারা যে যার ছুরি, পিস্তল বের করলো।

সর্দার তার ঘোড়াকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বার দুয়েক দুর্গের দিকে এবং দুবার অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে কি যেন অবোধ্য ভাষায় বলে উঠলো।

চোখের নিমেষে ঘোড়া থেকে নেমে এরা চারজন যে গাড়ীর ওপর বাক্সটা ছিল সেদিকে ধেয়ে গেলো। জিপসী সর্দারের ইঙ্গিত পেয়ে লোকগুলোও গাড়ীটাকে ঘিরে দাঁড়াবার জন্যে ছুটোপাটি করলো।

সূর্যাস্তের আগেই তাদের কাজ শেষ করতে হবে—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের আর কেউ বুঝি ঠেকাতে পারবে না। সামনে ঝকঝকে জিপসীদের ছুরি আর পেছনে নেকড়ের গর্জন তাদের কাছে থোড়াইকেয়ার। ওদের একগুঁয়ে ও ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তির কাছে জিপসীরা পরাজয় স্বীকার করলো এবং ওদের পথ করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

জোনাথন তড়িৎগতিতে মালবওয়া শকেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর অভাবনীয় শক্তিতে বিশাল বাক্সটাকে দুহাতে তুলে রাস্তার ধারে ফেলে দিল।

তৎক্ষণে মরিস এসে হাজির। দুজনে প্রবল বিক্রমে হাতের বিশাল কুকরি ছুরি দিয়ে কফিনটার ডালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো।

একসময় বিশ্রী শব্দ করে পেরেক উঠে বাক্সের ডালা খুলে গেল।

জিপসীরা ব্যাপার দেখে থ। কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিছুই তাদের বোধগম্য হলো না।

ডালা খোলা বাক্সটার মধ্যে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখে জিপসীদের আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তারা কি এতক্ষণ ধরে একটা মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসছিল?

পাহাড় চূড়ার আড়ালে সূর্য ডুবু ডুবু। তুষারাবৃত স্থানের এদিকে ওদিকে তার ছায়া পড়েছে।

ডালা খোলা কফিনের মধ্যে শুয়ে আছে স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা। হিম ফ্যাকাসে তার দেহ, যেন মোমে তৈরী। চোখের তারাদুটি স্থির, সেখানে ফুটে আছে অকথ্য ঘৃণা ও হিংস্রতা। অস্তগামী সূর্যের রশ্মি সেই রক্তহীন চোখে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফুটে উঠলো বিজয়ের হাসি হাসি ভাব।

ক্ষণিকের মধ্যে জোনাথনের বিরাট ও কালান্তক আক্রমণ করলো কাউন্টের গলা, দ্বি-খণ্ডিত হলো। মরিসের হাতের ছুরিও সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টের বুক ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল।

এ যেন মিরাকল, এ যেন অবিশ্বাস্য এক যাদু।

নিমেষের মধ্যে কাউন্ট ড্রাকুলার সেই কফিনের মধ্যে রাখা দেহ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল। সেখানে কেবল পড়ে রইলো মাটি। আর নাকে এলো পচা প্রাচীন মাটির দুর্গন্ধ।

দূরে দেখা যাচ্ছে ড্রাকুলার ক্যাসল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আধো আধো অন্ধকার। আলো আঁধারিতে অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে প্রাসাদটিকে। মনে হয় অপার্থিব এক দুর্গ।

ড্রাকুলার মৃতদেহ এমনভাবে হাওয়ার মত মিলিয়ে যেতে এবং আক্রমনকারী লোকগুলোর অভাবনীয় রোমহর্ষক কাণ্ড দেখে জিপসীরা দিশেহারা হয়ে উঠলো। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে ছুটলো। আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড। ড্রাকুলার দেহ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র নেকড়ের গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেল এবং কোথায় হারিয়ে গেল।

এদিকে ঘটলো আর এক বিপদ। জিপসীদের একজনের ছুরির আঘাতে

মরিসের আঙুল কেটে গিয়েছিল। প্রবলভাবে রক্ত বেরোচ্ছে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সবাই হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে ছুটে এলো।

—কি হল? কি হয়েছে?

মরিসের ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল—আমি আপনাদের সঙ্গে এই মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি ভেবে আমি আনন্দিত, গর্ববোধ করি। হে ঈশ্বর। এর জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে কষ্ট নেই। সে উঠে বসলো, কোন কাজে বৃথা যায় নি ভেবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। কুপ্রভাবের অভিশাপ থেকে মীনা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। তার কপালের দাগ এখন অতি পবিত্র ও নির্মল। বন্ধুগণ, বিদায়।

বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করে নিল মরিস।

* * *

কাহিনী এখানেই শেষ।

না, আরেকটু আছে। সেটুকু শেষ হলেই মঞ্চের পর্দা পড়ে যাবে।

এরপর কেটে গেছে সাতটি বছর। এরমধ্যে মীনা হার্কার ও জোনাথন একটি ছেলের বাবা ও মা হয়েছে। ওরা ওদের মহৎ হৃদয় ও দলীয় বন্ধু কুইন্সে পি মরিসের কথা মনে রেখেছে। ওদের ধারণা, মরিস-ই তাদের সন্তান হয়ে তাদের কাছে এসেছে। তাই তারা কোনদিন তাকে ভুলবে না। ছেলের নাম রেখেছে—কুইন্সে।

সেই ক্যাসল ড্রাকুলা যেটা এককালে সাংঘাতিক ভয়াবহ স্থান দুর্গ ছিল ট্রানসিলভ্যানিয়ার সেখানে একবার ওরা ঘুরে এসেছে। সেখানে এখন নেই ভ্যাম্পায়াররূপী ভয়াল কাউন্ট ড্রাকুলার বাস। চিরতরে মুক্তি পেয়েছে অভিশপ্ত রক্তচোষা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ারের দল। সেখানে এখন অনন্ত শান্তি।

কেবল স্মৃতি হিসেবে জেগে আছে কার্পেথিয়াম পর্বতের কোন এক চূড়ায় অবস্থিত ড্রাকুলার সেই কুখ্যাত দুর্গ প্রাসাদ।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

কার্পেথিয়ায় যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তাই আছে, যার আগাগোড়া যেমন এবড়ো-খেবড়ো তেমনি অমসৃণ। যতই কার্পেথিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই রাস্তার মলিনতা ক্রমশঃ বেড়েছে। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে উৎকটভাবে। রাস্তার দু'ধারে নিবিড় অরণ্য। ক্রমশঃ হানাহানি করে এগিয়ে এসেছে রাস্তার ওপর। ফলে রাস্তা ক্রমশঃ সরু হতে শুরু করেছে। চারপাশের রুক্ষ ধূসর অথবা সবুজে ঢাকা পাহাড়গুলোও ষড়যন্ত্র করেছে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়োর দাপটে আরও অন্ধকার ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে শীর্ণ সঙ্কীর্ণ ঐ পথের রেখা।

অমসৃণ বন্ধুর পথ দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে গাড়ির চাকায়। লোহার চাকার অবিরাম পদাঘাতে পাথরে পাথরে নিরবচ্ছিন্ন আর্তনাদ। কান পাতা দায়। নিথর নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দূরের শিলাস্তূপগুলোর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে কর্কশ আওয়াজ—প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে, দূর হতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই অলৌকিক শব্দরাশি।

ঘোড়ার গাড়িতে মাত্র চারজন আরোহী। সারাদিনের পথশ্রমে প্রত্যেকেই অবসন্ন, শরীর তাদের বইছে না। রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করেছে গাড়ি। পথশ্রমে তার গাড়ির বিরামহীন ঝাঁকুনিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল।

এর আগে তারা যখন এসেছিল তখন ভিয়েনায় একটা আরামপ্রদ হোটেলে উঠেছিল। কিন্তু সেরকম হোটেল এমন অঞ্চলে আশা করা যায় না। তবুও রাত্রি কাটাবার জন্য একটা হোটেল পেলেই যথেষ্ট।

একজন আরোহী একটা ম্যাপ খুললো। পেছনে ফেলে এসেছে অনেক রাস্তা। কিন্তু পথের পরিস্থিতির কথা ভেবে উদ্যম হারিয়ে ফিরে যাওয়াও ঠিক হবে না। অতএব এগিয়ে যেতে হবে। এদিকে অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। নিবিড় অরণ্য সেজেছে অন্ধকারের কালো ঘোমটা পরে, থমথমে পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তার জাল বিস্তার করছে—নেমে আসছে রহস্যময় অমানিশা।

তারা নাকি শুনেছে, অন্ধকারে ঘোড়া পথ চলতে চায় না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কেবল ধীরে ধীরে হাঁটে। এই মুহূর্তে এই ঘোড়া দুটিরও একই অবস্থা। অন্ধকারে তারা ঘাবড়ে যাচ্ছে। এগোতে চাইছে না। ঘন ঘন চাবুকের আঘাত পড়ছে তাদের পিঠে। কিন্তু তাদের কোন পরিবর্তন নেই। অথচ তীব্র শপাং শপাং আওয়াজে বাতাস যেন কঁকিয়ে উঠছে। ঘোড়া দুটি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে এত তাড়না ও প্রহার। শ্লথ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঠিক তার পূর্বক্ষণেই যাত্রীরা খুব জোর চাবুক মারার শব্দ পেয়েছিল। বোধহয় সহিস লাগাম টেনে ধরেছে

একজন যাত্রী জানলা দিয়ে উঁকি দিলো—কি গো, আমরা কি পথ ভুল করেছি?

না। সব ঠিকই আছে। ঐ তো একটু দূরে সরাইখানার দীপ দেখা যাচ্ছে। দরজা খুলে মালিক বেরিয়ে আসছে। সহিস তার আসন ছেড়ে নীচে নেমে এলো।

দুজনে ধরাধরি করে মালপত্র সব গাড়ী থেকে নামালো। চার যাত্রীর বুকে যেন জল এলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। একেবারেই সাধারণ সরাইখানা। বিলাস করার কোন চিহ্নই নেই। যাক, হাত-পা গুলো তো একটু বিশ্রাম পাবে।

চারযাত্রী খুশী মনে ভেতরে প্রবেশ করলো। তারা লক্ষ্য করলো, কতগুলো লোক এলোমেলো ভাবে বসে আছে এদিক ওদিক। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

অরণ্যের অন্ধকারে ঢাকা গরীব চটিতে খানদানা অতিথির আগমন খুব কমই হয়। তাই আনন্দে উথলে উঠলো সরাইখানার মালিক। সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে এনে দিল হাত মুখ ধোয়ার গরম জল আর ক্লান্তি দূর করার জন্য উষ্ণ পানীয়।

চার ইউরোপীয় যাত্রী সন্তুষ্ট হয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলো গরম জলে। তারপর আরাম করে বসলো আগুনের পাশে রাখা বেঞ্চটায় মালিকের আন্তরিক আপ্যায়ন তাদের মনকে আকর্ষণ করলো।

চারজন যাত্রীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো চার্লস, তেমনি চঞ্চল। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে সে পারে না তাই সরাইখানার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন তেমন জার্মানে কথা বলছিল।

ভ্রমণের নেশায় সে মাতাল। তার মন সর্বদা চায় নতুনের স্বাদ। জীবনী শক্তিতে টইটম্বুর তার অন্তর। কৌতূহল নামক অগ্নিশিখা যার অণু পরমাণুতে সর্বদা দহিত হচ্ছে, তার হাত-পা জিভ কি বেঁধে রাখা যায়! কৌতূহলের দাপটেই তো ভ্রমণ।

সরাইখানার বেশীর ভাগ লোক সাদা মাটো গেঁয়োর দল। স্থানীয় ভাষায় বকবক করছে। কয়েকজন চার্লসের মত ভুল জার্মানীতে বাক্য গঠন করে চলেছে।

সরাইখানার মালিক ঘরে এসে ঢুকলো, হাতে একটা সবুজ ট্রে। ট্রে-তে পাশার ছক। চার্লসকে খেলার জন্য ডাকলো।

খেলা শুরু হলো। প্রথম দান চার্লসের। সে-ই জিতলো প্রথমবার। আবার চাল দিল, আবার জিতলো। পর পর এইভাবে কয়েকবার জিতে নিলো। তাকে ঘিরে সরাইখানায় শুরু হয়ে গেল হুল্লোড়। সবাই এসে চার্লসকে ঘিরে ধরলো। আর এইসব অচেনা অশিক্ষিত মানুষগুলোর সঙ্গে ভাব করার এই তো সুযোগ—চার্লস জানে। তাই সে নিজের পয়সা খরচ করে মদ আনালো। প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলো সুরার গ্লাস। ব্যস, কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ভাব জমে গেল চার্লসের।

এই হলো চার্লসের চরিত্র। উদ্দাম, প্রাণখোলা জীবনী শক্তিতে যেন সর্বক্ষণ ফেটে পড়ছে। যথেষ্ট টাকার মালিক সে। কিন্তু সঞ্চয় কাকে বলে, তা সে জানে না। টাকার বিনিময়ে জীবনকে উপভোগ করতে সে জানে এবং সবাইকে নিয়ে।

চার্লসের ভাইয়ের নাম এলানা। বাবার টাকাকড়ি দুজনেই সমানভাগে পেয়েছে। কিন্তু চার্লসের স্বভাব এলানার ঠিক উল্টো। এলানা হলো হিসেবী, কঠোর বাস্তববাদী। ছোটভাই চার্লসের মত সে মোটেও উচ্ছৃঙ্খল নয়। সে জানে, রুটিনমাফিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে। যুক্তির অনুশাসনে নিত্য কর্মধারা তার বাঁধা।

এলানা যেমন, ঠিক তেমন তার স্ত্রী—হেলেন। স্বামীর মতই কৃপণ। বিলাসিতা একেবারেই পছন্দ করে না। কাঠ কাঠ চেহারা, মুখে নেই এতটুকু লাবণ্য। বেড়াতে-টেড়াতে যাওয়ার তাদের বালাই নেই।

আর চার্লসের স্ত্রী ডায়ানা ঠিক তার মতো। হৈ-হুল্লোড় পেলে আর কিছু চায় না। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে হৈ হৈ করে উপভোগ করাই তার উদ্দেশ্য।

লাবণ্যময়ী নারী। নীল চোখদুটিতে রাজ্যের বিস্ময়। একেবারে যেন মোমের পুতুল। পাকা ধানের মত সোনালী গায়ের রঙ। সত্যিই অপরূপা ডায়ানা। তার দেহে এবং মনে সুন্দরের বাস।

চার্লস এমন হৈ হৈ করছে, সারা সরাইখানাটাকে মাথায় করে রেখেছে, এটা তার বৌদির চোখে ভাল লাগছে না। চার্লস এসে দাঁড়ালো তার হাস্যমুখী স্ত্রীর পাশে। খালি সুরাপাত্র নিজের হাতে ভরে নিল।

তার বৌদি বললো—চার্লস মদের পেছনে অনেক টাকা ওড়ালে। আর খেয়েছোও যথেষ্ট। কিন্তু যাদের তুমি খাওয়ালে, মানে যাদের জন্যে এত টাকা ব্যয় করলে, তারা তোমাকে স্রেফ একটা বোকা ভাবছে।

চার্লস বৌদির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো—উঁহু বৌদি, ভুল বললে। আমি ওদের মদ খাইয়েছি ঠিকই, টাকা খরচ হয়েছে অনেক। কিন্তু ওরা যত না আনন্দ পেয়েছে আমি পেয়েছি তার দ্বিগুণ। কি বল দাদা, তাই না?

এলানা ভায়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না। এটা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। তাই একটু হাসল।

তখন ডায়ানা রীতিমত মাতাল হয়েছে। নেশা-নেশা চোখে সবার অলক্ষ্যে একবার তাকালো স্বামীর দিকে। এক টুকরো অর্থপূর্ণ হাসি তার লাল ঠোঁটে খেলে গেল।

এ হাসির অর্থ কি, সেটা একমাত্র চার্লসই জানে—চলো, শুতে যাই। রাত অনেক হলো। কাল ভোরে তো আবার উঠতে হবে। চোখের কথা মন দিয়ে বুঝে নিল চার্লস।

ঠিক এই সময়ে সরাইখানার দরজা খুলে গেল। বাইরের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় অবাধে ঘরে ঢুকে পড়লো দলে দলে। হঠাৎ ঠাণ্ডার আক্রমণে চারজনেই শিউরে উঠে পেছন ফিরে তাকালো।

এক সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকলেন। পরনে তাঁর আলখাল্লা। তীব্র চাউনি, দাম্ভিক পদক্ষেপ।

ঘরে ঢুকেই তিনি রেগে গেলেন, তাকিয়ে আছেন কড়িকাঠের দিকে। সবাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, ঝুলছে একগোছা রসুন। তিনি সদর্পে টান মেরে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেগুলো আগুনের মধ্যে।

তারপর তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ইডিয়েট কোথাকার। বার বার

করে বলেছি যে সে আর এখানে নেই। সে মারা গেছে। দশ বছর আগে তার মৃত্যু ঘটেছে। তবু মন থেকে ভয় যায় না ?

এতক্ষণ ধরে যে ঘরে হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টা চলছিল, তা নিমেষের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই নীরব। সরাইখানার মালিক তাড়াহুড়ো করে এক কাপ সুরা এনে তার সামনে ধরলো। ঢকঢক করে গিলে ফেললেন সন্ন্যাসী। তারপর চার আগন্তুকের দিকে তাকালেন—আপনারা দেশ বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, বলবেন কি ?

চার্লস বললো—যোশেফবাদ।

সন্ন্যাসী শিউরে উঠলেন। বললেন না। ওদিকে ভুলেও পা দিবেন না।

চার্লস একটু হাসলো। মনে মনে ভাবলো—কোথাকার কোন সন্ন্যাসী এসে উদয় হলো। ওর কোথায় ভ্রমণের তালিকা পরিবর্তন করবে সে ? কক্ষনো না। তাই মুখে বললেন—এ অঞ্চলের সৌন্দর্য উপভোগ করতেই আমরা এসেছি। এতদূর অগ্রসর হয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

সন্ন্যাসী থমকে গেলেন। বললেন—আমার নাম ফাদার স্তাণ্ডোর। ক্লেইনবাগে আমার মঠ আছে। চলুন আপনারা ওখানে থাকবেন।

—কিন্তু পাহাড়ে উঠবো বলেই আমরা বেরিয়েছি। এখন আগে সেখানে উঠি। পাহাড়ের সৌন্দর্স দেখে চোখ সার্থক হোক। চার্লস উত্তর দিলো।

—বেলেডামা দূর থেকেই সুন্দর, কিন্তু—ফাদারের কণ্ঠে বাঁকা বিদ্রূপ, কাছে গেলে বিষ।

চার্লস কোন জবাব দিলো না।

—বেশ, আপনারা যখন ওখানে যাবেনই, তখন আমি আর বাধা দিই কেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, কেল্লার কাছে ভুলেও ঘেঁষবেন না।

এই বলে ফাদার স্তাণ্ডোর দ্রুত গতিতে সরাইখানা ত্যাগ করলেন।

এলানা বললো—ম্যাপে তো কোন কেল্লার উল্লেখ নেই ?

—উনি কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে গেলেন, কেল্লার কাছে যাবেন না। হেলেন উত্তর দিলো।

চার্লস সরাইখানার মালিকের কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, ফাদার স্তাণ্ডোর যে কেল্লাটার কথা বলে গেলেন, সেটা কোনটা ?

লোকটার মুখ রক্তহীন হয়ে গেল। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—জানি না তো, কেল্লা কোথায়!

—বোশোকবাদের পথে কি পড়ে ?

—বলতে পারছি না।

চারজনে পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলো। তবে কি ফাদার তাদের ভয় দেখানোর জন্য একথা বলে গেলেন ? লোকটা খুব বদমাইস তো ?

কিন্তু সন্দেহ দূর হলো না চার্লসের মন থেকে। কেবল একটি কথাই তাকে সর্বক্ষণ দংশন করতে লাগলো।

কেল্লা ! কেন সেখানে যেতে বারণ করছেন ? কি আছে সেখানে ?

॥ দুই ॥

পথে বেরোলে অনেক রকম 'বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ভগবানের দান বলে তাকে মাথা পেতে বরণ করে নিতে হয়।

চার ইংরেজের পথের অভিজ্ঞতাও হলো তাই। একবার গাড়ীর চাকা খুলে গেল। তিনবার গাড়ি স্থির হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো যেন আর হাঁটতে চাইছে না।

এবার এসে দাঁড়ালো চার মাথার মোড়ে। পাশে একটা কাঠুরের কুঁড়ে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এবার পৃথিবী সাজবে তার কালো শাড়ী পরে। আশপাশের জঙ্গলে ইতিমধ্যে অন্ধকার বাসা বেঁধেছে।

গাড়ীর ছাদ থেকে ধপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামলো গাড়োয়ান। বললো—বাবুরা, গাড়ি আর যাবে না। মালপত্তর নিয়ে এখানে নেমে পড়ুন।

চার্লস গর্জে উঠলো—বেশ তো আবদার! কেমন গোবেচারার মত বলছে, গাড়ি আর যাবে না। বললেই হয়ে গেল, তাই না? তোমার সঙ্গে যেমন কথা হয়েছে, তেমন তো কাজ করবে? যোসেফবাদ পৌছে তবে তোমার ছাড়। এখানে কেন নামতে যাবো?

—নামুন, নামুন। গাড়োয়ান তীক্ষ্ণ মেজাজে বললো, বাকি দু'কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে চলে যান।

—উঃ, মেজাজ কি! হেঁটে চলে যান। তোমার হুকুমে নামবো? চালাও গাড়ি।

—না না, গাড়ি আর যাবে না। নেমে পড়ুন।

কম অভদ্র তো নয় লোকটা? এমন সময়ে পাশের দিকে নজর পড়লো চার্লসের, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটা কেল্লা, পাহাড়ের দিকে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে—কেল্লাটা কার?

গাড়োয়ান সেদিকে তাকালো। কিন্তু তার দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই। কেবল আতঙ্ক ফুটে উঠলো।

চটপট উত্তর দিলো—কেল্লা! কোথায়? আমার তো চোখে পড়ছে না।

—ঐ তো কেল্লাটা, দেখতে পাচ্ছো না। চোখ দুটো কি বন্ধ?

—না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিন, আর দেরী করবেন না। মাল-পত্তর নিয়ে নেমে পড়ুন।

চার্লস এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাটার ঐ এক কথা শুনছে। তেড়ে গেল গাড়োয়ানের দিকে। মেরে একেবারে ছাতু করে দেবে ছোটলোকটাকে। কিন্তু আসন্ন পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই তৈরী ছিল গাড়োয়ান। প্রথমে লড়লো চাবুক দিয়ে। তারপর বের করলো ছোরা।

এ অবস্থায় মারপিট করা মানে বোকামির পরিচয় দেওয়া। এলানা ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো চার্লসকে।

গাড়োয়ান লাফ দিয়ে ওপরে উঠলো, ছোরা দিয়ে কেটে দিল দড়ি। ফলে মাল-পত্রগুলো ঝপঝপ করে নিচে পড়ে গেল। আর মেয়েরা আগেই চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এসেছিল গাড়ি থেকে।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগানো। গাড়ির মুখ ঘুরে গেলো। রওনা হবার আগে উজবুক গাড়োয়ান বললো—কাল যদি সকালে এখানে আসেন, আমি আবার সরাইখানায় পৌঁছে দেবো। কাল সকালে আসবো। কিন্তু যোশেফবাদ যেতে আমি পারবো না।

ঘড়ঘড় শব্দ করে গাড়ি এগোলো। এক সময় মিলিয়ে গেল সেই কর্কশ আওয়াজ।

তবে কি লোকটা ডাকাত নয়? প্রাণরক্ষার জন্য ভয় করেছিল ছোরা। তাই বলে গেল কাল সকালে আসবো, ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের, কেল্লাটা সে দেখেও দেখতে পেলো না কেন?

ততক্ষণে আরও অন্ধকার হয়েছে। যেন কালি দিয়ে আঁকা কেল্লার চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আকাশের পটভূমিকায়।

এখন তো আর কিছু করার নেই। এই কাঠুরের কুঁড়ে ঘরে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে ভাবা যাবে কি করা যাবে।

কুঁড়েঘর বন্ধ, বাইরে থেকে শেকল তোলা। ভেতরে অনেক শুকনো কাঠ। অতএব রাতটা মোটামুটি ভালই কাটবে—ভাবলো তারা।

আচমকা তাদের কানে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর ঘোড়ার সাজের ঘণ্টা ধ্বনি। সবাই কান পাতলো। বনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে শব্দ।

তাহলে গাড়োয়ানের মতলব পালটেছে, অসহায় ভ্রমণকারীদের ওপর দয়া হয়েছে। ফিরে আসছে আবার।

উৎফুল্ল হয়ে চারজনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আর ঝুন্ ঝুন্ শব্দ। এছাড়া রাতের অন্ধকারে আর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। গাছে পাখীরা ঘুমিয়ে, জঙ্গলে প্রাণীরা নীরব।

সবাইকে অবাক করে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এলো দুটো ঘোড়া।

এ আবার কেমন আশ্চর্য ব্যাপার। গাড়োয়ানের ঘোড়া দুটো তো এত কালো ছিল না। এ যে দেখছি তেল কুচকুচে কালো। বলীয়ান চেহারা, তেজিয়ান গলা বেকিয়ে মেঘের মত কেশর ঝাঁকিয়ে কুঁড়েঘরের দিকে ছুটে আসছে। ওরা তো সবাই আমার দিক থেকে আসছে না। অন্য পথ ধরে ওরা আসছে।

এর চেয়েও আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ঘোড়া দুটো গাড়োয়ান-বিহীনই ছুটছে। কেউ তাদের চালিয়ে আনছে না। গাড়ির ছাদে চালকের আসন ফাঁকা।

চার্লস বললো—চলো দাদা, ওদের দাঁড় করাই।

মুখ থেকে বেরোতে দেরি নেই, অথচ কাজ হাসিল। এমনই ভাবে ঘোড়ারা নিজেরাই চারমাথার মোড়ে দাঁড়ালো। নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোলো, মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো সাদা ফেনা।

চার্লস এগিয়ে গিয়ে ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। অমনি পুষি বেড়ালের মত মাথা নিচু করে। আদর খেলো কৃষ্ণ অশ্বযুগল।

আর দেরী করা ঠিক হবে না। কোথা থেকে আসছে, তা নিয়ে ভাববারও অবকাশ নেই। এখুনি এ গাড়িকে কাজে লাগাতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটানোর অ্যাডভেঞ্চার এখনকার মত সযত্নে তোলা থাক। হঠাৎ আবির্ভূত এই ঘোড়ার গাড়িতেই আবার সরাইখানায় ফিরে যাওয়া সমীচীন।

মালপত্র সব টেনে তোলা হলো গাড়ির ছাদে। দুই ভাইয়ের বৌ গাড়িতে উঠে বসলো। আর এলানাও উঠলো ভেতরে। ছাদে গিয়ে বসলো চার্লস। লাগাম নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়াদের মুখ ফেরাতে যেতেই বাধলো বিবাদ। ঘোড়ারা এক তিলও নড়ছে না।

লাগামের টানকে গ্রাহ্যই করলো না তেজীয়ান ঘোড়া দুটো। একসঙ্গে তারা ঘুরে গেল সেইদিকে, যেদিক থেকে এসেছে। তারপরেই পাহাড়কে লক্ষ্য করে বনের সরু পথ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটলো।

আবারও রহস্য !

চার্লস একটু ঘাবড়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু চেঁচামেচি না করে; সে জানতে চায়, এর দৌ. কতদূর। জঙ্গলের পথঘাট যেন সব চেনা ঘোড়া ছুটোর। এমনই ভাবে টগবগ করে ছুটে চললো। সরু এবড়ো-খেবড়ো পথ ভয়ঙ্কর খাদের কিনারার পথ, সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ কখনো আস্তে, কখনো দ্রুত ছুটে চললো। দূর থেকে দেখা সেই কেল্লাটা এবার নজরে পড়লো চার্লসের।

এখন পরিষ্কার সে দেখতে পাচ্ছে দুর্গের কামান আর খাঁজকাটা পাচিল। পাঁচিলের পাশে ঝড়ের গতিতে ছুটছে ঘোড়া দুটো। আকাশে তখন আলো ঝলমল করছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বরফ জমা পরিখা। পরিখার ওপরের সেতু দিয়ে দুমদুম করে পার হয়ে এলো এদিকে। তারপর আরো কিছুটা এগিয়ে গেল। এক সময় থমকে দাঁড়ালো।

চার্লস এ সবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। সে নীরবে কোচোয়ানের আসন থেকে নেমে এলো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তার দাদা। এতক্ষণ বাইরের কোন কিছুই সে টের পায়নি। গাড়ি থেকে নেমে হতভম্ব হয়ে গেল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদটা দেখে। নিঝুম নিস্তব্ধ বিরাট বাড়িটা একাকী দাঁড়িয়ে। কেউ কোথাও নেই। সব ফাঁকা। কেমন গা ছমছমে পরিবেশ।

দুজন মেয়ে নিচু গলায় বললো—বাপরে, ভুতুড়ে বাড়ি নাকি ?

চার্লস হো হো করে হেসে উঠলো। সে-ও যে গোলকধাঁধায় পড়েনি, তা নয়। তবু গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—চলো দাদা, আমরা নিজেরাই ভেতরে যাই। কেউ যখন আমাদের আপ্যায়ণ করছে না তখন আর কি করা যাবে। এত আওয়াজ আর সোরগোলেতে কি কারোরই ঘুম ভাঙেনি ?

বিরাট দরজাটা বন্ধ। ভারী পাল্লার ফাঁক দিয়ে আলোক রেখা উঁকি মেরেছে বাইরে

দুরন্ত চার্লস চটপট পায়ে এগিয়ে গেল। দুহাতে ঠেলে খুলে ফেললো দরজা। পাল্লা দুটো দুপাশে সরে গেলো।

॥ তিন ॥

বিরাট হলঘর। উঁচু ও প্রশস্ত। ঘরের দেওয়াল আর মেঝে মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী। ঠিক মাঝখানে আগুনের আধার। পটপট করে জ্বলছে কাঠ। শীতার্ত রাত্রে বেশ আরামেই কাটানো যেতে পারে।

কিন্তু জনমানবহীন পরিবেশ।

চার্লস তার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি চক্রাকারে ঘোরালো চারদিকে। তারপর চীৎকার করে ডাকলো--বাড়ীতে কে আছেন ?

নিরুত্তর। জবাব পাওয়া গেল না। কেবল তার কণ্ঠস্বর ফাঁকা হলঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়ে আবার তার কাছেই ফিরে এলো। বিরাট চওড়া দুভাগে ভাগ করা মর্মর সোপান। কিন্তু কেউ এলো না তাদের অভ্যর্থনা জানাতে।

কিন্তু ফায়ার প্লেসের আগুন দেখে মনে হচ্ছে কাঠ গোঁজা হয়েছে একটু আগে। তারা একটু এগিয়ে গেল। চারখানা চেয়ার পরপর পাতা রয়েছে ডিনার টেবিলের পাশে। কিন্তু কে বা কারা চেয়ারে বসবে, তেমন কাউকে নজরে পড়লো না।

অবাক কাণ্ড !

আবার জোরে হাঁক দিল চার্লস।

এবারেও সাড়া নেই। কেবল ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরময়।

ডায়ানা আর হেলেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনেরই চোখে ভয়, আতঙ্ক। পাশে এলামার ভীত-সন্ত্রস্ত মুখ।

হেলেন বললো—আর ভেতরে যেতে হবে না। গলার স্বর শুনে বোঝা গেল, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

কেবল হেলেন কেন। অমন ভূতের কাণ্ড কারখানা দেখলে সে তো সামান্য মেয়ে, সুস্থ পুরুষ মানুষ পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

চার্লসের কিন্তু ভয়-ভূতা কিছু নেই। আর কয়েক পা এগিয়ে গেল হল ঘরের ভেতরে। ঠিক সেই সময় শোনা গেল ঘরঘর আওয়াজ, বাইরে থেকে ভেসে আসছে।

গাড়ীর চাকার আওয়াজ। ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ।

চারজনেই চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলে বাইরে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওদের চোখের সামনেই মালপত্র নিয়েই হাওয়া হয়ে গেলো কালো কুচকুচে ঘোড়া দুটো।

এ সমস্ত অভাবনীয় কাণ্ড দেখে হেলেন কেবল গোঙাতে লাগলো। কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু বলতে পারছে না। সে বার বার করে বারণ করছিল। কিন্তু কেউ তার কথা কানে নেয়নি। তার কথা শুনলে এমন ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হতে হতো না।

এলানার নিজের অবস্থাই শোচনীয়। তার ওপর স্ত্রী অমন করছে! সে আর সহ্য করতে পারলো না। ধমকে উঠলো হেলেনকে। সে বকুনি খেয়ে তখনকার মত চুপ করলো।

সবাই আবার হলঘরে ঢুকলো।

বাইরে দাঁড়িয়ে শীতের মধ্যে কষ্ট পাওয়ার থেকে ভেতরে গিয়ে আগুনের ধারে বসা অনেক ভাল।

পরক্ষণেই শোনা গেল ডায়ানার অস্ফুট কণ্ঠস্বর—একি!

বাকি তিনজনে তার দৃষ্টি অনুসরণ করলো। আবার রহস্য। ডাইনিং টেবিলে চারখানা চেয়ারের সামনে চারজনের আহার্য্য সাজানো। এমন পরিপাটি করে সাজানো যেন সে জানতো যে হঠাৎ চার অতিথির এখানে আগমন ঘটবে। তেমনি খানদানি খানা-পিনা।

কিন্তু জানবে কি করে তাদের আগমন বার্তা? কেউ তো এখানে নিজের থেকে আসেনি?

গৃহকর্তা তাহলে নিজেই ঘোড়া পাঠিয়েছেন তাদের নিয়ে আসার জন্যে, খাবার সাজিয়ে রেখেছেন। অতিথি আ্যাপায়নে এতটুকু যাতে ভুল না হয় তাই ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছেন আগুনের কুণ্ড। কিন্তু তার দেখা নেই কেন? অলক্ষ্যে থেকে এত অ্যাপায়ন কিসের জন্যে? সামনে আসতে কি কোন বাধা আছে? কিসের বাধা?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিল ডায়ানা—হয়তো গৃহকর্তা কানে শুনতে পায় না। তাই তাদের এত হাঁক-ডাক শুনতে পাচ্ছে না।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে চার্লস বললো—তাহলে আমি নিজেই তাকে ডেকে আনি।

না আ-আ-আ। পুরোপুরিভাবে হিস্টিরিয়া রোগ আক্রান্ত হয়েছে হেলেন। চীৎকার করে ছুটে গেল। চার্লসের হাত শক্ত মুঠোতে ধরে গুঙিয়ে উঠলো, যেও না, লক্ষীটি কথা শোন। আর একমুহূর্তও এখানে নয়। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

চার্লস কিন্তু কোন বারণ-নিষেধ কানে তুললো না। বৌদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। নতুন কোন প্রস্তাবে উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা কেবল বাধা দিতেই জানে। নতুন জায়গায় এসে নতুন নতুন কাণ্ডকারখানা দেখে মাথা তার আরো বেশী খারাপ হয়েছে। সে হাত ছিটকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

লম্বা অলিন্দ। দুপাশে সারি সারি ঘর। প্রতিটির দরজা বন্ধ।

—কেউ আছেন?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কয়েক পা এগিয়ে একটা দরজার পাশে সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠেলা দিল। খুলে গেল দরজার পাল্লা।

ঘরে আলো জ্বলছে। ফলে সবকিছু নজরে পড়ছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। বিছানায় পরিপাটি করে পাতা চাদর, শিয়রে টেবিলের ওপর একটা স্যুটকেশ।

স্যুটকেসটা তার অচেনা নয়।

ছুটে গেল নীচে। দাদার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো সেই স্যুটকেসের কাছে—চিনতে পারছো?

—এ তো আমারই স্যুটকেস। পাগলের মত স্যুটকেসের ঢাকনা খুলে ভিতর ঘেঁটে এলানা বললো, আমার সব জিনিসপত্রই যেমন ছিল তেমনই আছে।

কি ব্যাপার কিছুই তার বোধগম্য হলো না। বিমূঢ় হয়ে ছোটভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু আগে তার চোখের সামনে থেকেই তাদের মালপত্র নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল ঘোড়া দুটো। অথচ সেই স্যুটকেস এখানে। এমন কি অচেনা গৃহকর্তা স্যুটকেস থেকে বের করেছে শোবার জামাকাপড়, সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে মাথার কাছে।

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে চার্লস। এ-ঘরেও সেই একই অবস্থা। আলো জ্বলছে, ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। বিছানায় চাদর পাতা রয়েছে এবং তার স্যুটকেস রাখা রয়েছে টেবিলের ওপর।

নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারলো না চার্লস। অথচ অলৌকিক শক্তিতে ফিরে এসেছে তাদের সব জিনিসপত্র।

হঠাৎ তীব্র চীৎকার ভেসে এলো নীচের তলা থেকে। হেলেনের কণ্ঠস্বর। ভয়ার্ত চীৎকারের পর চীৎকারে নিস্তব্ধ পুরীর নিলয় নিঃশব্দ খান খান হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল যেন কাঁচের বাসনের মতই।

দুভাই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলো নিচে। হলঘরের দেওয়ালের দুদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেলেন আর ডায়ানা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তাদের সর্বাঙ্গ।

দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা ছিল। সেটা এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। এখন দরজাটা হাট করে খোলা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। রোগা লম্বা গড়ন। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা। এক পা এগিয়ে এলো সামনে। এবার স্পষ্ট হল তার রূপাকৃতি। তারা কি দেখছে। একটা মরার মুখ। বীভৎস চেহারা, চোখের তারা দুটি স্থির। শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ভীষণ রাগে বোমার মত বিস্ফরিত হলো এলানার কণ্ঠস্বর—কেন ভয় দেখাচ্ছো ?

রোগা মূর্তি হাতের মধ্যে হাত দিয়ে কচলালো। তারপর ভদ্রভাবে বললো—আমি তো ওদের ভয় দেখাইনি। ওঁরা আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

হেলেনের কাঁদ-কাঁদ মুখ। সেদিকে তাকিয়ে চার্লস ভাবলো, হেলেনের অবস্থা দেখে যদি এলানা আবার ক্ষেপে যায়। তাই আগ বাড়িয়ে বললো—এতক্ষণ কোথায় ঢুকেছিলে তুমি ?

কালো পুরুষমূর্তি সসম্মানে মাথা নত করে বললো—আজ্ঞে, আপনাদের জন্য ঘর-দোর পরিষ্কার করছিলাম। আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো ঘরগুলো ?

—পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এর তো আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

মূর্তিটা হেসে উঠলো ফিক্ করে। দেখা গেল তার হলদে ছোপ ধরা দাঁত-গুলো। সে কোন উত্তর দিলো না।

চার্লস তেড়ে গেল তার দিকে। বললো বলো, এ সবের অর্থ কি ?

হাড্ডিসার মূর্তি বললো ভদ্রভাবে—আজ্ঞে, এ অঞ্চলের সবাই জানে আমার মাস্টার অতিথি সৎকারে কখনও ত্রুটি রাখেন না।

—তোমার মাস্টার কে ? বলো তার নাম, উপাধি, বংশপরিচয় সব আমাদের জানতে হবে

এবারেও প্রশ্নের উত্তর দিল কালোমূর্তি। প্রসঙ্গ পাল্টে বিনীত কণ্ঠে বললো—মহাশয়, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলো দরজা পথে।

চার্লস বুঝলো, এ লোকের পেট থেকে বেশী কথা জানা যাবে না।

হেলেন কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো—চলো আমরা ফিরি, এই বাড়ীতে আর একটুক্ষণও থাকতে চাই না।

—তা কি করে সম্ভব ?, চার্লস কথাটা বলে এগিয়ে গেল ডিনার টেবিলের দিকে।—এখন পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে। চলো, খেয়ে নিই।

এলানাত্তর ঐ কথা।

—অত ভয় পাচ্ছো কেন ? এসো, খেয়ে নাও।

হেলেনের কিন্তু ঘোর আপত্তি। তবু সে চেয়ারে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে চাকর সেই কালো মূর্তি এসে পরিবেশন করতে লাগলো গরম সুরুয়া।

খাওয়া শুরু হলো। সেই সঙ্গে চললো কথাবার্তা, সংক্ষেপে।

—তোমার নাম কি ?

—ক্রোভ।

—তোমার মনিবের সঙ্গে এবার দেখা হবে ?

—সম্ভবত না।

—অসুস্থ ?

—না।

—তাহলে ?

—বেঁচে নেই।

সকলের হাতের খাবার হাতেই রয়ে গেল। পরস্পরেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বিস্ফারিত চার জোড়া নেত্র। চারজনেরই ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক্ চিক্ করে উঠলো।

—তাহলে গাড়ি কে পাঠালো ? আর খাওয়া-দাওয়ার এমন রাজকীয় আয়োজনই বা কি করে হলো ?

—আমার মনিব মারা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে যেন কোন অতিথি বিনা আদরে বা অ্যাপায়ন না পেয়ে ফিরে না যায়। তাই—

—তোমার মনিব কে ?

—কাউন্ট ড্রাকুলা।

—ছেলেমেয়ে ?

—নেই। যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন ছিল না।

যতদিন বেঁচেছিলেন মানে ? কথাটার অর্থ কি ? ডায়ানা রীতিমত অবাক হলো।

ক্লোভ আর উত্তর দিতে নারাজ। তাই ধীর পায়ে ঘর থেকে চলে গেল।

ডায়ানা ভেবেছিল, এই প্রেতপুরীতে বিরাট একটা রহস্যের সন্ধান পাবে। ওমা, সে সবের তো গন্ধই নেই। ডায়ানাকে রীতিমত হতাশ হতে হলো।

প্রথম প্রথম ক্লোভ লোকটাকে দেখে কিরকম যেন সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু ততটা নয়। বরং তার অগাধ প্রভুভক্তি। মনিব মরে গেছেন কবে, আর এই নির্জন প্রাসাদে একা একা দিন কাটাচ্ছে আর মনিবের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। এমন কি প্রভুভক্তি, এমন আনুগত্য সম্পন্ন দৃষ্টান্ত লণ্ডন শহরেও পাওয়া বিরল।

ভবি ভোলার নয়। হেলেনের আতঙ্ক ভাবটা কাটলো কিছুটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দূর হলো না।

আমতা আমতা করে সে বললো, যাই বলো, একটা রহস্য আছে।

এলানা তেড়ে উঠলো—চুপ করো তো। সামান্য ছায়া দেখে তুমি আঁতকে ওঠো।

হেলেনের এক কথা।

—ফাদার বারবার বলেছিলেন কেল্লার ধারে-কাছে যেয়ো না।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন ঠিকই; তবে নিজের কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে নিজের ডেরায় কটা দিন গল্প-গুজব করার মতলবে ছিলেন বলেই নেমতন্ন করেছিলেন, আর এখানে আসার প্ল্যানটা ভেস্তে দিতে চেয়েছিলেন।

সুরায়ার চুমুক দিল এলানা। দ্বিধাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডায়ানাও চুমুক দিল। বেশ স্বাদ। নিজের মনে ফিসফিস করে বললো—কাউন্ট ড্রাকুলা।

আবার হঠাৎ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো ক্লোভ।

'কাউন্ট ড্রাকুলা' আপন মনে বললো এলানাও।

চার অতিথির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকালে ক্লোভ।

তিনজনের পানীয়ের গ্লাস শূন্য। কিন্তু একমাত্র গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ায়নি একজন। হেলেন।

॥ চার ॥

বহুদিন, বহুমাস, বহুবছর প্রতীক্ষা করার পর এসেছে সেই শুভদিন।

অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছে ক্লোভ। এই মৃত্যু পুরীতে নতুন অতিথিদের আগমনের অপেক্ষায়। যেদিন নিশ্চিন্ত মনে আশ্রয় নেবে অভ্যাগতেরা সেদিন রক্ত দিয়ে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে তার অমর প্রভুর নিষ্প্রাণ ছাইয়ে।

প্রভু নিজেও সেইরকম নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—ক্লোভ, অপেক্ষা করো। সেই সুযোগের দিন গোনো। সুযোগ আসবেই—দেখো ফসকে না যায়।

মনিবের অন্তিম নির্দেশ অন্তরে অন্তরে পালন করে আসছে ক্লোভ। প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে দীর্ঘ দশ বছর। মলিনদেহী মনিবকে জাগিয়ে তোলার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাপর্ব এবার সাঙ্গ হতে চলেছে। বাইরের অতিথিরা আশ্রয় নিয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি যাপন করছে কাউন্ট ড্রাকুলার রক্ত নিয়ে হোলি খেলার নিষ্ঠুর নিকেতনে।

মনে পড়ে যায় মৃত্যু পথযাত্রীদের হাহাকারের কথা। এ-প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়ালে দেওয়ালে আছড়ে পড়তো অতীব্র আর্তনাদ। আঃ, কি সুখের দিনই না কাটিয়েছে।

তারপরেই ঘটে মনিবের ভস্মপ্রাপ্তি। তখন থেকে শুরু হয় দুর্দিন। মরণ চীৎকার থেমে গেছে, টাটকা তাজা রক্তে ডুবে যায় না প্রাসাদের লাল মেঝে। আর এ অঞ্চলের লোকগুলোও ক্লোভকে গ্রাহ্য করে না।

ওদের ধারণা, ক্লোভ একটা বিষদন্তহীন সাপ। করুণা করে তাকে রেখে দিয়েছে। খেয়াল হলেই যখন তখন বের করে দিতে পারে প্রাসাদ থেকে।

তাই আবার জাগাতে হবে অতীতের সেই আতঙ্কপূর্ণ রাত্রিগুলোকে। আবার দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে ভীত-সন্ত্রাসের নূপুর নিক্কণ। সবাই জানবে. ড্রাকুলা মরে নি, কাউন্ট ড্রাকুলা জীবিত, আবার ফিরে এসেছে।

হুঁশিয়ার—সন্ধ্যা আসন্ন।

আবার রক্তপিয়াসীর দামাল নৃত্য শুরু হোক। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলুক, ধারালো নখ আর সুচের মত তীক্ষ্ণ দাঁতের মৃত্যুলীলা। আঃ, কি আনন্দ। সেই শুভক্ষণ আসন্ন। আর দেরী নেই।

মাথা নীচু করে হাঁটছিল ক্রোভ, চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে তার সমগ্র অন্তর। এক সময় এসে দাঁড়ালো কারখানার কাছে। একটা মাত্র কফিন। ছোট করে খোদাই করে লেখা—কাউণ্ট ড্রাকুলা।

দ্বিতীয় কোন কথা লেখা নেই। আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাক—এই ধরণের অনেকরকম কথা কবরখানার স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লেখা থাকে। কিন্তু কাউণ্ট ড্রাকুলার স্মৃতি-স্তম্ভে ওসব কিছুই লেখা নেই। কারণ ড্রাকুলা অশান্তি প্রিয়, শান্তি চায় না। তার মতে শান্তি চায় কাপুরুষরা। পরশোণিতের অবিশ্রান্ত ধারাই তাকে দেয় আনন্দ।

কাউণ্ট ড্রাকুলা! কাউণ্ট ড্রাকুলা! মাস্টার কাউণ্ট ড্রাকুলা।

আয়োজন সমাপ্ত—কেবল আপনার পুনর্জন্মের প্রস্তুতি-পর্বের অপেক্ষায়।

অলিন্দে এসে দাঁড়ালো ক্রোভ। এই দশ বছর ধরে সর্বক্ষণ মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছে, কি করে কি করতে হবে। এখন কেবল পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে হবে।

এলানা আর হেলেনের শোয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো ধীর পায়ে। কান পাতলো দরজায়।

পরিচ্ছন্ন শয্যায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে দম্পতি। পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আলাপে মত্ত। মূর্খ দম্পতি।

প্রতিটি শব্দ কান খাড়া করে শুনলো ক্রোভ।

॥ পাঁচ ॥

কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করলো ডায়ানা। ধোঁয়ায় ভরে গেল ছোট্ট কুটির। এখুনি বোধ হয় নিংশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে তার। চোখ দুটো ভাল করে খুলতে পারছে না, নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অথচ কুটিরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেও সাহস হচ্ছে না তার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে হবে—ভাবতেই গা ছমছম করে ওঠে ডায়ানার ?

হঠাৎ অন্ধকারের নীরবতা ভঙ্গ করে ছুটে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। সেই সঙ্গে নুপুরের নিক্কন। টগবগ টগবগ ধ্বনি আর রুনঝুন, ঝুনঝুন আওয়াজ ক্রমশঃ কুটিরের দিকেই এগিয়ে আসছে। একসময়ে শব্দটা থেমে গেল।

জানালার কাঁচ মুছে ডায়ানা চোখ রাখলো। চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে কালো ঘোড়ার গাড়িটা।

পরক্ষণে ভীষণভাবে আঁতকে উঠলো।

কুটিরের দরজা খুলে গেছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং ক্রোভ।

—আমাকে দেখে আবার আপনি শুধু শুধু ভয় পেয়েছেন, ম্যাডাম।

এর আগে ক্রোভের যে কণ্ঠস্বর সে শুনেছিল, তার সঙ্গে এখনকার কোন মিল নেই।

ডায়ানার একেই রাগ সপ্তমে চড়েছিল। তার মধ্যে ক্রোভকে দেখে ভীষণ মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে হুমকি দিল—কি ভেবেছো? আমাদের সঙ্গে দুজন আরো ছিল, তাঁরা কোথায় ? তোমারই বা এতক্ষণ পাত্তা পাওয়া যায়নি কেন ?

শান্ত বিনয়ী অথচ গম্ভীর কণ্ঠে ক্রোভ বললো—আপনার স্বামীর মুখ থেকেই সবিস্তারে জানতে পারবেন। এখন চলুন, আমার সঙ্গে। আপনার স্বামীই আমাকে পাঠিয়েছেন।

ডায়ানা আর কথা বাড়ালো না। তড়াক করে গাড়িতে উঠে বসলো। ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চললো। ঝড়ের বেগে চলেছে। মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এসে হাজির করলো সেই পোড়ো প্রাসাদটির সামনে।

গাড়ি থেকে নামলো ক্রোভ। হলঘরের ব্রোঞ্জের হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা খুলে সবিনয়ে ডায়ানাকে ভেতরে ঢুকতে আমন্ত্রণ জানালো। প্রবেশ করলো ডায়ানা।

চোখের পলকে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা। শত চেষ্টা করেও ডায়ানা খুলতে পারলো না দরজা।

—এত দেরী করে এলে বোন। আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।

কথাটা কানে যেতেই ডায়ানা পাক খেয়ে ঘুরে গেল। প্রস্তর নির্মিত সিঁড়ির নীচের ধাপে বসে হেলেন। গায়ে তার রাত্রের সাদা পোশাক। এ যেন সেই অতি-পরিচিত হেলেন নয়, হেলেনের ছাঁচে গড়া এক হেলেন-মূর্তি।

তার চোখ-মুখের ভাব একটু রুক্ষ গোছের। আগাগোড়া যেন স্কুল শিক্ষিকা। কিন্তু সেই কঠিন ভাবের সঙ্গে এখনকার চোখের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই কাঠিন্য অবর্ণনীয়। চোখের তারাতে নেই অনেক দিনের চেনা সেই চাউনি। যেন অন্য এক হেলেন বন্য হিংস্র দুচোখের মধ্যে দিয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে ডায়ানার দিকে।

ডায়ানা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো—সকাল থেকে তোমাকে খুঁজছি, কোথায় ছিলে ? চার্লস কোথায় ?

আগুনে যেন ঘি পড়লো, এমনইভাবে জ্বলে উঠলো হেলেনের দুটি চোখ। সিঁড়ির ধাপ থেকে ছিটকে এসে বললো অমানবিক কণ্ঠে—চার্লসের কথা পরে শুনবে। এখন তুমি এসো। তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।

—না, যাবো না। আগে বলো, চার্লস কোথায় ?

ততক্ষণে হেলেন একেবারে এসে দাঁড়িয়েছে ডায়ানার সামনে। আচমকা তার হাতটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারলো। ঘ্যাড় ঘেড়ে গলায় বললো—এসো।

ডায়ানা হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ধস্তাধ্বস্তি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলো ঠিকই, কিন্তু হেলেন-মূর্তির সাঁড়াশির মত শক্ত আঙুলের কবল থেকে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ডায়ানার কাল-ঘাম ছুটে গেল। বুঝলো, এক অবিশ্বাস্য শক্তি ভর করেছে কোমলা হেলেনের মুঠোতে। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়ালো একটা কালো, লম্বা, রোগা মূর্তি। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত। দুটি চোখ দিয়ে যেন রক্ত ঝরছে। হিংস্র ঠোঁটের কোণে প্রকটিত শ্ব-দন্ত।

—এসো আমার কাছে! আশ্চর্য আদেশের কণ্ঠ শোনা গেল।

ডায়ানা তাকালো লোকটার রক্তবর্ণ চোখের দিকে। সেখান দিয়ে বর্ষিত হচ্ছে যাদু কিরণ। ডায়ানা হতভম্ব হয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিলো অনেক কষ্টে, পেছিয়ে গেলো পেছনে।

কিন্তু শরীরী বিভীষিকা ছাড়বার পাত্র নয়। ডায়ানা যত পেছনে যায়, একপা একপা করে এগিয়ে আসে কালোমূর্তি। শিকার ফাঁদে পড়লে শিকারী যেমন অসীম প্রত্যয় নিয়ে এগোয়, ঠিক তেমন। মূর্তির নিষ্ঠুর নির্মম বাঁকা ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো অদম্য হিংস্র হাসি, নেকড়েকেও হার মানায়। আর সেই ফাঁকে উঁকি দিলো দুটি হলুদ শ্ব-দন্ত।

দুম্ করে লম্বা হাত বাড়িয়ে ডায়ানাকে আক্রমণ করলো লোকটা। তার কাঁধটা আঁকড়ে ধরলো। তারপর নিজের দিকে টেনে আনলো।

ঠিক সেইক্ষণে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার শোনা গেল ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে—ড্রাকুলা! ওকে ছেড়ে দাও।

ড্রাকুলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্বয়ং চার্লস। চকিতের এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে প্রবল ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে চার্লসের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ডায়ানা—চার্লস! চার্লস! চার্লস!

কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই চার্লসের। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ড্রাকুলার দিকে, চোখ দিয়ে ঝরছে আগুন। তারপর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠলো—হুঁশিয়ার! এদিকে আর নয়।

কাউণ্ট ড্রাকুলা গর্জন করে উঠলো। তার হুঙ্কারের ঠেলায় বাড়িটা যেন কেঁপে উঠলো।

—দূর হও এখান থেকে। বাইরে গাড়ি আছে। বেরিয়ে যাও। তোমার পালা পরে আসবে।

কথাটায় মনে হলো, শিকারী আপাততঃ একটা শিকারেই সন্তুষ্ট। তাই নাগালের মধ্যে শিকার পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছে মহান উদার মনসম্পন্ন কাউণ্ট ড্রাকুলা।

দরজার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল ডায়ানা। অতএব তাকে আক্রমণ করতে হেলেনের কষ্ট হলো না। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে তার ওপর। শুরু হল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ডায়ানার কাঁধের পোশাক ছিঁড়ে নেমে এলো বুকের ওপর।

সেই মুহূর্তেই ডায়ানার গলা টিপে ধরেছিল হেলেন। চোখে অন্ধকার দেখছিল ডায়ানা। কিন্তু পড় পড় করে পোশাক ছিঁড়ে যেতেই বিকট চীৎকার করে ছিটকে গেল হেলেন।

ডায়ানা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে টাটিয়ে

ওঠা গলায় হাত বুলোতে লাগলো সে। আচমকা নজর পড়লো একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হেলেনের দিকে। হিংস্র শ্বাপদের মত সে রাগে ফুলছে।

ডায়ানার গলায় ঝুলছে রূপোর পবিত্র ক্রশ—মা তাকে ছোটবেলায় পরিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে গেল অনেক কাহিনী মুহূর্তের মধ্যে। ক্রশকে যমের মত ভয় পায় অ-মৃতরা।

দু-হাতে রূপোর ক্রশ ধরে হেলেনের দিকে এগিয়ে ধরলো। কমে গেল ফোঁস-ফোঁসানি, কুঁকড়ে গেল সে।

এর মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেছে চার্লস আর ড্রাকুলার মধ্যে লড়াই। দানবিক শক্তিকে চার্লসকে অক্লেশে মাথার ওপর তুলে আছাড় মেরেছে ড্রাকুলা।

মাটিতে পড়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চার্লস। তবু দেওয়ালে টাঙানো তলোয়ারটা টেনে নিয়ে ড্রাকুলার দিকে তেড়ে এলো। কিন্তু খপ করে তীক্ষ্ম ফলা চেপে ধরলো ড্রাকুলা। হাতের তালু কেটে টুকরো হয়ে গেলো। রক্তে ভরে গেল হাত। বুনো জানোয়ারের মত হিংস্র গর্জন করে এক মোচড়ে তলোয়ারের ফলা ভেঙে দু-টুকরো করে দিয়েছে সে। এবার চার্লসকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। কিন্তু চার্লস কেন পারবে অশরীরী বিভীষিকার সঙ্গে, কেবল চেষ্টা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ডায়ানা চীৎকার করে বললো—চার্লস, দেরী করো না। ক্রশ করো, এক্ষুণি।

ঘাড় ফিরিয়ে চার্লস লক্ষ্য করলো, ডায়ানা আঙুল দিয়ে শূন্যে ক্রশ এঁকে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এখন প্রাণ রক্ষার উপায় একমাত্র কি, সেটা বুঝতে দেরী হলো না তার। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিলো ভাঙা তলোয়ারের টুকরো দুটো। ড্রাকুলার লাল চোখের সামনে তুলে ধরলো ক্রস। জান্তব আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল ড্রাকুলা।

এবার চার্লস একটু সাহস পেল। এগিয়ে গেল একটু—হাতে উদ্যত ভাঙা তলোয়ারের ক্রস। আবার অমানবিক চীৎকার করে তোলপাড় করে তুললো সারা বাড়ি। পেছিয়ে গেল শরীরী প্রেত কাউন্ট ড্রাকুলা।

॥ ছয় ॥

কাঠের সেতুতে মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চললো। চৌমাথায় পৌঁছেই একটা প্রচণ্ড মড়মড় শব্দ শোনা গেল গাড়ির মাথায়। তার পরেই জ্ঞান হারালো ডায়ানা।

এতক্ষণ সে ক্লেইনবার্গের মঠের বিছানায় বেঁহুশ হয়ে শুয়েছিল। এখন তার জ্ঞান ফিরলো। চোখ খুলে তাকালো।

একজন সন্ন্যাসী ধীর কণ্ঠে বললো তারা এখন মঠের নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। ফাদার স্যাণ্ডোরের উদ্যোগেই তাদের দুজনকে নিয়ে আসা হয়েছে। ফাদার স্যাণ্ডোরের কাছে চার্লস।

এবার ডায়ানা নিশ্চিন্ত। যার জন্যে ভাবনা, সেই চার্লস ভালোভাবেই আছে ভেবে, আবার দুচোখের পাতা বন্ধ করলো সে।

সেই মুহূর্তে ড্রাকুলা ইতিহাস শোনাচ্ছিল ফাদার স্যাণ্ডোর। দশ বছর আগে হঠাৎ আবির্ভাব হয় ঐ ড্রাকুলার। এ অঞ্চলটায় একেবারে জাঁকিয়ে বসেছিল। যা ইচ্ছে তাই করতো। তারপর একদিন হলো নিখোঁজ। কোথায় যে গেল, কি হলো—কেউ বলতে পারে না ঠিকমত। এরপর কেটে যায় দীর্ঘ দশবছর। তখন ধরে নেওয়া হয়, নরকের শয়তান নরকেই ফিরে গেছে। সে আর আসবে না।

কিন্তু তাকে আবার আনা হয়েছে। এলানার রক্ত দিয়ে তাকে স্নান করানো হয়েছে। তার সুপ্ত প্রাণের ঘুম ভেঙেছে। আবার নররক্তী পিশাচ মাটির বিছানা ছেড়ে নতুন শিকারের সন্ধানে চলমান হয়েছে। ডায়ানার দেহে তার স্পর্শ লেগেছে। কণ্ঠে নখ ফুটিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, রক্ত পড়েছে। একবার যখন ডায়ানার ওপর সে ভর করেছে, তখন তার আর রেহাই নেই। যে ভাবেই হোক শয়তান তার কাজ হাসিল করবেই।

তাই এ অঞ্চলে থাকা আর ডায়ানার পক্ষে নিরাপদ নয়। ইংলণ্ডে যেতে হবে। যদি চার্লস রাজী থাকে তো, এখানে থেকে যেতে পারে। ড্রাকুলা ধ্বংসের ব্যবস্থা করা হবে। সে'ও সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজন হলে কেল্লা বাড়ির প্রতিটি পাথর খুলেও তাকে আবিষ্কার করতে হবে।

চার্লস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে করেই হোক পিশাচটাকে শেষ করতেই হবে। দাদা বৌদির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

ফাদার হ্যাণ্ডোর বললেন—ভুল বললেন। কাউন্ট ড্রাকুলাকে আবার শেষ করবেন কি। ও তো শেষ হয়েই আছে। বলুন, তাকে ধ্বংস করা যায়। ড্রাকুলা হলো চলন্ত মড়া। অর্থাৎ অ-মৃত। এদেরকে ধ্বংস করার উপায় হলো বুকের মধ্যে লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া, জলে ডুবিয়ে দেওয়া, রোদে ফেলে রাখা বা খুব কাছে ক্রশ এগিয়ে ধরা।

—বাঃ, খুব তো সোজা।

—তা ঠিক। কিন্তু তাকে হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে নতুন করে রক্তের স্বাদ পেয়েছে। এখন সে ভয়ঙ্কর, বিভীষিকাময়।

ম্লান হেসে চার্লস বললো—ইংলণ্ডে বসে রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারকে কেবলই গাল গল্প মনে করেছিলাম। বিশ্বাস করিনি কোনদিন। কিন্তু এখন—

—তাহলে নিজের চোখেই সব দেখলেন, তাই তো? হ্যাঁ, কাউন্ট ড্রাকুলা কিংবদন্তী হলেও চরম সত্য। যতদিন ধরে সে মানুষের রক্ত পান করবে ততদিন তার আয়ু। তাকে মেরেও মারা যায় না, আবার মরেও মরে না। উপরন্তু যাকে সে আক্রমণ করে, যার কণ্ঠনালীতে ফুটিয়ে দেয় সুতীক্ষ্ণ শ্বদন্ত, সে-ও কালে কালে হয়ে ওঠে অশরীরি—রক্তপিপাসু—তার অনুচর। যেমন তোমার বৌদি হয়েছে ভ্যাম্পায়ার।

তৎক্ষণাৎ চার্লসের মনে পড়ে গেল বৌদির ভয়ঙ্কর অমানুষিক মুখচ্ছবিটি। শিউরে উঠলো সে।

কোনরকমে বললো—কিন্তু সে একা বার বার বেঁচে ওঠে কি ভাবে?

—কিছু মানুষ অব্যাখ্যাত কারণে তার সেবক। যেমন ক্লোভ। আবার ধরুন এ তল্লাটের কিছু বাসিন্দার কথা, যারা কেল্লা বাড়ির কাজ-কর্ম সেরে দিয়ে আসে।

চার্লস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ফাদারের দিকে। সত্যি এসব জিনিস নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু গতরাতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে—

—মিঃ কেন্ট, ফাদার বললেন, আপনি একটুও ভাববেন না। মঠের ভেতরে সে ঢুকতে পারবে না। তাকে আহ্বান করে ভেতরে নিয়ে এলে তবেই সে আসতে পারে, নচেৎ নয়।

—কিন্তু সে তো আসতে পারে ?

—নিশ্চয় আসবে। আপনার স্ত্রীর ওপর তার যে টানা ষোল আনা।

—ডায়ানাকে একটু দেখতে পারি কি ? চার্লসের কণ্ঠে আকুলতা।

—নিশ্চয় আসুন, আমার সঙ্গে মঠের গোলক ধাঁধাঁর মত পথ ধরে দুজনে হাঁটতে লাগলো। চার্লস মনে মনে ভাবলো, সত্যিই নিরাপদ জায়গা। চার্লসকে একা ছেড়ে দিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে।

ডায়ানা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। কম্বল দিয়ে ঢাকা। গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারা মুখে ভিড় করেছে রাজ্যের ক্লান্তি।

কম ধকল গেছে ?

সাক্ষাত শয়তানের থাবার মধ্যে থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঠিকই কিন্তু সে বিপর্যস্ত কালিমালিপ্ত ঐ মুখচ্ছবিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সস্নেহে চার্লসকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ফাদার।

এক সন্ন্যাসী দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। ফাদারকে দেখে শান্তভাবে বললো—ফাদার, লুডউইগ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—লুডউইগ ! আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ফাদারের। বেশ, যাচ্ছি। আসুন মিঃ কেন্ট।

আবার মঠের গোলক ধাঁধাঁ পথ ধরে এগোতে লাগলো দুজনে।

হাঁটতে হাঁটতে ফাদার বললেন—লুডউইগ একজন কাঠের মিস্ত্রী, খুব ভাল তার হাতের কাজ। কেল্লাবাড়ীর সামনে তাকে উন্মাদ অবস্থায় পাই। নিয়ে আমি মঠে উঠি। মঠের ভাইদের সেবা-যত্নে সে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা বিগড়ে যায়। কিছু দিন আগে একজন সন্ন্যাসীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তাই ঘরের মধ্যে আটকে রাখি।

একসময়ে ফাদার এসে দাঁড়ালেন নির্দিষ্ট ঘরটির সামনে। প্রথম দরজাটা পেরিয়ে সরু প্যাসেজে পা রাখলো। তারপরেই লোহার দরজা ছোট্ট ঘর।

দুজনে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলো। টেবিলের পাশে বসে আছে একটা লোক। তাদের উপস্থিতি সে অনুভব করতে পারলো না। তন্ময় হয়ে একটার পর একটা মাছি মেরে টেবিলের ওপর জড় করছে। একটা বেশ ছোট গোছের মাছির স্তূপ তৈরী হয়ে গেল।

তারপর খপ করে হাতের মুঠোয় তুলে নিলো মাছিগুলো, মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে কচ্‌কচ্‌ করে চিবোতে লাগলো। তারপর চকাস্‌ চকাস্‌ শব্দ, পরম তৃপ্তি—আঃ, ডিনারের মত ডিনার।

কাণ্ড কারখানা দেখে চার্লসের বমি বমি লাগলো।

গম্ভীর কণ্ঠে ফাদার বললেন—বলো, কেন ডেকেছো?

ড্রয়ার খুলে নিঃশব্দে একটা পার্টমেন্ট কাগজ বের করে এগিয়ে দিলো লুডউইগ। কাগজে হিজিবিজি আঁচড়ের দাগ। অর্থের যেন মাথা মুণ্ডু নেই।

—নক্সাটা শেষ করেছি। কি, ভাল হয়েছে? প্রশ্ন করলো লুডউইগ।

ঘাড় নাড়লেন ফাদার, হ্যাঁ না—দুটোই প্রকাশ পেলো তাঁর ভঙ্গীতে

ড্রয়ারে কাগজটা রাখতে রাখতে লুডউইগ বললো—আচ্ছা। কাজ আরো হ'লে আবার ডেকে পাঠাবো।

স্তাণ্ডোর ঘর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন।

চার্লস বললো—যদি অনুমতি দেন, স্ত্রীর কাছে গিয়ে একটু বসি।

—আপত্তি নেই। তবে মনে রাখবেন, আপনারও বিশ্রামের প্রয়োজন।

মঠের বাইরে হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনা গেল। সেই সঙ্গে গাড়ীর শব্দ।

একজন সন্ন্যাসী ভাই ফাদারের কাছে এসে বললো—ফাদার, একজন আশ্রয়প্রার্থী এসে হাজির।

—হবে না। পরিষ্কার জবাব দিলেন স্তাণ্ডোর। আজকে কোন আগন্তুক মঠে প্রবেশ করতে পারবে না।

ফাদারের কথা শুনে সন্ন্যাসী ভাই আশ্চর্য হলো। বললো—কিন্তু অতিথিকে আশ্রয় দেওয়াই তো আমাদের কাজ।

—জানি। তবে মঠের ভেতরে নয়? বাইরের অতিথিশালায় তার থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এখন থেকে খাবার পাঠিয়ে দাও। বুঝেছো? আসুন, মিঃ কেন্ট।

ডায়ানার ঘরের সামনে এসে দুজনে হাজির হলেন। বিদায় নিলেন ফাদার। চার্লস ঘরে প্রবেশ করলো।

ডায়ানা বিছানায় শুয়ে, জেগেই আছে। একচোট ঘুমিয়ে একটু তাজা হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু চার্লসের কথা শুনে আবার তার মুখ ম্লান হয়ে গেল।

—তুমি ইংলণ্ডে ফিরে যাবে, ডায়ানা। এখানে আমার কাজ আছে। ঐ শয়তানটাকে ধ্বংস করতে হবে।

ডায়ানা একেবারে বেঁকে বসলো। সে কিছুতেই রাজী হয় না এ প্রস্তাবে। ঐ অভিশপ্ত কেল্লায় সে আর যেতে দিতে চায় না চার্লসকে।

সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন ফাদার। নিবিড় সান্ত্বনার ভঙ্গিমায় হাত ছোঁয়ালেন ডায়ানার কপালে। চার্লসকে একরকম ঠেলেই ঘর থেকে বের করে দিলেন।

তারপর বললেন—মিসেস কেন্ট, নিশ্চিন্তে থাকুন। ঘুমোন নির্ভাবনায়, এখানে কোন ভয় নেই। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার, চার্লসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

—কোন ভয় নেই, একেবারে নিরাপদ আশ্রয়।

ফাদারের কণ্ঠে একই বরাভয়বানী।

কথাগুলো প্রবেশ করলো চার্লসের মনের গহনে। হৃদয়ের মর্মস্থলে অনুরণিত হতে লাগলো একটা কথা—ভয় নেই, এখানে কোন ভয় নেই।

॥ সাত ॥

গভীর ঘুমে ডুবে আছে ডায়ানা।

কিন্তু শান্তিতে কি ঘুমোবার জো আছে। স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠেছে কাউন্ট ড্রাকুলার মুখ। সুঁচালো নখওয়ালা থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঠক-ঠক-ঠক!

ঘুম ভেঙে গেল তার। জানালার কাঁচে আওয়াজ। ধীরে ধীরে চোখ খুললো। ভয় ভয় চোখে তাকালো জানালার দিকে।

স্থির হয়ে গেল তার চোখের তারা।

জানালার কাঁচে হেলেন। কাঁচে মুখ চেপে ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছে করুণ চোখে, হাত নেড়ে তাকে ডাকছে।

—ডায়ানা, জানালাটা খুলে দাও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। জমে যাচ্ছি একেবারে। হেলেনের কণ্ঠে অনুনয়।

মুহূর্তের মধ্যে ডায়ানা কেমন যেন হয়ে গেল। কি যে করবে, কি করা উচিত —এই মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারলো না। চার্লসকে ডাকবে? ফাদার স্যাণ্ডোরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নেবে, জানালা খুলবে কিনা?

বিছানা ছেড়ে নামলো সে। দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। দরজার দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু পেছন থেকে হেলেনের গোঙানো শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—না! না! না! বাইরে যেয়ো না বোন! বিশ্বাস কর, আর কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে। দেখছো না আমি পালিয়ে এসেছি। জানালা খোল ডায়ানা—প্লীজ। আর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না।

দ্বিধায় পড়লো ডায়ানা। একদিকে হেলেনের করুণ প্রার্থনা, আর অন্য দিকে চার্লসের নিষেধ, ফাদারের সর্তকবাণী। কি করবে সে? মনের সঙ্গে চলছে তার দ্বন্দ্ব। হয়তো শেষ পর্যন্ত সে হেরে যাবে—ভেতরটা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে। হেলেনের কাতর অনুনয়, সে জানালা খুলে দেওয়ার জন্য ডাকছে। খুলেই দিই!

জানালায় ছিটকিনি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দুটো সশব্দে সরে গেলো।

দুপাশে। খপ্ করে কঠিন মুঠিতে ডায়ানার কব্জি খামচে ধরে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠলো হেলেন। হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এলো জানালার কাছে শিকারকে। তারপর নিজের মাথাটা গলিয়ে দিলো জানালার ভেতর দিয়ে, তারপর ধারালো শ্ব-দন্ত দুটি টুক্ করে ফুটিয়ে দিলো ডায়ানার হাতে।

যন্ত্রণায় আঁতকে উঠলো ডায়ানা। গুঙিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তে জানালা থেকে ছিটকে সরে গেল হেলেন। সেই জায়গা পূরণ করলো কাউন্ট ড্রাকুলা। রক্তলোভী ড্রাকুলা। সম্মোহনি চোখে তাকিয়ে আছে সে, সূচ্যগ্র শ্ব-দন্তে তাজা রক্তের তৃষ্ণা। হাতের মুঠোয় ধরার জন্য সে এগিয়ে এলো।

এই সময়ে দরজায় ধাক্কা পড়লো।

দরজা ফাঁক হয়ে গেল। সক্রোধে হুঙ্কার ছেড়ে ড্রাকুলা জানালার সামনে থেকে সরে গেল—মুখের শিকার ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো উপোসী নেকড়ে।

ডায়ানা মাটিতে পড়ে গেল।

চার্লস দৌড়ে এগিয়ে গেল স্ত্রীর কাছে। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ব্যস্ত ভাবে বললো—ডায়ানা, কি হয়েছে? বল, তোমার কি হয়েছে?

চার্লসের পেছন পেছন ফাদার স্তাণ্ডোরও ঘরে এসে ঢুকলেন। ডায়ানা অপলক চোখে তাকিয়ে আছে খোলা জানালার দিকে। ভয়, সন্ত্রস্ত এসে ভিড় করেছে তার চোখে।

ফাদার তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালার দিকে তাকালেন। খোলা জানালা পথে অবাধে ঘরে এসে প্রবেশ করছে হিমেল কুয়াশা। সশব্দে জানালার কপাট বন্ধ করে দিলেন ফাদার? ডায়ানাকে রাগত ভঙ্গিমায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিতে দিলেন।

কঠিনকণ্ঠে বললেন—বলুন, মিসেস কেন্ট, কি হয়েছে!

ডায়ানা নীরব। তার কথা যেন হারিয়ে গেছে। কেবল হাতটা সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরলো।

চার্লস তাকালো, তাকালেন ফাদার। হাতের কব্জিতে দুটি ছিদ্র, পাশাপাশি দুটো ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে গেল ফাদারের।

—সর্বনাশ। এ যে ভ্যাম্পায়ারের দাঁতের দাগ। অস্ফুটে বলে উঠলেন ফাদার! মিঃ কেন্ট, শক্ত করে হাতটা চেপে ধরুন। ছাড়বেন না একদম।

তারপর জ্বলন্ত লম্ফ তুলে নিলেন। কাঁচের শেড আগেই তেতে ছিল। একটুও ইতস্ততঃ না করে উত্তপ্ত কাঁচটা চেপে ধরলেন ডায়ানার রক্তঝরা মনিবন্ধের ক্ষতস্থান দুটির ওপর।

অসহ্য যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো ডায়ানা। ফাদার কিন্তু নীরব। উত্তপ্ত কাঁচের ছ্যাকায় একটু একটু করে পুড়ে গেল ডায়ানার ক্ষতস্থানের চামড়া। লাল দগ-দগে মাংস বেরিয়ে এলো।

ডায়ানা আর পারছে না। গোঙাতে গোঙাতে দুর্বল হয়ে পড়লো।

চার্লসের এ দৃশ্য চোখে সহ্য হচ্ছে না। বিহ্বলকণ্ঠে বললো—এবার রাখুন, ফাদার।

লম্ফ রেখে বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে গেলেন ফাদার। একটু পরে একজন সন্ন্যাসী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন।

—মার্ক, আজ রাত্রে কি কেউ মঠে আশ্রয় নিয়েছে?

মার্ক মাথা নীচু করে বললো—হ্যাঁ, আপনার অনুমতি পেয়ে একজন অতিথি-শালায় আশ্রয় নিয়েছে।

—লোকটা কে?

—সহিস।

—বুঝেছি। আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। মিঃ কেণ্ট, আমার সঙ্গে আসুন। মার্ক, মিসেস কেণ্টের হাতে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দাও। আর তুমি এখানেই থাকবে—একটুও এদিক-ওদিক হবে না।

তারপর প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে চার্লসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ফাদার।

মার্ক নির্দেশ মত ঘরের মধ্যে রইলো। ডায়ানা নিঝুম মেরে শুয়ে আছে বিছানায়, কেমন আচ্ছন্ন ভাব। আগুনে পোড়ানো ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল মার্ক। ব্যাণ্ডেজ করে দিল সযত্নে। এতক্ষণে জ্বালা কমলো।

দুজনে নীরব। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে দরজায় করাঘাত শব্দ করে উঠলো।

মার্ক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরে প্রবেশ করলো লুডউইগ।

এমন এসময়ে এই লোকটার আবির্ভাবে মার্ক হতভম্ব হয়ে গেল। আমতা আমতা করে জানতে চাইলো—তুমি এখানে?

—মিসেস কেণ্টকে ফাদার ডাকছেন, লুডউইগের কণ্ঠে আদেশ।

—কিন্তু, ফাদার যে বলে গেলেন—কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় হাতের ইশারায়, তাকে থামিয়ে দিলো লুডউইগ। এই লোকটা ডায়ানার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু মার্ক চুপ করে গেল। তাই সে বুঝলো, লুডউইগের কথাই তাকে শুনতে হবে।

তাই বিছানা থেকে নেমে পড়লো এবং লুডউইগকে অনুসরণ করলো।

লুডউইগ লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটিতে লাগলো। একসময়ে একটা বিরাট বড় ঘরে এসে হাজির হলো।

ডায়ানা লক্ষ্য করলো, ঘর ভর্তি বই। যেদিকে তাকানো যায়, কেবল বই আর বই। ঘরের মাঝখানে মস্ত বড় একটা টেবিল, চারধারে চেয়ার টেবিলের এক প্রান্তে কে যেন বসে আছে।

লুডউইগ বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো অচেনা লোকটা।

ফাদার স্নাণ্ডোর নয়—কাউন্ট ড্রাকুলা।

নিঃসীম আতঙ্কে শিউরে উঠলো ডায়ানা, মূক হয়ে গেলো। চাপা কণ্ঠে এতটুকু আওয়াজও শোনা গেল না। রক্তচক্ষু ড্রাকুলা সম্মোহনী চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। একটু নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

নিঃশব্দে হেসে উঠলো কাউন্ট, বেরিয়ে গেল হলুদ শ্ব-দন্ত দুটি।

ডায়ানা নিথর-নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো হিংস্র শ্বাপদ। ডায়ানার কাঁধ খামচে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো। বুকের সাদা শার্ট ফ্যাস করে ছিঁড়ে ফেললো। নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে গেল বুকের সাদা চামড়া। লাল টাটকা রক্ত অবাধে বেরিয়ে এলো। ভ্যাম্পায়ার রাজার বুকের রক্ত।

সেই রক্ত পান করতে নির্দেশ দিলো ড্রাকুলা। ডায়ানার চুলের মুঠি ধরে মুণ্ডটাকে টেনে নামিয়ে আনলো বুকের ওপর—ডায়ানা মন্ত্র মুগ্ধের মত রক্ত পান করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে—

ক্রুশের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলো নিজের বুকে। চকিতে কেটে গেল তার ঘোর। ক্ষণিক আগে যার শুকনো জিভে ছিল আকণ্ঠ পিপাসা, তাজা রক্ত পানে ছিল আগ্রহী। এই মুহূর্তে শীতল ক্রুশের ছোঁয়া পেয়ে ফিরে এলো তার জ্ঞান। গলা ফাটিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল ডায়ানাকে।

আবার জানোয়ারের মত হিংস্র থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে এলো ড্রাকুলা। কিন্তু পিছু হটেও নিজেকে বাঁচাতে পারলো না ডায়ানা। ড্রাকুলার লম্বা রোগা হাত আঁকড়ে ধরলো তার সোনালী চুল। হিড়হিড় করে টেনে এনে বুকের কাছে আকর্ষণ করলো। রক্ত দিয়ে ভেজাতে চাইছে কোমল

অকস্মাৎ বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এলো বাইরে থেকে—ডায়ানা! ডায়ানা! ডায়ানা!

চার্লসের কণ্ঠস্বর? ডায়ানার মনে হলো, যেন অনেক—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে পরিচিত কণ্ঠস্বর।

বড্ড দেরী হয়ে গেল! করুণ চোখে তাকালো ডায়ানা দরজার দিকে।

আর ঝুঁকি নিতে সাহস হলো না শরীরী বিভীষিকার। একহাতে আঁকড়ে ধরে রইলো ডায়ানার চুলের মুঠি। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তাকে জানালার কাছে। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে ফেললো জানালার কাঁচ। তারপর নিজে বেরিয়ে গেল ভাঙা জানালা দিয়ে। শেষে টেনে নিল ডায়ানাকে।

॥ আট ॥

দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে ফাদার বাইরে চলে এলেন। চার্লসও পেছনে পেছনে ছুটছে। নিঃসীম অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ে না। কিন্তু একটু পরে অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেল। একটা মালবওয়া বড় ঘোড়ার গাড়ী পলকের জন্য দেখা গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাছের ঘন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

গাড়ীতে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন ফাদার? চার্লসকে উঠতে সাহায্য করলেন। দুটো লম্বা বাক্স দেখতে পেলেন। দ্রুত হাতে বাক্সের ডালা খুলে ফেললেন মাটি ছড়ানো দুটি বাক্স

ফাদার দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—উঃ, কি ভুল-ই না করেছি। আমার বোকামির জন্যই এমন সর্বনাশ হলো। ড্রাকুলা আপনার বৌদিকে নিয়ে দিনের বেলাই এখানে এসেছে। ঐ দুটি বাক্সের মধ্যে থাকায় রোদ স্পর্শ করতে পারেনি ওদের। তারপর রাত্রে মঠে হানা দিয়েছে।

পকেট থেকে দুটো ক্রশ বের করলেন। দুটি বাক্সের মাটির মধ্যে গেঁথে দিলেন দুটি ক্রশ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—এবার বাপধনরা যাবে কোথায়? বাক্সে আর আস্তানা নিতে পারবে না। মিঃ কেন্ট, বলতে পারেন এ গাড়ি কে চালিয়ে নিয়ে এসেছে? ক্লোভ, কাউন্ট ড্রাকুলার একমাত্র ভৃত্য। কিন্তু ইডিয়েটগুলো আর দিনের বেলা বাক্সের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে পারবে না! সূর্যের আলোয় চলন্ত মড়াদের ধ্বংস করার এটাই একমাত্র মোক্ষম উপায়। এই সুযোগ আমরাও ছাড়বো না। চলুন।

—হ্যাঁ, চলুন। চার্লস উত্তেজিতকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো।

মঠের ভেতর থেকে ভেসে এলো চাপা কোলাহলের আওয়াজ। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। চার্লসকে নিয়ে ফটকের দিকে পা বাড়ালেন।

তাদেরকে দেখেই একজন সন্ন্যাসী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো—ফাদার আস্তাবল থেকে একটা মেয়েছেলেকে পাওয়া গেছে। সে লুকিয়ে ছিল।

—ধন্যবাদ। ড্রাকুলার খোঁজ পেয়েছো?

—না, ফাদার?

—যাও, মেয়েটাকে লুডউইগের ঘরে বন্দী করে রাখো।

নির্দেশ নিয়ে ফিরে গেল সন্ন্যাসী।

চার্লসকে উদ্দেশ্য করে বললেন ফাদার মিঃ কেণ্ট, ড্রাকুলার সৃষ্টিকারী পিশাচের ধ্বংস যদি দেখতে চান, তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। প্রথমেই বলি, এসব কিন্তু ভীতু লোকেদের জন্য নয়। ভয় পেলে চলবে না।

চার্লস জবাব দিল, কেবল ফাদারের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলো।

ফাদার গিয়ে হাজির হলেন লুডউইগের কামরায়। এক কোণে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। দুজন সন্ন্যাসীও সেখানে উপস্থিত। কোনদিকে নজর না দিয়ে ফাদার মেয়েটাকে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন।

কি একটা বলার জন্য লুডউইগ ফাদারের কানের কাছে মুখ আনলো। কিন্তু ফাদার তার কথা শুনলো না। তাকে বাইরে যেতে বললেন।

চার্লস তাকালো লুডউইগের দিকে। তার দুটি চোখে চাপা ধূর্ততার বিদ্রূপের আভাস। লোকটা কি সত্যিই পাগল?

কিছুক্ষণ পরেই দুই জোয়ান সন্ন্যাসী হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঘরে এনে ঢোকালো হেলেনকে। বৌদির মুখাকৃতি ও কাণ্ড দেখে চার্লস আঁতকে বন্য-জন্তুর মত ধারালো শ্ব-দন্ত বের করে দংষ্ট্রা বিকশিত করে অমানুষিকভাবে খিঁচোচ্ছে। রুক্ষ কর্কশ গলায় দম ফাটা চীৎকার করছে। আবার ক্ষণে ক্ষণে পিশাচিনীর মত বিকট কণ্ঠে হেসে উঠছে। দুই চোখে অপার্থিব চাউনি। চার্লসকে চেনার ক্ষমতা তার লোপ পেয়েছে। শরীরে দানবিক শক্তি ভর করেছে। নিজেকে ছাড়াবার জন্য দুজন বলশালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। সামান্য একটা মেয়েছেলের কাছে তাদের নাকামি-চোকামি খেতে হলো।

চার্লস এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো হেলেনের দিকে।

এই কি তার বৌদি?

মুখে বীভৎসা মাখানো, চোখে ঝরছে শয়তানি দৃষ্টি, রক্ততৃষ্ণা। এই কি তার বহু পরিচিত বৌদি?

হতে পারে না। হেলেন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়া পাল্টে গেল। যেন পচা গন্ধে ঘর ভরে গেছে। গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। কখনো না। এ তার বৌদি নয়।

ঘৃণা কুটিল বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরের প্রতিটি পুরুষকে যেন ভস্ম করতে চাইলো পিশাচিনী হেলেন।

সত্যি, ড্রাকুলার সৃষ্টি পিশাচিনী। ড্রাকুলার হাতের মুঠোয়। অলক্ষ্যে থেকে পরিচালনা করে চলেছে তার সৃষ্টিকে। এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

ফাদার সামনে এগিয়ে গেলো। হেলেন দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠলো। পেছনে চার্লস। সে লক্ষ্যও করলো না।

ফাদার বললেন…মিঃ বেণ্ট, যাকে সামনে দেখছেন, এ কিন্তু আপনার বৌদি নয়। আপনার বৌদির আবরণটাকে আশ্রয় করেছে ঐ পিশাচিনী, নরদানবী। একেই আমাদের ধ্বংস করতে হবে।

সন্ন্যাসী দুজনকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

লুডউইগের টেবিলের সামনে হেলেনকে হিড়হিড় করে নিয়ে এলো সন্ন্যাসী দুজন। তারপর জোর করে শুইয়ে দিলো টেবিলের উপরে। হাত-পা বেঁধে দেওয়া হলো টেবিলের চারটে পায়ের সঙ্গে। এমন কি লম্বা লম্বা চুলগুলো পর্যন্ত রেহাই পেলো না।

একজন সন্ন্যাসী একটা নতুন কাঠের শলাকা নিয়ে এলো। সবে তৈরী করা হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে। কাঁচা কাঠের গন্ধ চার্লসের নাকে এলো। সুচের মত সরু ফলাটার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর চক্ষু হেলেন যেন জড়সড় হয়ে গেল। বাঁধন খোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলো। তার কাণ্ড দেখে চার্লস রীতিমত ভীত হলো। আর দানবীর বিকট চীৎকারে কান পাতা দায় হলো।

কোন মানবী যে এইরকম ভয়াল-ভয়ঙ্কর স্বরে চেঁচাতে পারে, গায়ের রক্ত জল করার সুরে আর্তনাদ করতে পারে—নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই হতো না চার্লসের। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলো, কি ঘটে দেখার জন্যে।

ফাদার দুহাতে শলাকাটা ধরলেন। তারপর চোখ বুজে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বোধহয় প্রার্থনা করলেন। তারপর একবার শলাকাটা মাথার ওপর তুলে, পরক্ষণেই দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বসিয়ে দিলেন শরীরী দানবীর বামবক্ষে—একেবারে হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে।

হঠাৎ যেন গর্জে উঠলো একশোটা বজ্র। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো হাজার কণ্ঠস্বর। এমনভাবে শিরা উপশিরা ফুলিয়ে গর্জে উঠলো হেলেন। কোটরাগত দুটি চোখ বিস্ফারিত হলো।

তারপরেই সব হম্বিতম্বি শেষ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে মুদিত হলো আঁখি পল্লব। মুখ থেকে মুছে গেল বীভৎস ভয়াবহতা, বিলীন হলো পৈশাচিকতা। একটু আগেই যে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত রেখেছিল চলমান মৃতদেহটিকে—গোঁজ বিদ্ধ হতেই নিভে গেছে সেই অশুভ অব্যাখ্যাত অগ্নি। মুখাবয়বে ফিরে এসেছে অসীম প্রশান্তি। আনন্দলোকের অনন্ত পথে পরম শান্তির অভিযাত্রী হলে যে কোন মৃত মানুষের মুখে যে আশ্চর্য ধ্যানসুন্দর রূপ ফুটে ওঠে, তেমনি সমাহিত ভাব হেলেনের মুখচ্ছবিতে। পিশাচিনী ফিরে গেছে নরকে।

চার্লসের চোখ ফেটে জল এলো। পরম কারুনিকের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীরা সমস্বরে প্রার্থনা করছে—অভাগা এই নারীর লোকান্তরিত আত্মা যেন শান্তি লাভ করে।

ফাদারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো চার্লস। সরু বারান্দা দিয়ে হাঁটতেই ফাদারের পায়ে কি একটা লাগলো। টং করে আওয়াজ হলো। অবাক হয়ে মাথা নীচু করে দেখলেন—দুটা গরাদ। সঙ্গে সঙ্গে জানালার দিকে তাকালেন—দুটো গরাদ নেই।

ফাদার ভীষণ রেগে গেলেন। উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে হাঁক দিলেন—লুডউইগ। নিশ্চয় এটা ঐ হতভাগার কাজ। পুরোনো মনিবের ডাকে আর সাড়া না দিয়ে পারলো না।

চার্লস কিছুই বুঝতে পারলো না। হক্‌চকিয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে।

হঠাৎ মঠের দেওয়াল, ঘর সব খান খান হয়ে গেল। তোলপাড় হয়ে গেল একটা নারী-কণ্ঠের অবিরাম মর্মভেদী আর্তনাদে।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ডায়ানার আর্তনাদ। ভয়ঙ্করকে লক্ষ্য করে, মৃত্যুর থেকে মুক্তি পাবার আশায় হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তার করুণ আর্তি।

চার্লসকে টান মেরে নিয়ে ছুটলেন ফাদার। প্রধান ফটকের কাছে আসতেই লক্ষ্য করলেন, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দৌড়চ্ছে নরপিশাচ ড্রাকুলা, সঙ্গে ডায়ানা। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে বাঁচবার আশায় চীৎকার করে চলেছে। আর পেছনে ব্যাকুল হয়ে ছুটছে লুডউইগ। চেঁচাচ্ছে—মাস্টার, দোহাই আপনার, আমাকে একা রেখে যাবেন না।

মাস্টার তখন নিজের নিরাপত্তা খুঁজতে ব্যস্ত। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো গাড়িতে। অন্ধকার থেকে তার বেগে দৌড়ে এসে কেচোয়ানের বাক্সে লাফিয়ে

উঠলো ক্রোভ। সপাং করে আওয়াজ হলো চাবুকের। তারপরেই ধাঁ করে ছুটলো কালো ঘোড়ার গাড়ি।

—ঘোড়া আনুন···ঘোড়া···ওদের অনুসরণ করবো।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললো চার্লস।

—মিঃ কেণ্ট, তার আর প্রয়োজন নাই। শান্তভাবে জবাব দিলেন ফাদার। অভিশপ্ত কেল্লায় পৌছতে মাত্র একদিন লাগবে। ওদের পৌছতে পৌছতে কাল সন্ধ্যে। তার আগে ওদের যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা কাল ভোরেই বেরোবো।

একজন সন্ন্যাসী ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে জানালো—ফাদার, লুডউইগকে আবার ধরা হয়েছে।

ফাদার কড়া হুকুম দিলেন, তার ওপর যেন কোনরকম নির্যাতন করা না হয়। ঘরে আটকে রাখো।

তারপর চার্লসকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। বইয়ের তাকের আড়াল থেকে বের করে নিয়ে এলেন গুলি-ভরা রাইফেল। তারপর চার্লসের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আমাদের সন্ন্যাসীদের নরহত্যা করা নিষেধ। তাই আমার নামে এ কাজ করা সম্ভব নয়। ক্রোভকে আপনি খুন করবেন। এ-কাজের ভার আপনাকে দিলাম।

দুটো ক্রশ বের করে একটা চার্লসের হাতে দিলেন, অন্যটা নিজের পকেটে রেখে দিলেন।

॥ নয় ॥

কথামত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হাঁকালেন ফাদার।

এতক্ষণ চার্লস খুব অস্থির হয়েছিল। চঞ্চল মনে পায়চারি করেছে কেবল। এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্ত্রীকে আর মানুষের রূপে পাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পিশাচিনীদের যে কি বীভৎস রূপ হয়, সেটা সে নিজেই দেখেছে, তার বৌদিকে দিয়ে। যদি তার স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখতে হয়, ভেবে মন তার ব্যথায় ভরে গিয়েছিল, আচ্ছন্নের মত কেবল অপেক্ষা করেছিল সেই ক্ষণটির জন্য। স্বামী হয়েও সে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি। পিশাচ গুরু কাউন্ট ড্রাকুলা তার নিজের চোখের সামনে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার জীবন সঙ্গিনীকে। এতক্ষণে যে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটা নিশ্চিত। তারও অমানুষিক চোখে জেগেছে রক্ততৃষ্ণা, জিঘাংসা জেগেছে ধারালো শ্ব-দন্তে। কি দুঃসহ জ্বালা!

কিন্তু ফাদার ভ্যাণ্ডোর মধ্যে প্রকাশ পেলো না কোন চাঞ্চল্য। ঘোড়া ছুটে চলেছে বাতাসের বেগে। চার্লস বিমর্ষ, নিরাশা এসে তাকে গ্রাস করেছে। কিছুটা ক্লান্ত শরীর। ফাদার কিন্তু আশ্চর্য পুরুষ। তার মুখে-চোখে ফোটেনি এতটুকু পরাজয়ের গ্লানি। তাঁর লক্ষ্য একটাই—ড্রাকুলা-ধ্বংস।

বিকেল নাগাদ নাগাল ধরে ফেললেন সামনের গাড়ীটার। যেন স্বয়ং শয়তান উড়িয়ে নিয়ে চলেছে অতবড় মালবওয়া গাড়ীটাকে। একেই বলে প্রভঞ্জন বেগ। শয়তানের শক্তি ব্যতীত এতবড় চক্রযান এমন গতিতে ছুটে যাওয়া অসম্ভব। না, যত চেষ্টা করা হোক না কেন, সব ব্যর্থ হবে দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগে ঐ গাড়ি না ধরতে পারলে কাজ হবে না। আর সন্ধ্যের মধ্যে হবেও না।

অতএব আবার নৈরাশ্য এসে ঘিরে ধরলো চার্লসকে। ম্রিয়মান ও অবসন্ন হয়ে পড়লো।

কিন্তু ফাদার ভ্যাণ্ডোর মনোভাব অন্য। যে পথে এসেছিলেন সে পথে না গিয়ে ধরলেন অন্য রাস্তা। পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গলের সরু পথ অতিক্রম করে, বিষম বিপদসংকুল গিরিখাত অগ্রাহ্য করে অভিশপ্ত কোল্লাবাড়ির প্রাকার পার্শ্বে এসে যখন পৌছলেন, তখন ড্রাকুলার গাড়ি এসে হাজির হয়নি।

একটা গাছে উঠে বসলেন ফাদার। লক্ষ্য করলেন সূর্যের দিকে। কেল্লার পাশে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য পাটে বসেছে। আর অন্যদিকের পাহাড়ি পথ ধরে মালবওয়া গাড়িটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

কানে ভেসে আসছে ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ আওয়াজ। আর ঘোড়ার গলার সাজের রুন্ ঝুন্, রুন্ ঝুন্ ধ্বনি।

গাছ থেকে নেমে এলেন ফাদার। তারপর চার্লসকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন পথের প্রান্তে।

গাড়িটা ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে। কেল্লা থেকে কিছুটা দূরে। গাড়ি থেকে ক্লোভ লক্ষ্য করেছে ওদের দুজনকে, মারমুখী তাদের হাবভাব। গাড়ি থামিয়ে ছোরা বের করে ফাদারকে মারবার উদ্যোগ করতেই বাধা পেলো। পেছন থেকে ছুটে এলো রাইফেলের গুলি।

ক্লোভের বুকে গিয়ে বিঁধলো গুলি। তার পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে দিলো একেবারে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপরেই ছুটে এলো দ্বিতীয় গুলি। ব্যস, শেষ হয়ে গেল ক্লোভের আয়ু।

—সব শেষ, ফাদার বললেন। কিন্তু ভীষণ দেরী হয়ে গেছে। সূর্য যে অস্ত গেলো।

এর মধ্যে ঘটে গেলো আরেকটা নতুন বিপদ।

গুলির হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে ঘোড়াদুটো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে গাড়ি নিয়ে ছুটলো। চালকহীন গাড়ি উল্কার বেগে কেল্লার সেতুর দিকে ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাদার আর চার্লস ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করলো পেছন পেছন। ততক্ষণে বিরাট ভারী গাড়ীটা কাঠের পোলের ওপর উঠে পড়েছে। হারানো কাঠের সেতু। অত ভার সহ্য করতে না পেরে মড়মড় করে ভেঙে পড়লো। ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল গাড়ীর একটা চাকা। গাড়ীটা থেমে পড়লো, ঘোড়া দুটো আর ছুটতে পারলো না। দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঝাঁকুনির দাপটে একটা কফিন ছিটকে গিয়ে পড়লো পরিষ্কার জল জমা বরফের ওপর। তার ঢাকনার ওপর লেখা—কাউণ্ট ড্রাকুলা।

হেলে পড়া গাড়িটার ওপর গিয়ে উঠলো চার্লস। মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলো অন্য বাক্সের কাছে। একটানে খুলে ফেললো ডালা। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তার আদরের ডায়ানা। অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখে করুণ চাউনি। চার্লসকে দেখে মুখে ফুটে উঠলো নিষ্প্রভ হাসির রেখা।

এ হাসি চার্লসের চেনা, অতি-পরিচিত। তারই ডায়ানার হাসি। তাহলে ডায়ানা তার ডায়ানাই আছে। কাউন্ট ড্রাকুলা কি তবে সময় পায়নি ডায়ানার ওপর ভর করতে, পিশাচ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাকে তার সাক্ষাৎ করে নেওয়ার সুযোগ পায়নি। ডায়ানা এখনও মানবী—পিশাচিনী হয়নি সে।

উৎফুল্লতায় ভরে গেল চার্লসের বিমর্ষ অন্তর। হস্তীর বলে বলীয়ান হয়ে পাঁজাকোলা করে বাক্স থেকে তুলে নিয়ে এলো ডায়ানাকে। বাঁধন খুলে দিল।

কিন্তু উল্লাসে যোগ দিলেন না ফাদার। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—মিঃ কেন্ট, যথেষ্ট দেরী হয়েছে। ড্রাকুলার ঘুম ভাঙবার সময় হয়েছে। যান, আগে ওর ব্যবস্থা করুন।

সত্যিই তো! অর্ধাঙ্গিনীকে সুস্থ এবং সাধারণ অবস্থায় পেয়ে সবই ভুলে গেছিল চার্লস।

পিশাচগুরুর দিবানিদ্রা ভাঙবার সময় হলো—নিশীথ অভিযানের লগ্ন আসন্ন। আর দেরী করা সম্ভব নয়। জমাট-বাঁধা বরফের ওপর লাফিয়ে পড়লো চার্লস। কফিনের ডালাটা খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু উঁচু থেকে পড়ার ফলে কোথায় যেন ডালাটা আটকে গেছে—খোলা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে নেমে এলো গোধূলি। কফিনের ডালায় পড়লো অন্ধকারের কালোছায়া।

তৎক্ষণাৎ শোনা গেল গর্জন, কফিনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে সক্রোধ হুঙ্কার। পরমুহূর্তে প্রবল আঘাতে মড়মড় করে ডালা ভেঙে উঠে এল একটা হাত—ড্রাকুলার হাত।

চার্লসের কব্জি চেপে ধরলো ড্রাকুলার হাত। সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরেছে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। তার হাসির চোটে আশপাশ কেঁপে উঠলো। পরক্ষণে শয্যা ছেড়ে উঠে এলো কাউন্ট ড্রাকুলা।

দীর্ঘ শীর্ণ ভ্যাম্পায়ার—শয়তান অধিপতি কাউন্ট ড্রাকুলা।

ফাদার স্যাণ্ডোরের মত অসমসাহসী পুরুষও হকচকিয়ে গেল। হাতের রাইফেল হাতেই রইলো। বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। খোদ শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে চার্লস। তাকে কি বাঁচাতে পারবেন তিনি? কি তাঁর ক্ষমতা আছে?

ডায়ানা দাঁতে দাঁত পিসে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—কি বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন? গুলি চালান।

ফাদার আমতা আমতা করে বললেন—গুলিতে কাউন্ট ড্রাকুলা জব্দ হয় না, মিসেস কেন্ট।

ডায়ানা অতশত বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সে এখন মরিয়া। স্বামীকে বাঁচাতেই হবে। আর রাইফেল চালাতে সে-ও পারে। অতএব কোন কথা না বলে ছোঁ মেরে টেনে নিল রাইফেলটা। তারপর ড্রাকুলাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো একটার পর একটা।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ঠিকমত লক্ষ্য স্থির করা যায়নি। তাই বুলেট গিয়ে ছিটকে পড়লো ড্রাকুলার পায়ের তলায় বরফের মধ্যে। তোড়ে জল বেরিয়ে এলো তলা থেকে। চার্লস তখনও বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া লাগতেই মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল শয়তানের অট্টহাস। হিংস্র নেকড়ের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

এবারে বোধ হয় ফাদারের চৈতন্য ফিরেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন—এই তো ড্রাকুলাকে ধ্বংস করার উপযুক্ত অস্ত্র। জল! জল! কেবল জল। মিসেস কেন্ট, গুলি চালান। বরফের আস্তরণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন। ডুবিয়ে দিন ড্রাকুলাকে। চালান গুলি!

ইতিমধ্যে ডায়ানা তার মনস্থির করে ফেলেছে এবং নিশানাও। পরমুহূর্তেই অর্জুনের মত নির্ভুল নিশানায় উপযুক্তির গুলি ছুঁড়তে লাগলো। এত উত্তেজনা, এত হট্টগোল, আতঙ্কের মধ্যেও তার চোখ এবং হাত রইলো স্থির। পরপর তিনবার গুলি বিঁধলো বরফের চাঁইয়ের ওপর। ড্রাকুলার পায়ের তলার বরফ ভেঙে গলে জলে পরিণত হলো। হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে।

ফাঁদে পড়েছে জানোয়ার। অসহায়ের মত লাফালাফি করতে লাগল শয়তান। একটু ডাঙা পাওয়ার আশায় হাঁক-পাক করতে লাগলো। যেটাকে আশ্রয় করে কিনারায় যাবে। চার্লস তার মুঠি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে এক ছুটে তীরে চলে এলো।

ফাদার তখন ড্রাকুলাকে ধ্বংস করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে আগুনের গোলা। ডায়ানার হাত থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে চটপট ভরে নিলেন গুলি। তারপর এলোমেলোভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। জায়গায় জায়গায় ফেটে গেলো জমাট-বাঁধা বরফ। জল বেরিয়ে এলো।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ড্রাকুলা। হিংস্র নিনাদে চীৎকার

করছে। তীরের দিকে এগোবার চেষ্টা করতেই দেহের ভারে ফাট ধরা বরফের স্তর ভেঙে পড়লো। তার আগে পাড় আঁকড়ে ধরেছিল পিশাচ-গুরু। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারলো না বাঁচতে। আরো কিছুটা বরফ হুড়মুড় করে পড়লো তার ঘাড়ে। ব্যস, অবাধে জল এসে তাকে ভাসিয়ে দিল। তারপর একসময়ে মিলিয়ে গেল সম্রাট পিশাচ কাউণ্ট ড্রাকুলা। তার আগে কেবল নিমেষের জন্য শোনা গেল শয়তানের বুকফাটা চীৎকার।

সব শেষ।

ফাদার স্ট্যাণ্ডার কপালের ঘাম মুছলেন।

তারপর ধীরে ধীরে শান্তভাবে বললেন—চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লো কাউণ্ট ড্রাকুলা। আর জাগবে না।

সত্যিই বোকা বউটা। বাইরের খস্‌খস্ আওয়াজ পেয়ে কেবলই স্বামীকে খোঁচাচ্ছে, দেখে আসার জন্য। অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ।

কি আনন্দ। হলদে দাঁত বের করে হাসলো ক্লোভ, হাসির আওয়াজ কিন্তু শোনা গেল না। ওদের কাছেও এ পুরী তাহলে নিছক প্রস্তর পুরী। পরম লগ্নে এ প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়ালের পাথরও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। বোকা মেয়েটা মনে হয় অতীন্দ্রিয়, অতি অনুভূতি দিয়ে তারই পূর্ব সংকেত পেয়েছে। মনিবের এমনই মেয়ে প্রয়োজন।

আলতো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয়ই স্বামী দেবতাটি স্ত্রীর কথামত বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছে। টুক করে দরজার সামনে থেকে সরে এলো ক্লোভ। একটু দূরে থামের আড়ালে গিয়ে লুকালো। একটা ভারী বস্ত্র এখানে রয়েছে। অভিনয়ের সরঞ্জাম হিসাবে আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছে বাক্সটা।

নির্বোধ এলানা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হাতে জলন্ত মোমবাতি। ততক্ষনে ক্লোভ বেরিয়ে এসেছে থামের আড়াল থেকে। বাক্সটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো। অলিন্দের দিকে এগিয়ে চললো। এমন ভাব দেখালো, এলানা তাকে দেখতে পেয়েছে এবং পেছনে পেছনে আসছে।

এলানা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে। নিক, কুছ পরোয়া।

নির্দিষ্ট ভারী পর্দাটার কাছে এসে বস্ত্রটাকে সরিয়ে দিল আড়ালে। তারপর এলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পর্দাটা দুলিয়ে দিল। তাহলেই সে পর্দার কাছে এগিয়ে আসবে এবং গুপ্ত দরজার সন্ধান পাবে।

সত্যি, পর্দার আড়ালে গোপন দরজা আবিষ্কার করে এলানার কৌতূহল বেড়ে গেল। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পাতাল পথে নেমে পড়ল, পা রাখলো কবরখানায়।

একটা কাফন—কাউণ্ট ড্রাকুলা। কফিনের ঠিক ওপরেই স্তম্ভ থেকে ঝুলছে নাইলনের দড়িটা। সে দেখতেও পেলোনা। আর পেলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক কোণে ঝুলন্ত কম্বলটা দেখে তার বিস্ময় চরমে উঠলো। কম্বলের আড়ালেই একটা বিছানা পাতা, অতি সাধারণ।

কবরখানায় কফিনের পাশে কে রাত কাটায়? এমন বোকচন্দ্র কে আছে—এই রকম প্রশ্নে নিশ্চয় ওর মন অস্থির। কি করে জানবে এলানা, এটা হলো প্রভুভক্ত ক্লোভের শয্যা। সে কখনও প্রভুর কাছ ছাড়া হয়নি। প্রাসাদের কোন বিলাসিতাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কবরখানায় প্রভুর ভস্মের একান্ত পাশটিতে এই দশ দশটি বছর ধরে পালন করছে কৃচ্ছ্রসাধন।

এলানার যখন এমনই বিস্ময় বিহ্বল অবস্থা, তখন ধীর পায়ে পেছনে এসে দাঁড়ালো ক্লোভ। নেই কোন চাঞ্চল্য, কি প্রয়োজন তাড়াহুড়োর? শিকার যখন ফাঁদে পড়েছে, তখন হাতের মুঠোয় আসবেই।

হ্যাঁচকা টানে ঝুলন্ত কম্বলটা টেনে দিলো এলানার মাথার ওপর। হঠাৎ গলায় টান পড়তেই টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল সে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল মোমবাতি, নিভে গেল। অদূরে জ্বলছে ক্লোভের আনা লম্ফ। লম্ফের ক্ষীণ আলোয় এলানা তাকালো সামনের কালো মূর্তির দিকে। কোটরাগত চক্ষু দুটি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে, হাতে ঝক্‌ঝকে শাণিত ছোরা।

আতঙ্কে এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়ার দরুণ মুহূর্তের জন্যে অসাড় হয়ে গিয়েছিল এলানা। ঐ একটি মুহূর্তই যথেষ্ট সময় ক্লোভের কাছে। নিশানা মতো নামিয়ে আনলো ছুরি। এলানার কণ্ঠে এসে বিঁধলো তীক্ষ্ণ ফলা। ফ্যাচ করে টেনে বের করে আবার কণ্ঠনালীতে বিঁধে দিলো।

এলানার প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হলো। মাটিতে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। মূল্যবান এই রক্ত। অগ্রাহ্য করার জিনিস নয়। তাই অতি দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করলো সে।

টেনে নিয়ে এলো ঝুলন্ত দড়িটা। আগাপাছতলা বেশ করে বাঁধলো এলানার মৃতদেহটা। তারপর কফিনের ঠিক ওপরে লাশ টেনে তুললো। নিমেষের মধ্যে

টাটকা লাল রক্তে ভেসে গেল কফিনের ডালা। ডালা খুলে হেলিয়ে দিল ক্লোভ। ভস্মের আধার এনে ছড়িয়ে দিল শূন্যগর্ভ কফিনের একদিক থেকে আরেক দিকে।

হঠাৎ কোথা থেকে হু-হু করে প্রবেশ করলো দমকা হাওয়া। পাতাল কক্ষ ভরে গেল বাতাসে। উথালি পাথালি-হাওয়া। কাজ করতে অসুবিধা হলো ক্লোভের। তবু অনেক কসরৎ করে সম্পন্ন করলো শেষ কাজটুকু। শাণিত ছুরির কয়েকটা কোপে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো এলানার স্থির চক্ষুসমেত মুণ্ডুটা। অনর্গল বয়ে গেল রক্তস্রোত। ভিজিয়ে দিল কফিনের মধ্যে রাখা ছাইয়ের স্তূপ।

দমকা হাওয়া যেন কঁকিয়ে উঠলো পাতাল-বিবর থেকে।

ক্লোভ এবার কফিন থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করছে তার কাজের প্রতিক্রিয়া। মাস্টারের নির্দেশ মত পালন করেছে সে সব। প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে মেনে চলেছে। এবার কেবল প্রতীক্ষা।

হঠাৎ কফিনের মধ্যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হলো। গলগল করে বেরোতে লাগলো ধোঁয়ার রাশি। কফিনের তলদেশ থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসছে। আশ্চর্য! কোথাও কিছু নেই—অথচ—ধূম্ররাশি জমা হচ্ছে। দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না অপার্থিব ধোঁয়াকে। তাল তাল ধূসর বর্ণের রক্তস্ত-কুটিল ধোঁয়া কফিনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে যেন জমাট হয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই কফিনের ডালাটা সরে গেল একটা লম্বা রোগা হাত আঁকড়ে ধরলো কফিনের কিনারা। সাদা চামড়ার হাত, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাতের শিরা উপশিরাগুলি। রোগা অথচ নিরতিসীম শক্তিময় সেই আঙুল দেখেই শিউরে উঠলো ক্লোভ। তার আপাদ মস্তক কাঁটা দিয়ে উঠলো। কেবল যে ভয়ের প্রমাণ ঐ শিহরণ তা নয়, আনন্দেরও বটে!

জেগেছে তার মাস্টার। দশ বছর পরে ঘুম ভেঙেছে কাউণ্ট ড্রাকুলার

পরক্ষণেই কফিনের মধ্যে থেকে গর্জে উঠলো। ভয়াল-ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর। ক্লোভ কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। কথাটা কেমন তার জড়িয়ে আছে। জিভ তার আড়ষ্ট। উত্তর দিতে পারলো না, কেবল নীরবে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো সরু প্যাসেজে। উপকার আমন্ত্রণের পালা এসে গেছে।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো এলানার দরজার কাছে। দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে দাঁড়ালো হেলেন।

ক্লোভ কেবল বললো—আপনি এখুনি আসুন, আপনার স্বামী বিপদে

পড়েছেন। বলেই আর একটুও অপেক্ষা না করে রক্ত মাখা হাতদুটো হেলেনের চোখের সামনে একবার নেড়ে গিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল কবরখানার দিকে।

হেলেন প্রায় উন্মাদের মত ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে তার পেছন পেছন। কিন্তু ক্লোভের দিক থেকে কোন সাড়া মিললো না। সে এমনই ভান করলো যেন ডাক শুনতেই পায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাতাল কক্ষের কবরখানায় প্রবেশ করলো হেলেন। কফিনের ওপর মুণ্ডু কাটা দেহটি দেখে সে বুকফাটা চীৎকারে ফাটিয়ে দিলো পাতাল কক্ষ। তার বক্ষ পিঞ্জর ভেদ করা আর্তনাদে কক্ষের দেওয়ালগুলো বুঝি সিঁটিয়ে গেল। আসার জন্যে পেছন ফিরতেই বাধা পেলো। দীর্ঘ শীর্ণ এক মূর্তি তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। কালো পোশাকে তার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। কেবল হাড্ডিসার দেহ কিন্তু পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা। রক্তের মত আঁখি তারায় সম্মোহনের দৃষ্টি।

আর কৃষ্ণমূর্তির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে ক্লোভ, হলুদ দাঁত বের করে শ্যেন দৃষ্টিতে।

এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো গায়ের কালো পোশাক। চলন্ত অশরীরীর মত দীর্ঘকায় পুরুষটি দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। আঙুলের ডগায় ধারালো তীক্ষ্ণ নখর ঝকঝক করে উঠলো।

মন্ত্র দ্বারা যেন আবদ্ধ হয়েছে হেলেন। রক্তাভ চাহনির সম্মোহনী চোখের প্রদীপ্ত আভায় দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো সেই মুহূর্তে।

হেলেনের সাদা ধবধবে গলার চামড়ায় ফুটে গেলো ড্রাকুলার ধারালো নখর।

শব্দহীন হেসে উঠলো চলন্ত বিভিষিকা। ঠোঁটে ফুটে উঠলো মৃদু দ্বিধা।

লম্ফের কম্পমান শিখায় ঝকঝক করে উঠলো শয়তানের শ্ব-দন্ত দুটি।

ডায়ানার ঝাঁকুনিতে চার্লসের ঘুম ভেঙে গেলো। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলো বিছানায়। ডায়ানার দিকে তাকালো ঘুম ঘুম চোখে। ডায়ানার মুখের ভাব এমনই, যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে। ঘড়ির দিকে তাকালো চার্লস— এগারোটা।

—কি হলো?

—দেখেছো তোমার দাদা বৌদির কাণ্ডটা ? আমাদের কিছু না বলে-কয়ে পালিয়েছে।

—কি আবোল-তাবোল বকছো ?

—বেশ তো, গিয়েই দেখে এসো।

আর কাল বিলম্ব না করে ছুটে গেল চার্লস পাশের ঘরে। সত্যিই, দাদা-বৌদির চিহ্নমাত্র নেই। কেউ যে এ ঘরের বিছানা-পত্র ব্যবহার করেছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। এমন কি ফায়ার প্লেসের ছাই পর্যন্ত পরিষ্কার। দাদা-বৌদির মালপত্র পর্যন্ত বেপাত্তা।

—আশ্চর্য ! গেল কোথায় ?

—পালিয়েছে। আমাদের ফেলে পালিয়েছে।

—মোটেও না। নিশ্চয় কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনে।

—আমি ঘুরে দেখে এসেছি। ওদের চিহ্নমাত্র নেই।

—ক্লোভ ?

—সে-ও বেপাত্তা। বাড়ী ফাঁকা। চলো, আমরাও চলে যাই। এখুনি, বেরিয়ে পড়ি।

এখন আর ডায়ানার কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর নয়। রীতিমত দৃঢ় তার গলা। তার মাথায় এখন জেদ চেপেছে।

চার্লস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নাম ধরে হাঁক দিলো—ক্লোভ ! কিন্তু কোন সাড়া নেই। রান্নাঘর পর্যন্ত খুঁজে এলো। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সারা বাড়ী গড়ের মাঠ ! নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা, দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়।

ফিরে এসে দেখে ডায়ানা যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্যুটকেস গোছানো হয়ে গেছে। চার্লসের কোন কথা, কোন যুক্তি সে গ্রাহ্য করলো না। দুহাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়লো প্রাসাদের বাইরে। ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চললো অরণ্যের দিকে।

হাতে দুটো স্যুটকেস থাকায় ডায়ানা জোরে জোরে হাঁটতে পারছে না। কিন্তু চার্লসেরও গতি শ্লথ। তার মন পড়ে আছে কেল্লায়। দাদা-বৌদির জন্য মন ব্যাকুল। জলজ্যান্ত মানুষ দুটো কোথায় গেল, এ-রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত এখান থেকে চলে যেতে সে নারাজ।

চৌমাথার সেই কাঠুরে কুটিরে যখন তারা পৌছলো তখন ঘড়িতে বাজে দুটো।

চার্লস বললো—সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করো। ঘোড়া হাঁকিয়ে কোচোয়ান এলে সেই গাড়িতে করে যোশেফবাদে ফিরে যেয়ো। তবে কোচোয়ান ছাড়া কোন গাড়ীতে উঠবে না। আমি সন্ধ্যে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরে আসবো। অবশ্য কোন অঘটন যদি না ঘটে।

শেষ কথাটা তীরের মত গিয়ে বিঁধলো ডায়ানার অন্তরের অন্তঃস্থলে। অবশ্য কোন অঘটন যদি না ঘটে—

ভয় জড়ানো কণ্ঠে ডায়ানা বললো—এখানে তো পাচটা না বাজতে বাজতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়, অন্ধকারে ভরে যায়।

—তুমি অন্ধকারকে ভয় পাও।

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে চার্লস পা বাড়ালো। দাদা বৌদির খোঁজ তাকে নিতেই হবে। বউকে কাঠুরে কুটিরে রেখে ফিরে এলো ভাঙা কেল্লায়, যেখানে পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে বরফ ছাওয়া পরিখায়। যার সেতু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, যার সর্বাঙ্গে মহাকালের করাল স্পর্শ অতি সুস্পষ্ট।

সোজা অলিন্দে উঠে গেল চার্লস। যে ঘরে গত রাতে রাত কাটিয়েছে সেই ঘরে এসে ঢুকলো। অবাক কাণ্ড! সকালে যে সব আসবাবপত্র ও বিলাস সামগ্রী এঘরে দেখেছিল, সেগুলো কিছুই নেই। ঘর একেবারে ধোয়া-মোছা। ভোজবাজির মত যেন হাওয়া হয়ে গেছে সব।

অলিন্দ পথে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে শেষ প্রান্তে এসে পৌছোলো সে। হাওয়ায় পর্দা দুলছে। অথচ অলিন্দের এদিকে কোন হাওয়া নেই। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে শিরশির করে খেলে গেলো হিমশীতল আর্দ্র হাওয়া।

তবে কি ঐ পর্দার আড়ালে আছে কোন গুপ্ত পথ? সে পথ [illegible]য় নেমে গেছে তার দাদা-বৌদি। ফিরে আর আসেনি তারা।

মনকে শক্ত করলো চার্লস। তারপর এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পর্দা।

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক সঙ্কীর্ণ পাতালমুখী সুড়ঙ্গ। যেন তাকে গিলে খেতে আসছে। সারি সারি সিঁড়ি নেমে গেছে পাতাল কক্ষে।

ভয়, শঙ্কা সব দূরে ফেলে দিয়ে একটা প্রকট সিঁড়ি পার হয়ে নেমে এলো চার্লস। নীচু ছাদ, তাই মাথা হেঁট করে নামতে হলো। এক সময়ে সবশেষ ধাপে এসে পা রাখলো। সামনেই প্রশস্ত পাতাল কক্ষ।

দুম করে ভেতরে ঢুকে পড়াটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো না তার। তাই সিঁড়ির শেষে ধাপে দাঁড়িয়ে শরীর টান টান করলো। অপেক্ষা করছে

লাগলো, কেউ আসে কি না। কিন্তু কেউই ধেয়ে এলো না তার দিকে—কি নিরস্ত্র, অথবা অস্ত্রধারী।

এবার নিশ্চিন্ত। ঘরের মেঝেতে পা রাখলো চার্লস।

কিছুটা দূরেই একটা কফিন পড়ে থাকতে দেখলো। ডালাটা আলগা, অথচ উঁকি মেরে ভেতরটা দেখবার সাহস অথবা প্রবৃত্তি হলো না তার। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একজায়গায় কেবল চোখটা তার ঘুরতে লাগলো। চক্রাকারে, হঠাৎ একটা বিরাট বাক্স তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাক্সের সামনে। ডালা খুলতেই চেতনা হারালো সে। আচ্ছন্ন হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য।

বীভৎস ভয়াবহ ভঙ্গিমায় তালগোল পাকানো একটা মুণ্ডু পড়ে আছে। তার দুটি নিস্প্রভ চোখ তাকে লক্ষ্য করছে। ধড় থেকে আলাদা করা মুণ্ডুটা। রক্তহীন ফ্যাকাসে ধড়টা পড়ে আছে। গায়ের পোশাক শুকনো রক্তে কালো হয়ে গেছে। দাদার অমন সুন্দর রূপের পরিবর্তে এমন ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হবে, এটা সে দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। আবার সম্বিৎ হারালো সে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে।

ধাতস্থ হতেই ছুটে গেল কফিনের দিকে। কাছে আসতেই সুস্পষ্ট দেখা গেল সব একটা নিষ্ঠুর মুখ শীর্ণদেহ শোয়ানো আছে কফিনে, সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত। শয়তানের এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। চোখের পাতা বন্ধ। সেখানে প্রাণের চিহ্ন নেই এতটুকু কিন্তু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে হলুদ রঙের শ্বদন্ত দুটি। সেখানে হিংসা জিঘাংসা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বাঁকা ঠোঁটেও পাশবিক লালসার আভাস। এ যেন মানুষ নয়, মানুষরূপী এক শয়তান। কফিনের মধ্যে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে স্বয়ং নরক সম্রাট।

চার্লস সোজা হয়ে দাঁড়ালো এই তাহলে সেই মাস্টার, ক্রোভের মাস্টার কাউন্ট ড্রাকুলা। পাশে শোয়ানো কফিনের ডালায় খোদিত আছে তার নাম।

ইতিমধ্যে বাইরে নেমে এসেছে গোধূলি। প্রকৃতি মুখে টেনেছে কালো ওড়না। গুটি-গুটি পায়ে ঘিরে ধরেছে শয়তান সম্রাটের কেল্লা প্রাসাদকে।

আচমকা খুলে গেল শয়তানের বন্ধ চোখ। 'অশরীরী প্রেত মূর্তি তাকালো চার্লসের দিকে।

নিমেষের মধ্যে চার্লস ছিটকে এলো সেখান থেকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো পাতাল কক্ষের দ্বার মুখে।

তৃতীয় পর্ব

॥ এক ॥

রজারসের মিউজিয়ামের কথা এর আগে একবার করে মুখে শুনেছিল জোনস। বলেছিল—নদী পার হয়ে ওপারের সাউথ ওয়ার্ক স্ট্রীটের একটা পুরাণ ভবনের মাটির তলায় ঐ যাদুঘরটি রয়েছে। রজারসের মোমের তৈরী জিনিসগুলো নাকি মাদাস তুসাদের যাদুঘরের অতি পরিচিত নারকীয় প্রতিমূর্তির চেয়েও ভয়াবহ, দর্শকদের পিলে চমকে যেত।

প্রথম যেদিন জোনস ঐ মিউজিয়ামে যায়, বলা যায় একদম অনিচ্ছা ও হতাশা নিয়েই গিয়েছিল। সামান্য কৌতূহল ছিল। কিন্তু সব কিছু দেখার পর জোনস যে সত্যিই হতাশ হয়নি, সেটা সে অকপটেই স্বীকার করলো। রজারসের এই যাদুঘরটা যেমন বিচিত্র তেমনি অদ্ভুত—একথা একবাক্যে উচ্চারণ করতে হলো তাকে। এখানকার সব কিছু স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট। মাদাস তুসাদ সেই তুলনায় নিষ্প্রভ। যখন সে অনুভব করলো রজারস সত্যিই একজন উঁচুদরের শিল্পী, তখন তার ছিন্ন কৌতূহল সঞ্জীবতায় পূর্ণ হয়ে গেল। সে যা অনুমান করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভা উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান। অবশ্য, চিরাচরিত সেই রক্তাক্ত ঘৃণ্য প্রতিমূর্তিগুলো তার মনে কোন রেখাপাতই করেনি। লানড্রু (৫০টি নারীকে যে হত্যা করেছিল), ডক্টর ক্রিপেন, মাদাম, দেমারস, রিহিত, লেডী জেন গ্রে এমনি আরও অনেক বিকৃত বিকলাঙ্গ প্রতিমূর্তি, সেই সঙ্গে দানবীর আকৃতির গিলেস্ দ্য রেইস এবং মারকুইস্ দ্য সেদ, যুদ্ধ বিপ্লব দাঙ্গায় যারা নিহত হয়েছিল, জোনসের অভ্যস্ত চোখে এই বীভৎস মূর্তিগুলো একান্তই একঘেঁয়ে। কিন্তু জোনস এখানে এমন একটা বিস্ময়কর কিছু লক্ষ্য করেছিল যার ফলে তার হৃৎপিণ্ডটা ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হবার জন্য শেষ পর্যায়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল, আর সেই সময়ে মিউজিয়াম বন্ধ হবার একটা ধ্বনি বেজে উঠলো, সে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘরটার দিকে।

সে দারুণ আশা নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়েছিল, মনে করেছিল লোকটা

তার দিকে তাকাবে। লোকটা যে সাধারণ নয়, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কারণ এই যাদুঘরে যেসব বিচিত্র বস্তু সে সংগ্রহ করেছে, তাতে তার নামে যত বদনাম হোক না কেন, সে নিশ্চিন্তেই ছিল যে সে একজন খাঁটি লোক।

পরে রজারস সম্পর্কে সে অনেক কথাই জানতে পারলো। মাদাস তুসাদের যাদুঘরেই সে আগে কর্মচারী ছিল। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়। মাদাম তাই তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়। রজারস সম্পর্কে একটি বিমিশ্র গোপনীয়তা মাদাসকে বেশ আগ্রহী করেছিল। তার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করতে আর এরই ফলশ্রুতি হিসেবে একদিন রজারসের গোপন কীর্তি-কলাপ ধরা পড়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই চিন্তাবিভ্রান্তিকর এবং তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে যখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তখনই প্রকাশ পেল, ব্যক্তিগত জীবনে রজারস আড়ালে অপদেবতাদের পূজা করে। ঐ সব দেবতারা কেবল অমঙ্গলই করতে পারে, এমন কি পৃথিবীর মানুষ ওদের নাম শুনলে শিউরে ওঠে। রজারসের এই পাগলামীর ব্যাপারটা নিয়ে খবরের কাগজগুলো খুব নাচানাচি করেছিল।

একসময়ে কাজ-কর্ম ছেড়ে রজারস চলে আসে সাউথওয়ার্ক স্ট্রীটের সেই পুরোন বাড়ীটায়। নিজস্ব প্রতিভার ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য 'বস্তু' সামগ্রী নিয়ে গড়ে তুললো যাদুঘর। তখন আবার রাতারাতি সে সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো, সুনাম ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। যারা তার ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করতো, তারা নীরব হয়ে গেল, সেই সঙ্গে রজারসের বিবিক্ত চেতনারও যেন নতুন জন্ম লাভ করলো।

রজারস রাতের পর বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন দেখতো। স্মৃতিপটে এঁকে নিতো এক একটা কাল্পনিক চেহারা। পরে সেগুলো ছবির মত এঁকে নিয়ে তৈরী করতো এক একটি প্রতিমূর্তি। মোমের তৈরী পুতুল ক্ষুরধার শৈলী প্রতিভায় সেগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতো। অতিমাত্রায় ক্রুর সমালোচকরা তার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাজাস্তুতির মাত্রাকে দুঃসাহসিক ভাবে বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিল। কেননা, আইকনোগ্রাফি এবং টেরাটোলজি এই পরিশীলিত দক্ষতায় রজারসের হাত এতই নিপুণ হয়ে উঠেছিল।

রজারস অতি ভদ্রভাবে তার ঐ স্বাপ্নিক প্রতিমূর্তিগুলোকে প্রদর্শনী মঞ্চগুলোর পাশের একটি এ্যালকোভে রেখেছিল আর বয়স্কদের জন্যে মার্কা প্রদর্শনী ঘরের পেছনে যে ঘরটায় তার গুপ্ত সংগ্রহগুলো আসন লাভ করেছিল সেখানে সাধারণ

কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। অবশ্য জোনসের সতর্ক দৃষ্টি কেবল সাধারণ প্রদর্শনী মঞ্চগুলোর সামগ্রীর ওপরেই ছিল। অসম্পূর্ণ মূর্তিগুলোর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঘরের আধো-আধো আলোছায়ার শেলফের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেন মানুষের দেহের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙ। সেই সব বীভৎস ঘৃণ্য প্রতিমূর্তিগুলোর গায়ে যেন ভাল ভাল মাংসপিণ্ড লাগানো অথবা সবে কাটা হয়েছে ধারালো ক্ষুর দিয়ে।

জোনসের মুখে আর রা নেই।

মূর্তিগুলোর মধ্যে কতকগুলো পৌরাণিক মূর্তিও রয়েছে, যেগুলো চেনা। গরগন, চিমেরাস, ড্রাগন, সাইক্লপ এবং আরও নানা ধরণের বিভীষিকাময় চেহারার মূর্তি। কোনটার হাত-পা ভাঙ্গা, কোনটার চোখ-কান নেই। কোনটা বীভৎস সাবলীল। তাদের চোখে-মুখে নরকের কুৎসিত সৌন্দর্য ও অপার্থিব এক নিষ্ঠুর হিংস্রতা বিরাজ করছে। তাদের হিংস্র ঠোঁটের আড়ালে আদিম কামনা-বাসনার নির্মম উল্লাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু জোনস সমস্ত পর্যবেক্ষণ করেও তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করলো, রজারাসের স্বাপ্নিক প্রতিমূর্তির সৃষ্টি এখানেই শেষ হয়নি। যাদুঘরে সাধারণ প্রদর্শনী মঞ্চটা ছাড়াও আরেকটা গোপন কথা আছে। যেখানে রজারস অতি যত্নে লুকিয়ে রেখেছে পৌরাণিক গুপ্ত উপকথার বিভীষিকাময় চেহারাগুলোকে। অস্পষ্ট এক অন্ধকার জগতের তারা বাসিন্দা। রজারস প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা ও অমানুষিক পরিশ্রম ব্যয় করে নিষিদ্ধ পুঁথিগুলো ঘেঁটে দেখছে। সভ্য মানুষদের কাছে যে সব অমঙ্গলদায়ক, সেইসব পৌরাণিক উপকথার অন্ধকারময় চরিত্র-গুলোকে রজারস রূপ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে।

তার একান্ত গোপনীয় কক্ষে স্থান পেয়েছে প্রায় কদাকার চেহারার টাসা থোগুওয়া, অসংখ্য শুঁড়ওলা সিথুলহু, দীর্ঘ তুণ্ড চাগনার ফাগ্‌ন এবং অসংখ্য দানবাকৃতি কিংবা দানব পিশাচনারীর অপার্থিব ঈশ্বর বিরোধী শারিরীক আকৃতিগুলো। তবে এই ঘরে তারাই ঢোকার অনুমতি পেতো, যারা বিশেষ আগ্রহী ছিল এসব বিষয়ে।

স্টিফেন জোনসের মনেও সেই আশা। সে শুনেছে এইসব নিষিদ্ধ ভয়ঙ্কর পুঁথিগুলোর মধ্যে ভন জানজট-এর লেখা 'নেকরোনোমিকন' অথবা আনঅসপ্রিচলিচেন কাল্টেন নামের পুঁথি দুখানাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পুঁথি দুটোর ব্যবহার সভ্য মানুষরা একেবারেই মানে না। রজারস এই বইগুলোর

বর্ণনা পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এছাড়া একজন শিল্পী অ্যালটন স্মিথের কিছু বিশেষ ধরণের সাহায্য নিয়ে তৈরী করেছে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তিগুলো। অবশ্য কল্পনাকে কেন্দ্র করেই পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মূর্তিগুলোর বাস্তব রূপ দেবার মৌলিক বাহাদুরি একমাত্র রজারসেরই। এমন দুঃসাহস কারো নেই যে এই মূর্তিগুলোকে দুষ্প্রাপ্য কিউরিও হিসেবে মূল্যায়িত করবে। বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর বিশালদেহী মূর্তিগুলো দেখে দর্শকরা যে কেবল ঘৃণায় শিউরে উঠবে তা নয়, আতঙ্কে মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ারও উপক্রম। কেননা বেসমেন্টের জীর্ণ ছাদ থেকে নিষ্প্রভ আলোর যে বিবর্ণ অথচ বর্ণালির রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল মূর্তিগুলোর চেহারায়, সে আলোর খেলা এক ভৌতিক অপচ্ছায়ার মতনই সেই গোপন কক্ষের আবহাওয়াকে এক পৈশাচিক চতুরতায় রহস্যময় করে রেখেছিল।

হাসিখুশী স্বাস্থ্যময় প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর চেহারার যুবক স্টিফেন জোনস। অনুভূতিময় অস্পষ্ট জগতের ছবির একজন সমঝদার, অবসর সময়ে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ধরণের ছবির চর্চা করে সময় কাটায়। হঠাৎ একদিন জোনস রজারসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। রজারস ত্রুটিহীন অভ্যর্থনা জানালো জোনসকে সে তার পেছনে পেছনে এসে পা রাখলো পাতালপুরীর যাদুঘরে। বেসমেন্টের একটা বড় হলঘরের তিনটি বড় ঘর বাদে বাকী দুটির একটি রজারসের অফিস ঘর অন্যটি কারখানা ঘর।

জোনস ধারালো চোখে লক্ষ্য করছিল ঘরের সবকিছু। মিউজিয়ামের প্রদর্শনী ঘর দুটো বেশ পুরোনো জীর্ণ, কিন্তু আকারে বেশ বড়। টিউডর যুগের মতই আলঙ্কারিক স্থাপত্যে গৌরবান্বিত সিলিং-এর খিলান। ফলে প্রদর্শনী ঘর দুটো এবং তার পেছনের ঘরটা প্রায় ভল্টের আকার ধারণ করেছিল।

প্রদর্শনী ঘরের এ্যালকোভে অর্থাৎ যেখানে বসে সব কিছু দেখা যায়, সেখানে বসে জোনস রজারসের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল। মাথার ওপরে জ্বলছিল অস্পষ্ট পাংশুবর্ণের একটি মাত্র আলো। সেই আলোর নিষ্প্রভ রশ্মি বেসমেন্টের ধূলো গাদা জীর্ণ সোরাগন্ধী দেয়ালগুলোর গায়ে ছড়িয়ে পড়ছিল, ছোট ছোট রঙীন কাচের জানলাগুলোর গায়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সৃষ্টি করেছিল অর্ধবৃত্ত। বাইরের দিকের মাটির স্তরের উপরের উপল খণ্ড ছড়ানো একটা বড় উঠোন; ঐ জানালাগুলোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে মিশে গেছে। ছোট ছোট জানালাগুলো ধুলোয় ভরা। বাইরের এতটুকু আলোও এসে পড়েনি পাতাল কক্ষে। রঙীন

কাচগুলোর কয়েকটা ধুলোয় আবছা হয়ে গেছে। প্রখর দিনের আলোর অস্তিত্বটুকু জানিয়ে দেয় কেবল।

বেসমেণ্টের বাইরে উপলখণ্ড ছড়ানো উঠোনের এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে অনধিকারী ঝোপঝাড়, অযত্নে বেড়ে উঠেছে আগাছার দল। উঠোনের ওপাশে, একটু দূরে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ধূসর জীর্ণ বাড়ীগুলো। ঐ বাড়ীগুলো বাস করার পক্ষে একেবারে অনুপোযোগী। কয়েক বছর ধরে কারখানার রূপ নিয়েছে মাত্র দিনের বেলার জন্যে। তাই সকাল দশটার আগে এবং বিকেলের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারি সারি গেবল-অলা পুরানো বাড়ীগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।

জোনস খুব আগ্রহভরে সব লক্ষ্য করছিল। অসীম কৌতূহল রজারসের এই যাদুঘরটিতে। রজারসের কীর্তি দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত। এ্যালকোভের মেঝের দিকে একবার সে তাকাল। ওদিকে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরীর ঘর। পুতুল মেরামত এমন কি ভেঙে নতুন করেও গড়া হয়। দেয়ালে অসংখ্য তাক এবং কতকগুলো বেঞ্চ রয়েছে। তাকের ওপর আগোছালোভাবে পড়ে আছে মূর্তির চুল, দাঁতের পাটি, অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা জ্বলজ্বলে জোড়া চোখ। বেঞ্চগুলোর ওপর পড়ে আছে অসম্পূর্ণ মূর্তির হাত-পা।

দেয়ালে গাঁথা কয়েকটা আংটায় ঝুলছে মূর্তিদের বিভিন্ন রঙের পোশাক। শেলফের তাকে পড়ে আছে মূর্তি রঙ করবার রঙ ও তুলি। মোম গলানোর জন্যে একটা বিরাট উনুন ঘরের মাঝখানে বসানো।

ঠিক তারই ওপরে সোজা শূন্যে একটা লোহার পাত্রে মোমটা তাপে গলে গিয়ে একটা ফাঁপা নল দিয়ে বেরিয়ে এসে ছাঁচে জমে গিয়ে পরিকল্পিত মূর্তি কিংবা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হচ্ছে। তারপর রজারস শুরু করে তার সূক্ষ্ম কাজকর্ম। অর্থাৎ প্রতিমূর্তিগুলোকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার চলে দিনাতিপাত পরিশ্রম।

এই পরিশ্রমের সূক্ষ্ম দিকগুলো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জোনস লক্ষ্য করছিল।

॥ দুই ॥

জোনস একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেই অস্পষ্ট অন্ধকার ঘরটার দিকে। কাঠের তৈরী দুটো ভারী পাল্লা, বিরাট বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। এই বিষণ্ণ পাতালপুরীর মধ্যে ওটা যেন কোন এক রহস্যের গুপ্ত যাদুঘর।

জোনস প্রথম যেদিন এখানে এসেছিল, সেই এপ্রিল মাসে, সেদিন থেকে ঐ ঘরটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারপরেও আর দু-তিন বার এসেছে। প্রতিবারই সে এ্যালকোভ আর কারখানা ঘরের মাঝের সরু করিডোরে এসে দাঁড়িয়েছে, অবাক চোখে লক্ষ্য করেছে ঐ অস্পষ্ট অন্ধকার ঘরটা। সর্বদা ঐ ভারী পাল্লায় ঝুলছে বিরাটাকারের তালাটা।

জোনস স্পষ্ট অনুভব করেছিল সেই ঘরের সামনের দিকের অস্বচ্ছ জায়গাটায়, যেখানে কতকগুলো মূর্তি অপছায়ার মত দাঁড়িয়ে, তারা যেন তাকে হাত ইশারা করে কাছে ডাকছে। এ্যালকোভ পেরিয়ে প্রধান প্রদর্শনী মঞ্চগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে জোনস একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্যাসেজের ওপাশে দারুণ অস্পষ্ট আলো, পুরোনো ঢঙে নক্সা করা দুটি প্যানেলের বিরাট দরজাটা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। যেন ওটা ভ্যালহাল্লার ঘরের দরজা। যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের প্রেতাত্মা ঐ ভ্যালহাল্লায় এসে হাজির হয়, ভোজনের টেবিলের ধারপাশ ঘিরে সবাই বসে, আনন্দ করে গল্প গুজব করে। কেবল ঐ সময় ছাড়া অমন মৃদু সোরগোল কক্ষে কখনও শোনা যায় না।

নরোয়ের এই পুরোন পরিচিত ভৌতিক উপকথার কথা জোনস ভালমতই জানতো। তাই সে যখনই যাদুঘরের প্যাসেজের ওপরের ঐ দরজাটার দিকে তাকাতো তখনই তার মনে পড়ে যেতো ভ্যালহাল্লার কথা।

প্যাসেজ ধরে জোনস কিছুটা এগিয়ে গেল দুর্বল পদশব্দ সৃষ্টি করে, যেন কুহেলির শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে এক ক্ষীণ পদধ্বনি। নজর পড়লো অদ্ভুত ধরণের প্রতীক চিহ্নটির দিকে, ভারী প্রকাণ্ড দরজার একেবারে মাথায়। এর আগে সে এটা কখনও লক্ষ্য করেনি। এই প্রথম আধো অন্ধকারে দরজার গায়ের চিহ্নটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। নিজের অজান্তে চমকে উঠলো। কাঁপুনি দিয়ে তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, 'নেকরোনোমিকস' নামের সেই প্রাচীন ধূসর পুঁথিটার কথা। ঠিক এমনই একটা চিহ্ন সে দেখেছিল। ঠিক পরমুহূর্তেই তার মনে হল, রজারস লোকটা এমন এক ঘোর সন্দেহময় অন্ধকার জগতের গভীর জ্ঞানী মানুষ, যে বিষয়ে আর কোন চিন্তার অবকাশ থাকা উচিত নয়।

রজারসের সঙ্গে আলাপ করার পর জোনস অনুভব করলো, সত্যি সে যা অনুমান করেছে ঠিক। লম্বা-চওড়া চেহারা, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মাথার চুল অবিন্যস্ত, হাড্ডিসার টিকালো নাক, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখ ভরা। রজারসের শারীরিক দ্যোতনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রাজ্ঞতার পরিচয়গুলো ফুলে ওঠে তখনই, যখন তার চোখ দুটো কারণে-অকারণে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে।

রজারসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জোনস বুঝতে পেরেছে, লোকটি তার অযাচিত আগমনে একটুও বিরক্ত হয়নি। বরং রজারস এই ভেবে স্বস্তি পেল যে অন্ততঃ এমন একজন কুলীন সমঝদারকে পেয়েছে যে অন্ততঃ তার সঙ্গে কিছু কথা বলে তার মনের ভারকে হালকা করতে পারবে।

তার গলার স্বর ক্রমশঃই রুক্ষ, প্রায় দুর্বল চীৎকারের মতনই, অনেকটা যেন কর্কশ ছিন্ন প্রতিধ্বনির সুর তাতে শোনা যেতে লাগলো এ্যালকোভের বসবার জায়গা থেকে। কথা বলার সময়ে উত্তেজনায় তার ঘন ঘন ওষ্ঠবিক্ষেপ, ভ্রূকুটির কুটিল বক্রতা, ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠা চোখ দুটোর কৌণিক দৃষ্টি সঞ্চালন এবং চীৎকারের ক্রমবিলীয়মান ধূসর প্রতিধ্বনি, জোনসকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাবার অবকাশ দিল, কেন এই লোকটাকে উন্মাদ বলে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল।

প্রায় সাত আট দিন পরে আবার একদিন রজারসের যাদুঘরে এসে হাজির হল জোনস। যেন মনে হল, রজারস এবার আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে সহজ মনে অনেক কিছু বলতে চাইছে। এতদিন তার মনের মধ্যে যে সব কামনা-বাসনা, দুর্বার অবদমিত আকাঙ্খাগুলো সুপ্ত ছিল, সেগুলোকে সে মুক্তি দিতে চায়। রজারস তাই তার গোপণীয়তার ভাণ্ডার খুলে দেবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

হঠাৎ রজারসের এমন আচরণে জোনস থতমত খেয়ে গেল।

প্রথমেই সেই ধূসর বিকেলের নিষ্প্রভ আলোয় সূর্যাস্ত রেখা যখন নদীর ওপারের ছায়াময় বাড়িগুলোর পেছনে লুপ্ত হতে চলেছে, বেসমেন্টের শতাব্দী লাঞ্ছিত ধুলোভরা রঙীন কাঁচের জানলাগুলোয় যখন জেগে উঠেছে একটা

নিষ্প্রাণ হতাশার কালো রঙ, ঠিক সেই সময়টাতেই রজারসের কাছ থেকে একটা সঙ্কেত পাওয়া গেল। সে সত্যিই গূঢ় গোপন কিছু কথা শোনাবে জোনসকে। জোনস তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সচেতন করবার চেষ্টায় বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল যাদুঘরের এই বাঁকাচোরা ঝুঁকে পড়া লম্বাটে লোকটার দিকে।

প্রথমেই, রজারস তার সম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণা আর বিশ্বাসের ব্যাপারটার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিল, সেই সঙ্গে ছিল তার অধ্যাবসয়ের কথা, টুকরো টুকরো অনুচ্চারিত অথচ বোধগম্য ইঙ্গিতবহ শব্দ সেগুলো। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ নীরব রইল। তার ভ্রূযুগল যেন নুয়ে পড়লো, টিকালো নাকের ফুটো ফুলে ফুলে উঠলো, সেই সঙ্গে ঘন ঘন ওষ্ঠযুগল।

তারপরেই সে তার আসল কথাটা বলার জন্য তৈরী হল। কয়েকটা দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করলো, খুবই অস্পষ্ট। সে বলল, এমন কিছু কাহিনী সে শোনাবে তা মৌলিক তো বটেই, তার ওপর রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার কথা। যথেষ্ট প্রমাণও আছে তার হাতে। পরক্ষণেই একটা বড় খাম খুলে কয়েকটা হলদে আভাযুক্ত ফটো বের করলো। টেবিলের ওপর মেলে ধরলো এমনভাবে যে ফটোগুলো খুবই প্রামাণিক এবং অত্যন্ত মূল্যবান দলিলের মতনই মনে করতে হবে।

জোনস সত্যিই একটু স্তম্ভিত হল, ছবিগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লো। ফটোগুলো যে অনেককালের তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সব কিছু ভালই নজরে পড়ছে। ভেতরের দৃশ্য প্রায় বিস্তীর্ণ। দুর্বোধ্য রহস্যের এক অপচারী রোমাঞ্চে কিলবিল আকীর্ণ। কিন্তু, তবুও জোনসের চোখ দুটি স্থির হয়ে রইল। সে যেন নীচের একটা অন্ধকার খাদের কোন অস্বচ্ছ অথচ ইন্দ্রিয় বোধগম্য কিছু দেখতে পাচ্ছে।

এক বোতল হুইস্কী জোনস সঙ্গে এনেছিল।

জুন মাস। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে রাতের অন্ধকার নেমেছে। বেসমেণ্টের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছিল রাতের উত্তপ্ততা। সোরা গন্ধী আবাহাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল মোমের উগ্র গন্ধ। সেই সঙ্গে প্যাসেজের ওদিকের নেই ঝাপসা অন্ধকার তালা লাগানো বন্ধ ঘরটার দিক থেকে ভেসে আসছিল স্যাঁতস্যেঁতে একটা সোদা গন্ধ—যেখানে সে দুটো প্যানেলের ভারী পাল্লার দরজাটার গায়ে 'নেকরোনোমিকস'-এর এক ধূসর প্রতীক চিহ্ন দেখেছিল, চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

রজারস একটানা কথা বলে। যাচ্ছিল। হুইস্কী পান করতে জোনস তাকে অনুরোধ করেছিল। তাই তার আগ্রহ ও সৌজন্য সুস্থ অনুরোধ রক্ষার্থে বোতলের প্রায় তিনভাগই পান করে ফেলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হুইস্কীর ক্রিয়া শুরু হল। প্রায় চীৎকার করে, বোধ হয় এই প্রথম রজারস তার গুপ্ত গূঢ় রহস্যের গোপন দরজা খুলে দিতে চাইছে। জোনস নীরব, শুনতে লাগলো একভাবে। অবিশ্বাসের রেখা তার চোখে মুখে স্পষ্ট, চোখের তারা দুটো ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে। রজারসের সেই বিকৃত, ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দগুলো তাকে ক্রমে ক্রমে অবাক করে দিচ্ছিল। আদৃষ্ট সীমা এক বিস্তৃত জগতের অবিশ্বাস্য কাহিনী উঁকি মারছিল তার ঐ কথার আড়াল থেকে।

রজারস বলছিল, সে পৃথিবীর এমন সব জায়গায় গিয়েছিল এবং এমন কিছু পাওয়ার জন্য সেইসব জায়গা ভ্রমণ করেছিল। অবশ্য এই যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার আগে আর মাদাম তুসাদের কাজ করবার আগে। জোনস সত্যিকারের বুঝবে, তাই সে তার রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের গুপ্ত ব্যাপারগুলো জানাতে এতটুকু কৃপণতা করছে না। তিব্বত আফ্রিকার সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চলগুলোয়, আরবের মরুভূমির লুপ্ত ধ্বংসস্তূপগুলোর কাছে, আমাজনের গভীর উপত্যকা এবং শেষের দিকে তুষারস্তীর্ণ আলাস্কায়, তারপর প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ছোট ছোট দ্বীপগুলোর অভিযানে গিয়েছিল সে। সঙ্গে ছিল তার একান্ত সহচর এক বিদেশী কর্মচারী, ওরাবোনা।

রজারস খুব জোরাল কণ্ঠে বললো, এইসব অঞ্চলে ভ্রমণ করে সে এমন সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সন্ধান পেয়েছে, যার মধ্যে লেখা রয়েছে, প্রায় অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর সব কথা, উপকথার বর্ণনার মত। প্রাগৈতিহাসিক পোয়াহটিক যুগের পুঁথিগুলো পড়েই জানা গেছে কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দানবের চেহারা নিয়ে একদিন পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর স্বীকার করতে বাধা নেই, যে সব হলদে রঙের ছবি টেবিলের ওপর রয়েছে, তার মধ্যে পোয়াহটিক যুগের ছবিও কিছু রয়েছে। রজারস বললো, সে ইচ্ছে করলে, ফটোগুলো খুঁতিয়ে দেখতে পারে।

ফটোগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন একটা ফটো জোনসের নজরে পড়ে গেল যে তার সর্বাঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক খেলে গেল স্থির হয়ে গেল তার দেহ। অন্ধকারে খাদের দিকে ঝুঁকে থাকা তার শরীরটা যেন এক আতীব্র চীৎকারে হঠাৎ পড়ে গেছে নীচের এক অজানা গহ্বরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে রজারস বললো—এই ফটোগুলোর

কোথাও এতটুকু মিথ্যে নেই, সব সত্যি। সন্দেহের অবকাশ নেই বিন্দুমাত্র।

রজারসের কণ্ঠস্বর এবার বেশ গম্ভীর মনে হলো। সে যেন অহঙ্কার করে বলছে, দম্ভের সুরে বেশ জোর দিয়েই তার বক্তব্যের সমর্থনে সে বক্তৃতা দিয়ে বলল। এইসব অঞ্চলে সে অবিশ্বাস্য ও দুর্বোধ সব জিনিস আবিষ্কার করেছে, দেখেছে। সে হলফ করে বলতে পারে, এর আগে কারো নজরে সে সব পড়েনি, তেমন কোন প্রমাণও নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এইসব জিনিস একান্ত স্পষ্ট। সে তার এই লণ্ডনের মিউজিয়ামে কিছু কিছু এসে সংরক্ষিত করে রেখেছে। লোকের তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সেই সুদূর উত্তর তুষার দেশ আলাস্কা কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা তিব্বত থেকে নিয়ে এসেছে।

হুইস্কীর নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। তারই জের চলছে তখনও। সে অনর্গল বকবক করে চলেছে। জোনস স্থির হয়ে শুনছিল। অবশ্য এইসব কথা শুনে সে যে কৌতূহলের চেয়ে মজা পাচ্ছে বেশী, সেটা তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল স্পষ্ট। রজারসের চতুর চোখে কিন্তু সবই ধরা পড়লো। তবু সে তার বিচিত্র আবিষ্কারের স্বপক্ষে এক রকম সোচ্চার হয়ে বক্তৃতা দিয়ে চললো। রজারস দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, আদিম পৃথিবীর অজ্ঞাত ও অখ্যাত পুঁথি পড়ে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য লাভ করেছে একমাত্র সে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ। পোয়াহটিক প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ঐ সব পুঁথি রচিত হয়েছিল, এটা তার স্পষ্ট ধারণা।

জোনস প্রায় বোকার মত শুনছিল।

রজারস বলে চলেছে, এইসব পুঁথি পাঠ করে সে যে কেবল জ্ঞান অর্জন করেছে। তাই নয়, ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে এমন সব গুপ্ত অথচ বিস্ময়কর জিনিসের সন্ধান পেয়েছে, যারা ঐ অজ্ঞাত গোপন অন্ধকারে সুপ্ত ছিল অনাদিকাল ধরে। আবার তাঁদের আকৃতি আচরণে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার প্রস্ফুটিত হয়েছিল, যার ফলে মনে হয়েছে সেই বিস্ময়কর 'জিনিসগুলোর' মধ্যে কিছু কিছু গ্রহলোকের বাইরে থেকে এসেছে। সম্ভবতঃ অন্য কোন দূরের গ্রহলোক থেকে সেসব 'জিনিস' এসেছিল আদিম পৃথিবীতে অভিযানে। আদিম পৃথিবীর সেই অস্পষ্ট 'জিনিসগুলোর সঙ্গে এমন কোন গ্রহের যোগাযোগ ছিল, যার কোন হদিশই পায়নি পরবর্তী যুগের পৃথিবীর অধিবাসীরা। কথা

বলতে বলতে রজারসের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। সম্ভবত, তার নেশার প্রতিক্রিয়া কমতে শুরু করেছে।

জোনস একটু হাসলো, অবিশ্বাসের শুকনো হাসি। রজারসের পাগলামীর ইতিহাস তার স্মরণে ছিল, তবুও মনে মনে বেশ কিছুটা চমৎকৃত হয়েছে, তাকে সেটা স্বীকার করতেই হল। এছাড়া আরেকটা জিনিস খুবই স্পষ্ট, মাদাম তুষাদ তাকে যেকোন কারণেই হোক কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তবু একথা মানতে হবে, রজারস তার নিজস্ব ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়েই এই মিউজিয়ামটি গড়ে তুলেছে। আর তার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, রজারসের সৃষ্ট মূর্তি-গুলোর মধ্যে কোন কোনটার ভেতরে সেই ঐন্দ্রজালিক বর্ণনার অস্পষ্ট দিকটার কিছু কিছু ছাপও রয়েছে। এইসব বিচার করে রজারসকে জিনিয়াস বলা চলে।

এ্যালকোভের ওদিকে যে প্রশস্ত প্রদর্শনী হল, তাতে বয়স্কদের জন্যে মার্কা মরুগুলোর যে সব প্রতিমূর্তি রয়েছে তার মধ্যে ঐ সুদৃঢ় অন্ধকার আদিমতার বিকৃত অপার্থিব ধ্যান-ধারণার সহজাত প্রবনতাই ফুটে উঠেছে খুব কুশ্রী ভয়ঙ্কর হয়ে। এছাড়াও আর একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট, ঐ অপচ্ছায়া চেহারার প্রতিমূর্তিগুলো খুব কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখলে, যার ইন্দ্রিয় খুবই সতর্ক এবং সজাগ, সে একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে রজার্স যা বলে আসছে তার কিছুটা হয়তো সত্যি হতে পারে।

জোনসের হঠাৎ মনে পড়লো, রজারস বলেছিল, ঐ দানবিক প্রতিমূর্তিগুলোর ভেতরে এমন কয়েকটা আছে যারা সত্যিই জীবন্ত।

কথাটা দুম্ করে মনে পড়তেই জোনস হেসে উঠেছিল। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল নাস্তিক কিংবা অবিশ্বাসীর বিদ্রূপে ভরা বাঁকা তিক্ত হাসি। সম্ভবতঃ সেখানেই সমস্ত রকম সৌজন্য ও শিষ্টাচারের পরিসমাপ্তি। রজারস গম্ভীর হয়েছিল, কিন্তু তার টিকালো নাক বেঁকে গিয়েছিল, চোখ দুটো থেকে ক্রোধের আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ফ্যাকাসে গম্ভীর মুখাবয়ব। ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। এমনই তার ভাব-ভঙ্গি, জোনসের মত অবুঝ, বোকা লোকের কাছে ওগুলো দেখিয়ে সব বলে মস্ত ভুল করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে অনুভব করলো, তার ধারণা ভুল। জোনসের মন থেকে যে ভাবেই হোক ঐ অবিশ্বাসটাকে তাড়াতে হবে। যেমন করেই হোক, ঐ লোকটাকে বিশ্বাস করাতে হবেই যে, পূর্বোক্ত কাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মদানের কতগুলো

নিষ্ঠুর নিয়ম পদ্ধতি ছিল, যার ফলে সেইসব জাগ্রত দেবতারা খুশী হত। সেই সব আদিম দেবতারা, যাদের রজারস খুঁজে পেয়েছে সেই অন্ধকার আদিমতার অজ্ঞাত অঞ্চলে গিয়ে তারা আত্মবলির রক্তে স্নান করতো, রক্ত পান করে তৃপ্ত হতো তার অন্তর। একটু আগে যে জাগ্রত প্রতিমূর্তিগুলোর কথা বলেছিল সে, তারাও ছিল পোয়াহটিক যুগের দেব দেবী, আত্মদানের রক্তে তাদেরও পূজো করা হত সেই যুগে।

সাধারণ দর্শকরা যে ঘরে ঢুকতে পারে না, সেই ঘরে রজারস জোনসকে নিয়ে যাবে, তাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে যাদুঘরের সেই ঘরটিতে নিয়ে যাবে।

যেন মন্ত্রে বশীভূত করা হয়েছে জোনসকে। রজারসের পেছন পেছন সে চললো বিভীষিকাময় ছায়া ছায়া ঘন ঘরটির দিকে। মূর্তিগুলোর দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ফটোগুলোর সঙ্গে এই মূর্তিগুলোর কিছু কিছু মিল আছে।

জোনস ধীরে ধীরে তাকালো রজারসের দিকে, তার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বিস্ময়। কিন্তু রজারস দুর্দান্ত চালাক লোক। জোনস যে সরলতার অভিনয় করে আবার এক রসজ্ঞ সমজদার হবার চেষ্টায় তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে এটা অনুমান করতে পেরে রজারস সেখান থেকে কেটে পড়লো।

জোনস লক্ষ্য করলো, রজারস অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজের বাঁ দিকের অফিস ঘরে ঢুকলো। তারপরেই জোনসের কানে ভেসে এলো দরজা বন্ধ করার বিরাট আওয়াজ।

একটুখন সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জোনস এসে দাঁড়ালো রাস্তায়। রাতের হিমেল কুয়াশা তখন সুবিস্তীর্ণ একটা নোংরা কালো চাদর যেন বিছিয়ে দিয়েছে সাউথওয়ার্ক স্ট্রীটের ধুলোমলিন পথের ওপরে।

॥ তিন ॥

সেপ্টেম্বর মাস। বিকেলটা ছিল ক্লান্ত রুগ্ন হলদে। জোনস সাউথওয়ার্ক স্ট্রীটের সেই জীর্ণ বাড়ীটার বেসমেণ্টের যাদুঘরে আবার এসে ঢুকল।

কম করে একমাসের মত এখানে সে আসেনি। কিন্তু সেইদিনই, বিকেলের নিস্তেজ তন্ময়তাটা কেটে যাবার পরই এমন একটা ঘটনা ঘটল, বুদ্ধি দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করবার মতন অবস্থা তখন জোনসের ছিল না।

জোনস ছায়াময় করিডোর দিয়ে হাঁটছিল আর বার বারই দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল প্রদর্শনী মঞ্চের বিকট চেহারার প্রতিমূর্তিগুলোর দিকে।

এসব প্রতিমূর্তিগুলো বহুবার সে দেখেছে কিন্তু কেন জানি না সেদিনকে তার গা-টা কেমন ছমছম্ করছিল। নিজের পদশব্দের যে মৃদু প্রতিধ্বনি হচ্ছিল সেটা তাকে বড়ই অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল, মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল একটা ভয়ার্ত ভাব।

তখনও সূর্যের আলো সম্পূর্ণ বিদায় নেয়নি। বিকেলের ম্লান আলো নদীর জলে লম্বমান ছায়া ফেলছিল কিন্তু সেই পুরোণ বাড়ীটার মাটির তলার সেই যাদু ঘরের প্রত্যেকটি কক্ষ এবং প্যাসেজেই রয়েছে কেমন একটা ছায়া ছায়া অন্ধকার।

এই বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করে জোনসের যখন মনে পড়ল এই বাড়ীটা বহুযুগ আগে কোন এক ধূসর শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল, যখন এটা ছিল একটা প্রকাণ্ড দুর্গ, টিউডর নাইটেরা সামনের ওই পাথর ছড়ানো পথটা দিয়েই ঘোড়ায় চড়ে ধূলো উড়িয়ে ছুটে যেত অন্য কোথায়ও তখন তার চোখে ফুটে উঠল দুঃসহ বিশ্বাসের এক অগভীর বিস্ময়

ধীরে ধীরে এই প্রকাণ্ড দুর্গের গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে, কাল নিরবধি এগিয়ে চলেছে, পাথর ছড়ানো পথটা হয়ে গেছে ওয়াটারফ্রন্ট পথ, নাটইটের পরিবর্তে চলেছে হোসিয়ারী শ্রমিকেরা নয়ত ভবঘুরে ভিখারীর দল, অথবা ক্লিন্ন অবসাদগ্রস্ত নাবিকেরা, আর মালগুদোমের কোরানাবাবুরা। লরী ড্রাইভারদের মুখে সর্বদাই লেগে রয়েছে রাজ্যের নোংরা গালাগাল।

গম্বুজ ভেঙে ফেলা দুর্গটাকে বসোবাস করার মত বাড়ীতে পরিণত করা হয়েছে, তাতে বসবাস করছে ভাড়াটেরা, তারা আসছে আবার চলে যাচ্ছে।

পথের ধারের পুরোণ দণ্ডায়মান বড়বড় বাড়ীগুলো নির্জনে প্রেতাত্মার মতন নিশ্বাস ফেলছে, সকালে আর সন্ধের পর নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে যায় ওগুলো আর সেই সঙ্গে বাড়ীটাও।

জোনস ধীরে ধীরে করিডোর ধরে এগোচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পেল একটা বিকট চীৎকারের শব্দ। শব্দটা এসেছে রজারসের কারখানা ঘর থেকেই।

অনেকের কানেই সেই শব্দটা প্রবেশ করল। জোনসের ঠিক পিছনেই আরও তুজন দর্শক যাতুঘরে ঢুকেছিল। প্রতিধ্বনিটা তীব্র হয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে বেসমেণ্টের বাতাসে ভেসে বেড়াল, মুহূর্তের জন্য ওরা তিনজন এ ওর মুখের দিকে তাকাল, তারপর ওদের দৃষ্টি গেল ওরাবোনার দিকে।

ওরাবোনার মুখে তখন ক্ষীণ বিষণ্ণ একটু হাসি, সে দর্শক তিনজনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল তারপর কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করল।

এই ওরাবোনা হচ্ছে রজারসের সহকর্মী। তার চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিদেশী ছাপ, মুখটা গোলধরণের, শরীরের রঙ অন্ধকারময় তামাটে, মাথায় কুচকুচে কালো চুল, বয়সে পৌঢ়ত্ব এসেছে কিন্তু দেহের প্রতিটি খাঁজে শক্তির কঠোরতার স্থূল প্রকাশ।

ওরাবোনা কেবলমাত্র রজারসের সহকর্মীই নয়, প্রতিমূর্তি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজেই তার সূক্ষ্ম বিচারবোধ এবং দক্ষতা রজারসের প্রধান সহায়, এই দিক দিয়ে বিচার করলে ওরাবোনা একজন ভাল নক্সাকারক এবং মেরামত কারিগরও বটে।

ওরাবোনা আবার ওদের দিকে তাকাল। ওর মুখে আবার ফুটে উঠল ম্লান বিষণ্ণ হাসি। সে প্রায় জীর্ণ বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, এইমাত্র যে তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল সেটা একটা কুকুরের কণ্ঠস্বর। দর্শকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এতে ভয় না পান। ওরাবোনা বেশ নিশ্চিন্ত মনে অন্যদিকে চলে গেল।

কিন্তু জোনসের মনে তখন জেগে উঠেছে অন্য এক চিন্তা। ওরাবোনার ওই ধূর্ত হাসি দেখে তার মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে, হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে।

এইমাত্র যে শব্দটা তার কানে প্রবেশ করেছে সেটা এমনই এক বীভৎস শব্দ যা কেবল নিষ্ঠুর যন্ত্রণা আর অমানুষিক ভীতি থেকেই সৃষ্ট হতে পারে আর এমন একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে ওই চীৎকারটা ভেসে এসেছে, যেখানকার

সমস্ত কিছুই অসুস্থ এবং অমঙ্গলের ছায়াতে ঢাকা, সুতরাং চীৎকারের ধ্বনিটা জোনসের কাছে যে বিভীষিকার এক আর্তনাদ বলে মনে হবে সেটাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ জোনসের মনে পড়ে এই যাদুঘরে তো কুকুরের প্রবেশ নিষেধ, কোন কুকুরই তো এখানে ঢুকতে পারে না।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সে ঘুরে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল কারখানা ঘরের দিকে, সেখানে রজারসের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

কিন্তু জোনস কয়েক পা এগোতেই বাধাপ্রাপ্ত হল, সেই তামাটে চামড়ার অন্ধকার চেহারার বেঁটে লোকটা এসে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

তারপর তার হাত দিয়ে বিচিত্র একটা ভঙ্গী করে বলল, মিঃ রজারস খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। তিনি অত্যন্ত কড়াভাবে হুকুম করে গিয়েছেন যে তাঁর অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে কেউ যেন কারখানা ঘরে না ঢোকে। একটু আগে বাতাসে যে আর্ত চীৎকারটা জেগেছিল, ওটা বেসমেন্টের পেছনের দিকে যে নুড়িতে ভরা জংলা উঠোনটা আছে, সেদিক থেকেই এসেছে।

কতকগুলি বেওয়ারিশ কুকুর ঐ উঠোনের ওইদিককার পড়ো বাড়ীগুলোর সামনে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ওগুলো প্রায় সারাদিনই ঝগড়া-ঝাটি করে থাকে। কুকুরগুলো যখন কামড়া-কামড়ি করে হিংস্র যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় তখন বাতাসে জেগে ওঠে বীভৎস শব্দ আর সেই শব্দই একটু আগে এখানে ভেসে এসেছিল। এই মিউজিয়মের কোন ঘরেই কুকুরের সামান্য অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না, তবে মিঃ জোনস যদি মিঃ রজারসের সঙ্গে দেখা করতে চান তবে সন্ধ্যার পরে অবশ্যই যেন এখানে আসেন।

জোনস কোনরকম বাক্যব্যয় না করে পুরোন সোদাগন্ধী সিঁড়িগুলো পেরিয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখনও প্রকৃতির কোলে জেগে রয়েছে বিদায়ী সূর্যের মৃদু আলো, নদী-পাড়ের নির্জন অট্টালিকাগুলোর দৈত্যাকায় ছায়া পড়েছে নদীর জলে আর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা পায়রার মতন, নদীর আকাশ থেকে আসছে স্মরণী হাওয়ার ঝাঁক।

জোনস দ্রুত ঘুরে বাড়ীটার পেছন দিকের পথটা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ, লোহালক্কড়ের আঁস্তাকুঁড়ে, প্রায় ডিঙিয়ে এবং কিছুটা হোঁচট খেয়েই জোনস বাড়ীটার পেছনের উঠোনে এসে পৌছাল।

সে এখন বেশ কৌতূহলী, সে জানতে চায় সত্যিই পেছনের এ দিকটায় সেইসব বিশ্রী চেহারার কুকুরগুলো সত্যিই রয়েছে কিনা।

উঠোনের নোংরা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। কয়েক সারি প্রাচীন চেহারার অট্টালিকা, ধূসর জীর্ণ, জরাগ্রস্ত ক্লান্ত বৃদ্ধের মতন, যেন বয়সের ভারে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আগে এখানে লোকজন বসবাস করত কিন্তু সেই সব বাসিন্দারা ওপারের নতুন শহরতলীতে পালিয়ে যাওয়ার পর এখন এটা মালগুদোম এবং কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাড়ীগুলোর অসংখ্য চুড়ো-গেবল-এর মতন, চুণবালির ক্ষয়িত নোনা গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে এবং সমস্ত জায়গাটায় ভেসে বেড়াচ্ছে একটা আবছা পূতিবাষ্পময় দুর্গন্ধ।

জোনস এতক্ষণে দেখতে পেল, বেসমেন্টের এই অট্টালিকাটাও একটা গেবল-অলা বাড়ী। ভাঙাচোরা একটা খিলান-এর নীচে সরু একটা পথ উঠোনের জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

পথটা মোটেও সুগম নয়। নুড়ি পাথরে পথটা এবড়ো-খেবড়ো হয়ে রয়েছে আর পথের মাঝে এসে পড়েছে দুপাশের কাঁটাগাছের ডাল।

জোনসের কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে সেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। তার অত্যন্ত আশা এই যে, বেসমেন্টের পেছন দিকের এই নির্জন উঠোনে এসেই সে হয়ত কুকুরের রহস্যটা আবিষ্কার করতে পারবে।

গা কাঁপান ভূতের মতন দণ্ডায়মান জীর্ণ অট্টালিকাগুলো যেন এই নিস্তেজ ছায়াময় দিকটায় তার দিকে তাকিয়ে আছে। অত্যন্ত অনন্য ওই বাড়ীগুলো, জোনস মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে তার অনুসন্ধানী চোখ চারিদিক দেখে নিচ্ছিল। না, কোথাও কোন কুকুরের নাম-গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকটায় কুকুরের কোন চিহ্নই নেই। কোথাও কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। জায়গাটা এতই নিস্তব্ধ আর জনমানব শূন্য যে পথ ভুল করেও কোন কুকুর এদিকটায় আসে না।

জোনস বিস্মিত হল এই ভেবে যে, যদি সত্যিই কোন কুকুর ওই রকমের কাতর আর্তনাদ করে থাকে, তাহলে এত তাড়াতাড়ি কী করে এখানকার পরিবেশ থেকে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাই, ওরাবোনা বলা সত্ত্বেও, এই মিউজিয়মে কোন কুকুরেরই অস্তিত্ব এই

বলে সে যা দৃঢ় গলায় জানিয়েছিল, সেটা সত্যিই কিনা তা জানার জন্যে জোনস কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ধরল বেসমেন্টের কাঁচের জানালাগুলোর দিকে।

তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত জানালা মাটির স্তর ভেদ করে যেন অর্দ্ধেকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে, জানলার মোটা কাঁচে রয়েছে ধূলোর আচ্ছাদন আর তার গা ঘেঁসে ঘাসের জঙ্গল বেড়ে উঠে প্রায় ঢেকে ফেলেছে জানালাগুলো।

জোনস গুঁড়ি মেরে জানালার কাছে চলে এলো তারপর ভেতরের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল।

কিন্তু কাঁচের গায়ে এতই পুরুভাবে ধূলো জমেছিল যে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তখন বাধ্য হয়ে রুমাল দিয়ে ঘসে ঘসে জানালার কাচ পরিষ্কার করল সে।

জানালা তিনটে যে দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে সেদিকে বুনো কাঁটা ঝোপের পাশ ঘেঁষে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে বেসমেন্টের ভেতরে আর একেবারে ঢোকার মুখে দরজায় একটা মরচে ধরা বিরাট তালা ঝুলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে জোনস সেদিকে তাকাল।

নেকরোনোমিকনের প্রতীক চিহ্নের যে ভারী দরজাটা দেখেছিল সে এ্যালকোভের প্যাসেজের ওদিকের অস্পষ্ট অন্ধকার দিকটায়, এটা সেই ঘরেরই বাইরের দিকের দরজা। যদিও; বহু যুগ ধরে এ দরজাটা খোলা হয়নি তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই মরচে ধরা তালা আর কাঁটা ঝোপের বাড়ন্ত চেহারা দেখে।

জোনস সজাগ দৃষ্টি মেলে কাচের গায়ে চোখ রাখল। ভেতরের সবকিছু অস্পষ্ট আলোয় ঢাকা, শুধু দূরে দেখা যাচ্ছে একটা আলোর বিন্দু, সেটা রয়েছে ওই তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যেই।

সে ওই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে স্পষ্ট কোন মানুষের চেহারা দেখতে পেল না, কিন্তু হঠাৎ সে বুঝতে পারল সে একেবারে শেষের দিকের জানলাটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে ভেতরের দৃশ্য দেখার জন্য। আর এইমাত্র সে যে অন্ধকার ঘরটার দিকে তাকাল, সেটা যে ওই নেকরোনোমিকন-এর প্রতীক চিহ্নের ঘর, এ বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু তার মনে খটকা লাগল সে ওই ঘরে আলোর বিন্দুটা দেখল কী করে?

সে বিন্দুটা থতমত খেয়ে দু'চোখ রগড়িয়ে নিল এখানে আলো থাকা যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এর কোন কারণ থাকতে পারে না।

আবার সে ঘরের ভিতরটা দেখার জন্যে কাঁচে চোখ রাখল, আলোক বিন্দুটা এবার যেন দুটো ভাগ হয়ে দুটো ক্ষুদে রক্তবিন্দুর মতন জ্বলে উঠেছে সেই ঘোর অন্ধকার ঘরের ভেতরে।

আশ্চর্য ব্যাপার! সে বেশ ভালোভাবেই জানে প্রতীক চিহ্নের ঘর কখনও খোলা হয়না, ক্ষনিকের জন্যেও নয়, সর্বদাই প্রচণ্ড ভারী একটা তালা ঝুলছে দুটো প্যানেলের ওই প্রকাণ্ড দরজার গায়ে।

ওই প্রতীক চিহ্ন, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চিহ্ন যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, প্রাচীন এক পুঁথির ছেঁড়া অংশে আকীর্ণ ছিল, যে পুঁথি সভ্য মানুষের কাছে নিষিদ্ধ।

আর এই প্রতীক চিহ্নটা হ'ল গুপ্ত এক অন্ধকার যুগের মৌলিক দলিলের মতনই অস্পষ্ট দুর্বোধ্য এক প্রতীক।

সেই প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘরেই মধ্যেই কিনা দেখা যাচ্ছে ওই রক্ত চক্ষুর আলোর দুটো বিন্দু। জোনস আর স্থির থাকতে পারল না, পশুর মতন হিঁচড়ে মাটি আঁকড়ে কাঁচের গায়ে মুখ রাখল সে। তারপর এস সময়ে সে উঠে দাঁড়াল।

যতদূর মনে হয় ওই ঘরের দরজা একটু আগেই কেউ খুলে রেখেছিল এবং সেই জন্যেই সে ঘরের ভেতরে আলো দেখেছে।

আগেই ওই বন্ধ ঘরটা সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল, এখন সেটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। একটু বাদেই উঠোনের পথকে পেছনে রেখে বেসমেণ্টের সামনের দিকের প্রবেশ মুখে এসে দাঁড়াল জোনস। হয়ত ইতিমধ্যে রজারস ফিরে এসেছে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ছটা বাজে।

বেসমেণ্টে প্রবেশ করেই জোনস দেখতে পেল ওরাবোনা তার কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। চোখ দুটো আগের মতই ধুর্ত, আর চোখে ফুটে উঠেছে চোরা কুটিল দৃষ্টি।

এই দৃষ্টি জোনস একদম সহ্য করতে পারে না। আর সে এটাও খেয়াল করল ওরাবোনা কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই তার প্রভুর দিকেও ওই দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে কেন সে রজারসের সঙ্গে দেখা করতে চায় তার কোন যথোপযুক্ত কারণ সে দেখাবার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু তার অবচেতন মনে কুকুরের চীৎকারের সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা এবং তালাবন্ধ ঘরটার আলোর বিন্দু সম্পর্কে যে অদম্য কৌতূহল চাপা পড়েছিল, সেটা যেন ওই কুটিল চোখ দুটো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সাপের ফনার মতন ফোঁস করে উঠল

এবং ওরাবোনা তার পাশ দিয়ে চলে যাবার পর সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিডোর দিয়ে হেঁটে সোজা ওয়ার্করুমের দিকে এগাতে লাগল।

কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। করিডোর ধরে হেঁটে আসার সময়ে, ছায়ান্ধকার পথটার একধারে এ্যালকোভের দিকে মুহূর্তের জন্যে একবার তাকাল জোনস।

আলোর ডুমটা যেন ক্লান্ত এক নিস্তেজ নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে বিকিরণ করছে তার রোগাটে দীপ্তি, তাতে মোমের মূর্তিগুলো আরও বীভৎস রূপ নিয়েছে। যেন সারি সারি নরখাদক প্রেতেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে মঞ্চে। অথবা একটু আগেই যেন তাঁরা আত্মবলির শোনিত স্রোত গলাধঃকরণ করে এখন কুহকের দেশের কোন ডাকিনী-সঙ্গীত শোনার আশায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জোনসের গা শিরশির করে উঠল, সে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। তারপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল প্যাসেজের শেষপ্রান্তের নেকরোনোমিকন প্রতীক চিহ্নের দরজাটার দিকে।

প্রকাণ্ড তালাটা আগের মতই ঝুলছে—অথচ সে বাইরের জানালা দিয়ে দেখেছে ওই ঘরের মধ্যে আলোর বিন্দু।

সে ওয়ার্করুমের দরজার গায়ে একবার আঘাত হানল। কান পেতে রইল কোন কিছু শোনবার আশায়। যা, ভেতর থেকে কোন উত্তরই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল কে যেন ঘরের ভেতরে হাঁটছে তার পদশব্দ।

আবার সে দরজার কড়া নাড়ল। আগের থেকে বেশ জোরেই, ভেতরের ছিটকিনি খোলার কর্কশ ধাতব শব্দটা জঘন্যভাবে তার কানে প্রবেশ করল আর সেকেণ্ডের মধ্যেই দরজা খুলে দিয়ে রজারসের বিরক্তভরা অবসন্ন মুখটা বেরিয়ে এল। দু'চোখ একই রকম রক্তাভ, মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি আরও কর্কশ শুকনো দেখাচ্ছে।

জোনস এটাই স্থির করল যে, রজারস এতক্ষণ এই ঘরের মধ্যে এমন কোন কঠিন কাজে লিপ্ত ছিল, যাতে তার মেজাজ খুব দ্রুত বদলে গেছে, অত্যন্ত দ্রুত, বিশেষ করে তার এই হঠাৎ আগমনে সে যেন একটু অবাক হয়েছে।

বাঁকাচোরা লম্বাটে বেঢপ শরীরটা নিয়ে রজারস খুব বিরক্তের সঙ্গে জোনসকে স্বাগত জানাল। সেই সঙ্গে থেমে থেমে আবার বকতে শুরু করল সে। প্রায় অবিশ্রান্ত এবং ভয়াল রসে আপ্লুত সেই কথাগুলো।

জোনস এটা ভাবল, রজারসের ভেতরে আবার সেই পাগলামীর প্রবনতাটা এসে গেছে।

এ্যালকোভের নারকীয় মূর্তিগুলোর আদিম ইতিহাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মবলির নির্মম ঘটনাবলী, ঠিক এই বিষয়ের উপরই তার বক্তব্য সীমায়িত রাখতে চাইল সে।

জোনস খেয়াল করল, কথাবলার মাঝে মাঝেই রজারস চোরা চোখে একবার বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাচ্ছিল। হয়ত, এইসব আজেবাজে কথা বলে যাওয়ার পেছনে, জোনসের মাথায় যেন হঠাৎ বুদ্ধিটা এল, রজারস কোন কিছু গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আরও একটা জিনিষ জোনসকে অবাক করল, তারা ওয়ার্করুমে বসে কথা বলছিল।

সেইখানে, মেঝের উপর বিছানা ছিল মস্ত বড় একখণ্ড রঙীন চট।

মনে হচ্ছিল ওই চট খণ্ডের নীচে কোন কিছু যেন রয়েছে। সেই বস্তুটা চট দিয়ে চাপা দেওয়ার ফলে মাঝখানটা উঁচু হয়ে রয়েছে।

রজারস ঝড়ের মত কথা বলে চলেছে। তাব কথা বলার বেগ যেন আর থামতে চাইছে না আর তখনই জোনস নিরুপায়ভাবে অনুভব করল দুপুরের সেই আশ্চর্য ঘটনাটার কথা। কিছুতেই সে বলতে পারছে না। অনুভূতিটা একটা তীব্র ক্ষতের মত দগদগে হয়ে যেন নির্মমভাবে তাকে রক্তাক্ত করতে চাইছে।

রজারসের গলার স্বরে বেসমেণ্টের ঘরগুলো সমাধিগহ্বরের মতনই কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"মিঃ জোনস, আপনার কী সেই কথাগুলো স্মরণে আছে, ইন্দোচীনের সেই যে ধ্বংসস্তূপ নগরীর কাহিনী বলেছিলাম আপনাকে—যেখানে এক সময়ে টিচো টিচোরা বাস করত? যে সকল ফটোগুলো আপনাকে দেখিয়েছি তারই একটা ছবিতে হয়তো দেখতে পেয়েছেন কালো অন্ধকার একটা হ্রদের জলে কিছু সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এটার ভেতরে আমার কোন কৌশল রয়েছে বলে যদি আপনি মনে করে থাকেন—তাহলেও এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে ওই নগরীতে আমি গিয়েছিলাম। এবং বাকী ফটো দেখালে একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন, অন্ধকারের মধ্যে ওই হ্রদে যে সাঁতরাচ্ছিল সে আমিই……

"ঠিক আছে. সবই আপনাকে খুলে বলছি। ওই ব্যাপারটার কথা আমি

এখনো বলিনি আপনাকে। এর পিছনে আসল যে কারণটা রয়েছে তাই হল এই, আমি অবশিষ্ট কাজটা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করতে চাইছিলাম যাতে আগে ভাগে কেউ এই বিষয়টার উপরে কোন দাবী করতে না পারে।

আপনি যখন এর স্বপক্ষে ফটোগুলো দেখবেন তখন আপনাকে স্বীকার করতেই হবে ভূগোল কখনো মিথ্যে হতে পারে না—এমন কী অসাড় অস্তিত্বহীনও হতে পারে না।

আমার কল্পনায়, ওই মোমের প্রতিমূর্তি ছাড়াও, অন্যভাবে 'এটাকে' প্রমাণ করবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছি এবং এ ব্যাপারে কোন ভাবেই আমি আমার মানসিক ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না! আপনি ওই 'জিনিষটা' কখনও দেখেননি কারণ বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে 'ওটাকে' এখনও আমি প্রদর্শনী ঘরে নিয়ে আসতে পারিনি!

কথাগুলো শেষ করে রজারস আচমকা তার অদ্ভুত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল প্যাসেজের ওদিকের তালাবন্ধ ভারী দরজাটার দিকে।

"এটা এসেছে সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপার থেকে। যে ধর্মীয় ব্যাপারগুলো পুয়াহটিক পুঁথির অষ্টম খণ্ডে স্পষ্ট আকীর্ণ আছে। যখন ওই পুয়াহটিক খণ্ডটা আমি হাতে পাই তখন ওই আকীর্ণ লিপি পড়ে আমার কাছে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়, সেটা হল এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে সুদূর উত্তরে এমন কী লোমারের সুবিস্তীর্ণ মহাদেশ ছাড়িয়ে আরও উত্তরে, তার আবির্ভাবেরও অনেক আগে, উত্তরের এক অজানা হিমশীতল অদৃষ্টসীমা বরফের দেশে 'এটা' ছিল। পুয়াহটিক পুঁথির ওই টুকরো পড়ে একদিন রওনা হলাম আলাস্কার দিকে।

আলাস্কায় পৌঁছে ফোর্ট মর্টন থেকে নুটক গিয়ে উপস্থিত হলাম—আমরা জানতাম জিনিসটা ওখানেই রয়েছে—পুয়াহটিক পুঁথিতেও সেই ইঙ্গিতই ছিল। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সাইক্লোপিয়ানদের বিরাট সব ধ্বংসস্তূপ—যেদিকে চোখ চায় সেদিকেই স্তূপ স্তূপ ধ্বংসের চিহ্ন। আমরা যা আশা করেছিলাম তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, সেই ধ্বংসস্তূপের গভীরে—তিন লক্ষ বছর পরে। শেষ পর্যন্ত এস্কিমোদের উপকথার কাল্পনিক কিছু কাহিনী জেনে নিয়ে সঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। আমরা কাউকেই সঙ্গে নিইনি তবে ফিরে এসেছিলাম আমেরিকানদের সঙ্গেই। স্লেজে করে একেবারে নোম পর্যন্ত।

ওখানকার তুষারশীতল আবহাওয়া সহ্য করতে পারছিল না ওরাবোনা।

ও একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল—সব সময়ই বিষণ্ণ বিমর্ষ আর শেষের দিকটায় অনেকটা রুক্ষ মেজাজী হয়ে উঠেছিল।

একটু ধৈর্য ধরুন, একটু বাদেই আপনাকে বলছি কী করে ওটাকে খুঁজে পেলাম। বিশাল এক ধ্বংসাবশেষ বরফে চাপা পড়ে আছে তার তলায় সুড়ঙ্গের মতন একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

খোদাই করা খিলান-তোরণের তলায় নেমে বরফ সরিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। অতি সহজেই আমরা ইয়াস্কীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেই তুষারস্তীর্ণ ভাঙা তোরণের তলায় গিয়ে আত্মগোপন করলাম।

দমকা বাতাস আসার ফলে কচি কিশলয়ের মতন কাঁপছিল ওরাবোনা—শীতের নির্মম আক্রমণে সে প্রায় জমে যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রাণ শক্তি আর অক্লান্ত কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে যে আদিম একদেবতা রয়েছে সে বিষয়ে সে ছিল সচেতন। তার দু'চোখে ঘৃণা ঝরে পড়ছিল কারণ পুয়াহটিকের গুপ্ত রহস্যের মর্মোদ্ধারের সূক্ষ্ম কাজে আমার চাইতেও সে ছিল তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন মানুষ। চিরকালের পরিচিত সেই আলো মুছে গেল আমাদের চোখ থেকে।

তারপর আমরা টর্চের আলো ফেলে নামতে লাগলাম।

চার পাঁচটা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে একটা সমতল জায়গায় নেমে দেখতে পেলাম, এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কিছু কঙ্কাল। বুঝতে পারলাম আমাদের আগে এদের পদার্পণ ঘটেছিল এই ধ্বংসস্তূপের নীচে—সে কত যুগ আগেকার কথা কে জানে?

তখন এ অঞ্চলটা উষ্ণ ছিল, অনেক যুগ আগের ওই কঙ্কালগুলো! বীভৎস, ভয়াবহ, বিশালকৃতির নরকঙ্কাল—না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না, বহুযুগ আগের সাইক্লোপিয়ানরা যে দৈত্যাকৃতি চেহারার ছিল তা ওই কঙ্কালগুলো দেখলেই বোঝা যায়। ভূগর্ভের একেবারে তৃতীয় স্তরে পৌঁছবার পর দূরে দেয়ালের দিকে একটা প্রকাণ্ড উঁচু গজদন্তের সিংহাসন নজরে পড়ল আমাদের। পোয়াহটিক পুঁথির পাতা থেকে আমরা এই সিংহাসনটার কথা জানতে পারি। কিন্তু, কিন্তু আমি আপনাকে বলে রাখছি, ওই বিশাল, উঁচু সিংহাসনটা তখন খালি ছিল না।

জোনস চমকে উঠল যখন শেষের কথাটা বলতে গিয়ে খুব কাঁপতে লাগল

রজারসের গলাটা। সে লক্ষ্য করল, রজারস এক পলকের জন্যে যেন দৃষ্টি ফেলল তালাবন্ধ ঘরটার দিকে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল :

"সেই উঁচু সিংহাসনে যে 'বস্তুটা' বসেছিল সে মোটেই নড়াচড়া করছিল না। কিন্তু আমরা আগের থেকে জানতাম যে 'ওটা' 'সেই আদিম দেবতা যে আত্মদানের রক্তে নিজের ক্ষিধে মেটায়, ও এমন ক্ষুধার্ত এবং পিপাসাকাতর। কিন্তু 'ওকে' সেই মুহূর্তে জাগিয়ে তুলতে আমাদের মন চাইছিল না।

সেই সময়ে আমাদের খুবই জরুরী কাজ হল প্রথমে 'ওকে' বয়ে নিয়ে লণ্ডনে পৌছানো। ওরাবোনা আর আমি খুব তাড়াতাড়ি উপরে এলাম. এমন একটা বড় বাক্স নিতে হবে যার মধ্যে 'ওটাকে' ভবে ফেলে উপরে বয়ে আনতে হবে।

কিন্তু জিনিসটাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বাক্সে ভরে ফেলে যখন উপরে তুলে আনার চেষ্টা করলাম, তখন দেখা গেল বাক্সটা এত ভাবী হয়েছে যে ওটাকে ধরে উপরে তুলে আনা এক অসাধ্য ব্যাপার। সিঁড়িগুলোও তেমন মজবুত নয়, হয়ত মানুষের হাঁটা চলাব জন্যে এ সিঁড়ি তৈরী হয়নি।

বাক্সটা অত্যন্ত ভারী হয়েছে, যাকে বলে অমানুষিক ভারী। বাক্সটার ভিতরে কী রয়েছে দেবতা না দানব ?

কোন উপায় না দেখে বাক্সটাকে উপরে তুলে আনার জন্যে আমেরিকানদের সাহায্য নিলাম। অবশেষে তাদের সাহায্যেই বাক্সটাকে উপরে তুলে আনা সম্ভব হল।

ধ্বংসস্তূপের নীচে নেমে আসতে আমেরিকানদের কোন ভয়ই ছিল না আর আমরাও ছিলাম নিঃশঙ্কচিত্ত, কারণ আমরা ভালোভাবেই জানি আসল জিনিসটাকে আমরা বাক্সেব মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। আমরা তাদের বললাম বাক্সের ভেতরে রয়েছে খোদাই করা কিছু উৎকীর্ণ পাথরমূর্তি, বলা যায় সেই সব স্থাপত্যগুলোর কোন মূল্যই নেই।

আমেরিকানরা ওই গজদন্ত সিংহাসনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাদের কথাটা যেন বিশ্বাস করল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ার মতন কোন ব্যাপারকেই তারা সন্দেহ করেনি এবং তার থেকে কোন ভাগা-ভাগির দাবীও জানায়নি। পরে হয়ত নোম-এ ফিরে গিয়ে তারা এই ব্যাপারে কোন অভাবনীয় ঘটনা কথা শুনে থাকবে কিন্তু ওই গজদন্ত সিংহাসনের লোভে তারা আবার ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফিরে এসেছিল একথা কখনো শুনিনি।"

রজারস এবার মুখ বন্ধ করল। ডেস্কের উপরে ঝুঁকে পড়ল, ড্রয়ার টেনে তার মধ্যে থেকে বের করে আনল বেশ বড় আকারের একখানা খাম।

খামের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ফটো, তার মধ্যে থেকে বড দেখে একখানা ফটো বের করে রজারস জোনসের সামনে রাখল।

জোনস সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যেন সে চিড়িয়াখানার আশ্চর্য কোন জীব দেখছে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে।

ছবিটার যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার সবই অদ্ভুত, অন্তত সে চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে—বরফে ঢাকা পাহাড় সারি, কুকুরের স্লেজ, ফার পোশাকে আবৃত মানুষ আর দিগন্তলীন তুষার প্রান্তরের গায়ে বিশাল চেহারার কয়েকটা ধ্বংসস্তূপ প্রলম্ব ছায়া পড়েছে ধ্বংসস্তূপের তলায় তুষারের উপরে।

জোনসের চোখের দৃষ্টি আবাব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যখন সে দেখতে পেল, টর্চের এক সুতীব্র ফোকাসে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস্য আকারের বড় একটা প্রকোষ্ঠ। পাথরের দেওয়ালে চারপাশ ঘেরা, তাতে খোদাই করা রয়েছে অদ্ভুত ও বিচিত্র নক্সার ভাস্কয, একচক্ষু কানহীন নগ্ন এক নারী, হয়ত সাইক্লপস কোন নারীর দৈত্যকায় আকৃতি ওটা, সেই নারীর স্তনে মুখ দিয়েছে অতিকায় এক সাপ, আর এক পাথবের দেয়ালে খোদাই করা রয়েছে এমন এক নারী যাকে প্রেতিণীর মতো দেখতে, অনেকটা মেড়ুসার আকৃতি : মাথার চুলে জড়িয়ে আছে অসংখ্য সাপ আর সেই সাপ যদি কোন মানুষকে দেখতে পায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষ পাথরে রূপান্তরিত হবে

জোনস উত্তেজিত হয়ে উঠলো, তার নিশ্বাসে ঝবে পড়ছে উষ্ণতা : তারপর সেই পাথরের দেয়ালের একধারে মস্তবড়ো উঁচু সিংহাসন. হয়ত গজদন্তেরই এবং উৎকীর্ণ খোদাই-এর মৌলিব নক্সা রয়েছে সেই সিংহাসনে—কিন্তু সেই সিংহাসনের উচ্চতা এত বেশী যে তাহা কোন মানুষের জন্যে তৈরী করা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত ব্যাপাব, সিংহাসনের উঁচু দিকটাই খিলান দেওয়া জাফরিকাটা চারকোণা ছাউনী আর সেই খিলানের গায়ে অসংখ্য প্রতীকচিহ্ন অজ্ঞাত, অস্পষ্ট সব চিত্র ভাস্কর্য, গুপ্ত সংকেতবাহী হায়ারোগ্লিফস বা চিত্রগুপ্তি। এইসব প্রতীক চিহ্নগুলি জোনসের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। সে নেকরোনোমিকন পুথির জীর্ণ পাতায় এই সব প্রতীক চিহ্নের কিছু কিছু দেখেছিল।

জোনসের হঠাৎ মনে পডে যায় এরই এক প্রতীক চিহ্ন সে দেখেছে রজারসের এই যাদুঘরের তালাবন্ধ একটা বন্ধ ঘরের দরজার মাথায়।

তৎক্ষণাৎ জোনস প্যাসেজের অন্ধকার দিকটায় তাকাল, ভারী তালাটা ঝুলছে যে দরজাটার সেদিকে। সত্যি বলতে কি, রজারসের এই ফটোতে মৌলিক অনেক কিছুই ফুটে উঠেছে। রজারস যে একটা অস্পষ্ট অজানা দেশে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যজনক কিছু আবিষ্কার করেছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে এই ছবি। কিন্তু তবুও এই ভয়ঙ্কর ছবিটা, যে ছবির আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দর্শককে প্রায় উন্মাদ করে দিতে পারে, এটা কোন চমকপ্রদ প্রতারণার কারসাজি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না জোনসের মনে।

জোনস মনে মনে ভাবল, হয়ত কোন বিশেষ চাতুরীময় স্টেজ সেটিং-এর কৌশলে এরকম একটা দৃশ্যের ছবি তুলেছে রজারস।

রজারস আবার কথা আরম্ভ করল, তারপর শুনুন, নোমে আমরা বাক্সটা জাহাজে তুলে লণ্ডনে ফিরে এলাম—পথে কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

সেই প্রথম এমন একটা 'জিনিস' লণ্ডনে নিয়ে এলাম যার ভেতরে সজাগ কিন্তু সুপ্ত এক প্রাণের সম্ভাবনা ছিল। কখনো আমি 'ওকে' দর্শকদের দেখানোর জন্য প্রদর্শনী হলে রাখিনি। কারণ 'ওকে' নিয়ে আমার মূল্যবান কিছু কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে।

'ওর' শরীরের পুষ্টির জন্য আত্মবলির খুবই প্রয়োজন কারণ 'ও' হল আদিম পৃথিবীর এক দেবতা। অবশ্য যে ধরণের আত্মবলিতে এ দেবতা তৃপ্ত হত সেই আদিম যুগে, আমি এখনো 'এর' জন্যে সে রকম কোন আত্মবলির ব্যবস্থা করতে পারিনি আর এই যুগে ত' সম্ভবপরও নয়। হয়ত আমাকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রক্তই হল জীবন। আদিম পৃথিবীতে দেবতাদের তুষ্ট করা হত মানুষ ও পশুর রক্ত দিয়ে ঠিক সেরকম ধরণের রক্তই এখন দরকার আমার 'ওর' জন্যে।

প্রায় দম বন্ধ করে জোনস কথাগুলো শ্রবণ করল।

চেয়ারে বসে সে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ঘেমে উঠেছিল আর ঠিক তখনই সে খেয়াল করল রজারস তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সজাগ তীক্ষ্ণ দুটো কঠিন চোখ, হিংস্র সাপের হিমজমাট চোখের মতন, জোনাকীর মতন ফিকে সবুজ আলোর জ্যোতি সেই চোখে, জোনসের শিথিল অবসন্ন স্নায়ুর ক্লান্ত শরীরটাকে যেন জরীপ করছিল।

তারপর রজারসের মুখে ফুটে উঠল শয়তানের মত ক্রুর একটুখানি হাসি।

সে বলতে থাকে, ঠিক গত বছরেই 'ওকে' আবিষ্কার করি আর তারপর থেকেই চেষ্টা করছি কী ভাবে 'ওর' জন্যে আত্মদানের ব্যবস্থা করব। সেই সঙ্গে আদিম সেই ধর্মীয় পুজো-আচ্চার ব্যাপারটা।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ওরাবোনার কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছি না। ওর মনে এই ভয় যে এর ফলে 'ওটা' হয়ত জেগে উঠবে, সাইক্লপসদের আদিম দেবতার ঘুম ভেঙে যাবে।

ওরাবোনা 'ওকে' প্রচণ্ড ঘৃণা করে, হয়ত তার আশঙ্কা এই যে ওকে জাগিয়ে তুললে ও এমন একটা কিছু ঘটাবে যা অমানুষিক, ভয়ঙ্কর! সব সময়ই ওরাবোনার কাছে পিস্তল থাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু ওরাবোনা এতই বোকা ও মূর্খ যে ও বোঝার চেষ্টা করে না 'ওকে' বাধা দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার যদি কখনো ওকে পিস্তল বার করতে দেখি তাহলে ওরাবোনার গলা টিপে আমি ওকে খুন করব!

ওরাবোনা চায় আমি 'ওটাকে' হত্যা করি এবং অন্য সবকিছুর মতই, 'ওটারও' একটা মোমের প্রতিমূর্তি বানিয়ে রাখি।

কিন্তু আমার সংকল্প থেকে কেউ আমাকে একচুলও নড়াতে পারবে না— আমি 'ওকে' জাগিয়ে তুলে পৃথিবীর মানুষকে আমার প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখাবই— সে ভীতু, মূর্খ ওরাবোনা যতই আপত্তি জানাক আর আপনার মতন কপট নাস্তিক-এর ছল যতই চাপা হাসির বিদ্রুপ ছড়িয়ে দিক—শুধু এটুকুই জানিয়ে রাখছি, ইতিমধ্যেই আমি সেই আদিম ধর্মীয় মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিয়েছি এবং তার সাথে আত্মদানের ব্যাপারও ঘটিয়েছি যার ফলে অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ এক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে এই যাদুঘরে—আত্মদানের রক্তে এখন 'ওটা' তৃপ্ত এবং আনন্দিত।

কথাগুলো বলেই রজারস জিভ বার করে তার শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল, আর জোনস শক্ত অনড়, যেন অচেতন একটা ঠাণ্ডা পাথর, মৌন হয়ে বসে রইল।

জোনস দেখল, রজারস উঠে চলে যাচ্ছে। সেই মেঝেতে বিছানো চটখণ্ডের কাছে গিয়ে থামল রজারস, যার দিকে খানিক আগেও ঘন ঘন তাকাচ্ছিল সে।

রজারস ঘাড় নীচু করে চটের একটা কোনা ধরে জোনসের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আপনি আমার কাণ্ডকারখানা দেখে খুব হাসছিলেন, কিন্তু জেনে রাখুন এমন একটা সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন আপনি যখন তখন ব্যাপারটার বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে পারেন আপনি! ওরাবোনার মুখে শুনলাম

আজ দুপুরের দিকে এই যাদুঘরের ভেতরে একটা কুকুরের চীৎকার শুনেছেন আপনি। আপনি অনুমান করতে পারেন এর অর্থ কী হতে পারে?

চকিতে জোনস উঠে দাঁড়াল। আর একটি মুহূর্তও সে এই যাদুঘরে থাকতে চায় না। কুকুরের সেই অন্তিম আর্ত চীৎকারের ব্যাপারে যে হতবুদ্ধিকর কৌতূহল ছিল তার মনে সেটা উবে গেছে।

কিন্তু রজারস একেবারে অনমনীয় এবং তৎক্ষণাৎ চটের একটা কোণ ধরে সে টান দিল। আর তখনই বেরিয়ে পড়ল এমন এক দৃশ্য যা প্রথম ঠিকমতো বুঝতেই পারল না জোনস।

প্রায় আকৃতিহীন একটা চিমসে শুকনো মাংসের স্তূপ, হয়ত সোজা করে টানলে ওটাকে একটা পশুর চেহারা বলেই মনে হত।

জোনস ভাল করে দেখে এটাই অনুমান করল যে মাংসস্তূপটা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও একটা পশুর আকার নিয়েই বেঁচেছিল, কিন্তু কে যেন ওকে কামড়ে, ছিঁড়ে, শত সহস্র আঘাতে হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে তারপর শুকনো চিমসে ছিবড়ানো মাংসের শিথিল ডেলাটা ফেলে রেখেছে এখানে।

জোনসের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো যখন সে বুঝতে পারল জিনিসটা কী। বেশ বোঝা গেল ওই শত ছিন্ন চিমসানো মাংসের স্তূপটা একটা কুকুরের, আর কুকুরটা ছিল বেশ শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও সাদা রঙের বিশাল কুকুর।

কুকুরটার গায়ের রং এখন আর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কারণ নিষ্ঠুর অত্যাচার আর তীব্র অ্যাসিডের সাহায্যে তার চামড়ার লোম প্রায় অদৃশ্য, তীক্ষ্ণ দাঁত আর নখের নির্মম আঘাতে দেহের সর্বাংশে ফুটে উঠেছে শত শত আঘাত আর গভীর ক্ষতের দাগ, রক্ত শূন্য বিচূর্ণ অস্থিমজ্জার চিমসে একটা মাংসের ডেলা। কী নিষ্ঠুর ভয়াবহ অত্যাচারের ফলে একটা জীবন্ত প্রাণের এরূপ অবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

জোনস শিউরে উঠল। তার চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল তীব্র ঘৃণা।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, উঃ, কী ভয়াবহ এক ধর্ষকামী লোক আপনি! উন্মাদ—দারুণ উন্মাদ আপনি! লজ্জা করে না এরকম একটা বীভৎস নিষ্ঠুর হত্যার কথাটা আমার কাছে বলতে আপনার।

রজারস দ্রুত চটে দিয়ে মাংসস্তূপটাকে ঢেকে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জোনসের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত একেবারে নীরব।

তারপর বলে উঠল, প্রায় গম্ভীর এক প্রতিধ্বনির মতন স্বর তার কণ্ঠে, মশাই আপনি খুবই বোকা, মূর্খ! আপনি কি মনে করেন আমিই পশুটার এ অবস্থা করেছি? স্বীকার করছি আমাদের মানুষের নজরে এটা একটা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দৃশ্যই বটে—কিন্তু পশুটার এ-দশা কে করল? না, এটা কোন মানুষের কাজ নয়—আর মানুষের পক্ষে এটা সম্ভবপরও নয়। এটা আত্মদানেরই বলি।

কুকুরটাকে আমি নিজের হাতে 'ওর' কাছে নিবেদন করেছিলাম। তারপর কুকুরটার ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা 'ওর'ই দেখবার বিষয়—আমার নয়। 'ওর' তুষ্টি এবং তৃপ্তির প্রয়োজন ছিল তা 'সে' তার নিজের নিয়মেই নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মিঃ জোনস, এবার দেখুন, 'ওকে' কেমন দেখতে!

চলে যাবার জন্য জোনস পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু রজারস জেই ড্রয়ার খুলে আর একটা বড়ো সাইজের ফটো বের করে তার সামনে রাখল, সে তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য জোনসের চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। এ্যালকোভের মলিন আলোর রোগাটে সামান্য খানিকটা রেখা এসে পড়েছে এদিকে, কিন্তু রজারস তার টর্চের আলো ফেলেছে তখন ফটোর উপর। পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে। জোনসের কৌতূহল চোখ এবার তীক্ষ্ণ, তীব্র, হীরের পাথরের গায়ে ঝুঁকে পড়া জহুরীর মতনই সতর্ক অনুসন্ধানী, একটু পর চোখ দুটো রগড়ে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছে তা যদি সত্যি হয় এবং যতদূর মনে হচ্ছে রজারস এ-ব্যাপারে প্রকাণ্ড চাতুরীর পরিচয়ই দিয়েছে, তাহলে স্বীকার করতেই হয় এটা এক আশ্চর্য ধরণের ছবি।

কৌশল এবং চতুরতার সংমিশ্রণে অশুভ এক সৃষ্টি শৈলী, অবদমিত মন এ-ছবি দেখা মাত্রই মোহনিদ্রার জালে আচ্ছন্ন হতে পারে কিংবা বিকারগ্রস্ত মানুষের মতনই ঘন ঘন প্রলাপ বকতে পারে। যেন রাতের কোন ভয়ার্ত দুঃস্বপ্নকে ঝটপটে এঁকে রেখে পরে তা ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে রজারস। এটা যে একটা খাঁটি মৌলিক নরকের দৃশ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, একটু বাদেই জোনস অবাক হয়ে ভাবল, এই ধরণের ছবির মূর্তি যদি বানিয়ে প্রদর্শনী মঞ্চে রাখা হয় তাহলে সাধারণ দর্শক এটাকে কীভাবে গ্রহণ করবে!

না, এ ধরণের বীভৎস কোন জিনিস প্রদর্শনী মঞ্চে সাধারণের দর্শনের জন্য রাখার কোন অধিকার নেই কারো। এমন কি রজারসও তা করতে পারে

শয়তানী, নিষ্ঠুরতা এবং আদিম হিংস্রতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন ফটোর এই মূর্তি এবং রজারসের কাহিনী যদি বাস্তবই হয়, এই মূর্তির মধ্যে যদি প্রাণের সম্ভাবনা থেকেই থাকে, আসুরিক চেহারার সাইক্লোপিয়ানদের যুগে, প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে, মানুষের আত্মোৎসর্গের রক্তে যে আদিম দেবতা নিজের শরীরকে পুষ্ট করত, এই ফটোর মূর্তি যদি সেই দেবতা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে হয় রজারস মূর্তিমান চতুর একটা শয়তান নয়ত দীপ্তিমান এক শক্তিশালী যাদুকর।

ফটোর ভেতরে মূর্তিটা একটা বিরাট উঁচু পাথরের সিংহাসনে বসে আছে এবং যদি ক্যামেরায় কোন ভেল্কীর কাজ না থেকে থাকে তাহলে ধরে নিতে এতটুকুও কষ্ট হবে না যে ষোল ফুট উঁচু খোদিত সিংহাসনের প্রায় দশ ফুট জুড়েই মূর্তিটা বসবার ভঙ্গীতে রয়েছে রজারসের বর্ণনার সঙ্গে তাল রেখে কয়েকটা প্রকাণ্ড চেহারার নরকঙ্কালও পড়ে আছে সিংহাসনের তলায়। জানি না, ওগুলো সত্যিই সাইক্লোপিয়ানদের কঙ্কাল কিনা। চালাক, দুর্দান্ত চালাক লোকটা, জোনস মনে মনে ভাবল।

ফটোর এই মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যাবে, এমন কোন ভোকাবুলারি পৃথিবীতে সম্ভবত কোথাও আছে কিনা সন্দেহ এবং সুস্থ কোন মানুষের কল্পনায় এমন বিভীষিকাময় দৃশ্য কল্পনা করাও অসম্ভব

হয়ত এই ফটোতে, অন্য কোন গ্রহের, মানুষের চিন্তাধারায় যে গ্রহের অত্যন্ত ভীষণ দর্শন মেরুদণ্ডী প্রাণীর চেহারাও এক ধূসর অস্পষ্টতায় আবিল অথচ বিন্দু বিন্দু বিভীষিকা দিয়ে গঠিত, সেইরকমই একটা কোন মেরুদণ্ডী শরীরী মূর্তি রয়েছে। আয়তনে হয়তো সাক্লোপিয়ানদের মতই, কারণ বসে থেকেও মূর্তিটাকে ওরাবোনার দেহ ছাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ দেখা যাচ্ছে।

ফটোতে দেখা যাচ্ছে ওরাবোনা ফার কোটে গা ঢেকে সিংহাসনের মূর্তিটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ফটো দেখার ফাঁকে জোনস স্তব্ধ নির্বাক বিস্ময়ে চোরা চোখে একবার রজারসের দিকে তাকাল

রজারস একইভাবে স্থির চোখে ফটোটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার টর্চের ফোকাস আরও তীব্র হয়ে উঠল।

মস্তবড় মূর্তিটার দেহ গোলাকার, দু'পাশে মূর্তিটা এমনভাবে সিংহাসনে বসে আছে যে, ফটো দেখে বোঝাই যাচ্ছে না সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালে তার নীচের দিকটা কীরকম দেখতে হবে।

ফটো দেখা সমাপ্ত হলে প্রথমেই অনুভব জাগবে, আপাতবিরোধী কোন কূট সত্য—যার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে সোচ্চার হবার মতন কোন প্রলুব্ধ সাহস জোনসের নেই।

কিন্তু ত্রিকোণ ওই রুক্ষ চোখ তিনটে থেকে যে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে তার তীর্যক ক্রূরতা আর হিংস্রতা যেন জোনস পদে পদে অনুভব করল।

সত্যি মূর্তিটার ঐ অদ্ভুত চেহারা অবিশ্বাস্যই বটে কিন্তু তার উপায় নেই, কারণ রজারসের ফটোটাই মূর্তিটার অস্তিত্বের প্রমাণ রাখছে।

রজারসের তীক্ষ্ণ গলার স্বরে তার চিন্তাজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

রজারস বলে উঠল, কী, দেখলেন তো? এখন কী মনে হচ্ছে আপনার? এখনও কী বিশ্বাস করতে পারছেন না যে কুকুরটার ওই অবস্থার জন্যে 'এটাই' দায়ী? আপনি কী এখনো বুঝতে পারছেন না ওই আদিম দেবতা তার অসংখ্য হিংস্র মুখ আর দাঁড়ার নখের সাহায্যে কুকুরটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ওর শেষ রক্ত-বিন্দুটুকু চুষে নিয়েছে? পুষ্টির জন্যে ও অধীর এবং প্রয়োজন 'ওর' আরও —আরও। ও হচ্ছে আদিম যুগের এক দেবতা আর আমি হচ্ছি বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র পুরোহিত 'ওর'—আইয়া। শাব্ নিগগুরাথ! আইয়া— থেকে বেরিয়ে এসেছে বিসর্পিল দু'টা বাহু, অনেকটা কাঁকড়ার দাঁড়ার মতন সেই বাহুর থাবা তীক্ষ্ণ নখরসজ্জিত। গোলাকৃতি দেহটার উপর রয়েছে একটা গোল মাথা, সেই মাথায় জলবুদবুদের মতন অসংখ্য বুদবুদের ভেতরে তিনটে ত্রিকোণ বড় বড় কাঁচের মতন চোখ অপলক দৃষ্টিতে স্থিরভাবে একদিকে তাকিয়ে রয়েছে, মাঝখান থেকে ফুটখানেক লম্বা একটা শুঁড় সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে বুকের মাঝখানে। মাছদের শ্বাসযন্ত্রের মতন, সেই বুদবুদভরা মাথাটার দুদিক থেকে বড় বড় স্ফীত কঙ্ক'ত বা ফুলকো জড়িয়ে রয়েছে শুঁড়ের দিকে গালের উপরে।

মূর্তিটাকে প্রথম দর্শনে মনে হবে তার দেহ ঘন ধূসর লোমে ঢাকা, কিন্তু একটু সজাগ দৃষ্টি মেলে দেখলেই বোঝা যাবে ওটা পাতলা এক অন্ধকারের আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূর্তিটার কোমরের ধার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সরু সরু লম্বা নলের মতন কয়েকটা শুঁড়। প্রত্যেকটা শুঁড়ের আগায় হিংস্র বিষধর গোখরো সাপের মুখের মতন অবিকল কয়েকটা মুখ। সেই হিংস্র সাপমুখগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে সরু লিকলিকে চেরা জিভ—যা দিয়ে সহজেই কিছু চুষে নেওয়া যায়।

মূর্তির বুদবুদে ভরা মাথাটার যেখান থেকে প্রধান শুঁড়টা বেরিয়ে এসেছে সেটার উপর দিকে কুণ্ডলী পাকানো অংশে অসংখ্য ডোরা কাটা দাগ গ্রীক শিল্পী মেডুসার মাথায় জড়ান সাপের ছবির মতন।

জোনসের হঠাৎ মনে পড়ল, নেকরোনোমিকন পুঁথির কোন একটা অংশে এই রকম পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের বিচিত্র শব্দ পড়েছে সে।

বেশ ঘৃণা আর অবজ্ঞার সঙ্গে জোনস অতঃপর ফটোখানা নামিয়ে রাখল তার কোলের উপরে দু'হাঁটুর মাঝে।

শুনুন রজারস, আপনি এসব থেকে দূরে সরে যান! জোনস প্রায় মিনতির স্বরে বলে উঠল—সবকিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। স্বীকার করছি আপনার এই ফটোখানা শিল্পের বিচারে এক শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ এবং সত্যিই হয়ত তাই, কিন্তু ব্যাপারটা আপনার পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

ফটোটার দিকে বিশেষ নজর দেবেন না, যদি পারেন ওরাবোনাকে বলুন 'ওটাকে' ভেঙে ফেলে দিতে। অনুগ্রহ করে আমার কথা রাখুন রজারস। এসব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি বললে, আমি এখনই এই মারাত্মক ফটোটা ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে দিতে পারি!

কথাটা শ্রবণ করে রজারস হিংস্র নেকড়ের মত চাপা গরগর শব্দ করে উঠল তারপর বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জোনসের হাত থেকে ফটোটা কেড়ে নিল।

ইডিয়ট! এত কিছুর পরও আপনি ভাবছেন এটা ধাপ্পাবাজী, এ্যাঁ? আপনি এখনো মনে করছেন যে আমিই ফটোটা কারসাজি করে তৈরী করেছি এবং মিউজিয়মের ওই মূর্তিগুলো একেবারেই প্রাণহীন জড় মোমের স্তূপ! কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি নিজেই এই মোমের মূর্তিগুলোর চেয়েও নিথর, অপদার্থ একটা মাটির ডেলা নয় কী?

কিন্তু, আর দেরী নয়, আমি খুব শীঘ্রই আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি। তবে এখন নয় কারণ আত্মদানের রক্ত আর অস্থিমজ্জার রস শুষে নিয়ে তৃপ্তিতে ও এখন বিশ্রাম সুখভোগ করছে। 'ওকে' পরে দেখাবো আপনাকে। আশা করি তখন আর আপনার মনে কোন সন্দেহই থাকবে না।

কথাগুলো শেষ করেই রজারস তীব্র জ্বলন্ত চোখে ক্ষণিকের জন্যে তাকাল অন্ধকার প্যাসেজের তালাবদ্ধ দরজাটার দিকে। আর সেই ফাঁকে জোনস উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে আলতোভাবে টুপিটা তুলে নিল।

—আচ্ছা, আমি এখন যাই রজারস। ঠিক আছে, পরেই না হয় 'ওটাকে' দেখবো আমি। জরুরী কাজে আমাকে এখনি যেতে হচ্ছে, তবে আমি আবার কাল বিকেলে আসবো। ঠাণ্ডা মাথায় আমার উপদেশটা ভাবার চেষ্টা করবেন—এতে ভাবাবেগের কোন ব্যাপারই নেই। ওরাবোনাকেও জানিয়ে দেবেন, সে যেন ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।

রজারস এমনভাবে তার দাঁতগুলো বের করল যেন কোন হিংস্র জন্তু সে!

এখুনি চললেন নাকি? এঁ্যা! খুব ভয় পেয়েছেন বুঝি? লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার পরও এত ভয়? আপনি বলেছেন আমার এই প্রতিমূর্তিগুলো নিতান্তই মোমের—কিন্তু আপনি এমন সময়ে ভয়ে এই স্থান ত্যাগ করছেন যখন আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাতে পারি যে ওগুলো নেহাতই মোমের নয়। আপনিও তাহলে সেই ধরনেরই দর্শক যারা এখানে এসে প্রথমে খুব লম্বা চওড়া কথা বলে আমাকে জানিয়ে দেয় যে এই যাদুঘরে তারা একাকী রাত কাটাতে পারে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, রাতের প্রথম ঘণ্টাটি কেটে যেতে না যেতেই এমন এক আকস্মিক আতঙ্কে তারা চাৎকার করে ওঠে যে রাস্তার কনস্টেবল ছুটে আসার আগেই তারা দরজা খুলে পালিয়ে যায়। ওঃ, ওরাবোনাকে বুঝি কিছু বলতে বললেন? তাহলে দেখছি আপনারা দু'জনেই আমার বিপরীতে চলে গেছেন। আপনি চান, আমি 'ওকে' ধ্বংস করে এই পৃথিবীতে আমার শ্রেষ্ঠত্বের মূলে কুড়ুল বসিয়ে দিই!

জোনস নীরবে কথাগুলো হজম করে ফেলল।

না রজারস, আপনার বিরুদ্ধাচরণ আমরা করছি না। তাছাড়া এটাও জানিয়ে রাখছি, আপনার ওই মূর্তিগুলোকে আমি বিন্দুমাত্রও ভয় পাই না। আসল কথা হল, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,……সম্ভবতঃ আপনিও। দুজনেরই এখন বিশ্রাম দরকার!

আচ্ছা ধন্যবাদ—

রজারস বাঁকা চোখে জোনসের এগিয়ে যাবার পথের দিকে তাকাল।

ওঃ, আপনি তাহলে ভয় পান নি? তাহলে এখনই যেতে চাইছেন কেন, শুনি? খোলাখুলি বলুন, এখানে এই মিউজিয়ামে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে একা জেগে থাকতে আপনার ভয় করবে না? ওর অস্তিত্বকে যদি আপনি অস্বীকারই করেন তাহলে এত তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?

জোনস ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল রজারসের মুখখানা, তার মাথায়

হঠাৎ একখানা মতলব এসেছে। তার ছায়াটা লম্বালম্বিভাবে পড়েছে পাশের দেয়ালের গায়ে, যেন একটা প্রচ্ছায়া—জোনসের সরু ছায়াটাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে।

দেখুন রজারস, আপনার প্রস্তাব যদি আমি মেনেও নিই, জোনস জোরগলায় বলে উঠল, ধরা যাক তর্কের খাতিরে মেনেই নিয়েছি, তাতে এমন কী প্রমাণিত হবে আর আপনিই বা এত উল্লাস বোধ করছেন কেন।

আমি যদি সমস্তটা রাত এখানে অন্ধকারে জেগে থাকি তাহলে কী আপনার ওই মোম মূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে আপনি তাই মনে করেন? কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেটা কখনোই সম্ভব নয়।

আচ্ছা, ধরুন, আপনার অনুরোধে আমি না হয় একটা রাত এখানে থাকলামই, কিন্তু তার বিনিময়ে আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যে আপনি শীঘ্রই অন্ততঃ তিনমাসের ছুটি নিয়ে কোন সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাবেন এবং যাবার সময়ে ওরাবোনাকে বলে যাবেন যে সে যেন 'ওটাকে' ভেঙে তছনছ করে দেয়?

রজারসের মুখ ভঙ্গিমায় পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না কিন্তু তার চোখ দুটো যে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে সেটা পরিষ্কার দেখতে পেল জোনস। তার চিন্তা ভাবনার স্রোত মুহূর্তের মধ্যে যে কোন দিকে বাঁক নিতে পারে এবং একটুবাদেই জোনস বুঝতে পারল রজারস যে কোন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে।

প্রায় অবরুদ্ধ চাপা গলায় রজারস বলে উঠল, ঠিক আছে, তাই হবে জোনস! অবশ্য আপনি যদি সত্যিই সারাটা রাত এখানে জেগে থাকতে পারেন এবং সকাল পর্যন্ত সশরীরে টিকে থাকেন তাহলে আপনার উপদেশ আমি পালন করব। কিন্তু আজ রাতেই আপনাকে এখানে থাকতে হবে! সম্পূর্ণ একা। কি রাজী তো? ঘড়িতে এখন রাত সাতটা বাজে, আমরা দু'জনে এখন ডিনারের জন্য বেরোবো, ফিরব দু'ঘণ্টা বাদে।

প্রধান প্রদর্শনী হলের মধ্যে আপনাকে বসিয়ে রেখে, আমি বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে যাব। কাল প্রত্যূষে আবার আসব ওরাবোনা এসে পৌঁছানোর অনেক আগে, তারপর দেখব আপনি কেমন আছেন।

কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি ভালভাবে আপনার নাস্তিক মনটাকে ভাবার সুযোগ দিন, সত্যিই আপনি একাজ করবেন কিনা। এরকম ঝুঁকি নিয়ে এর আগে দু'জন লোক পাগল হয়ে গেছে তাও

আমি জানি। কোন কারণেই আপনি ছুটে এসে দরজায় একনাগাড়ে আঘাত করবেন না তাহলে রাতের প্রহরার কনষ্টেবল এখানে ছুটে আসবে। জেনে রাখুন এই পুরনো বাড়ীটার বেসমেন্টের যে ঘরে আপনি থাকবেন তার নিকটেই আর একটা ঘরে রয়েছে সেই সাইক্লোপিয়ান দেবতা, ফটোতে যার মূর্তি দেখেছেন।

জোনসের মুখে একটি কথাও ফুটলো না, হয়ত ইচ্ছে করেই সে মুখ খুলল না।

বেসমেন্টের সদর দরজা পেরিয়ে, সশব্দে পুরোনো সিঁড়ির কয়েক ধাপ অতিক্রম করে, বাইরের ম্লান আলো-আঁধারী উঠোনটায় এসে দাঁড়াল। রজারসও তার পিছু পিছু এলো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার আকাশ, রাস্তার পাশের জনহীন গেবলঅলা বাড়ীগুলো ঘন অন্ধকার আকাশের পটে মেঘের তরঙ্গময় দিগন্তরেখার মতনই অস্পষ্ট, তার অদূরবদ্ধ দৃষ্টি সেইদিকে যখন থমকাল তখন মনে হল যেন অস্পষ্ট এক অজানা দেশে এসে হাজির হয়েছে সে।

সে দ্রুত হাঁটতে লাগল, পরিষ্কার বুঝতে পারল রজারসও তার পাশে পাশে আসছে। তার হাতে রয়েছে চটে-মোড়া একটা ঝুলন্ত পুঁটলি—কুকুরটার সেই শুকনো ছিবড়ে মাংসস্তূপটা রয়েছে ওতে।

উঠোনের একেবারে শেষপ্রান্তে, পাথরের পাটি বসান জরাজীর্ণ পথের একপাশে, টিউডর যুগীয় বাড়ীগুলোর নোনাধরা গন্ধ যেখানে সর্বদাই বাতাসে মিশে হয়েছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্পষ্ট এক পূতিবাষ্পময় সূক্ষ্ম দুর্গন্ধ যেখানকার আবহাওয়ায় নীরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেইখানে একটা ম্যানহোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রজারস।

তারপর নীচু হয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটা তুলে ফেলল এবং যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তার ছায়াটা লম্বালম্বিভাবে পড়ল পাথর পাটির সেকেলে রাস্তাটার বুকে।

হাতে ধরা পুঁটলিটা ম্যানহোলের অন্ধকার গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তখনই জোনসের সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। মানুষের ছায়ার মতন ছায়া এটা নয়, যেন কোন সাইক্লোপিয়ান মানুষের ছায়া এবং একটু বাদেই সেই অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে উপস্থিত হলো আলোকময় উজ্জ্বল রাস্তায়।

তারা দু'জনে ওয়াটালু ব্রীজ পেরিয়ে মানুষের ভীড়ে মিশে যাবার আগে, দুটি কাফের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল। যেন ওদের মধ্যে একটা অকথিত গোপন চুক্তি রয়েছে, ওরা একসাথে একই কাফে বসে ডিনার খাবে না। কিন্তু উভয়েই রাত এগারোটার সময় যাদুঘরের উঠোনে মিলিত হবে, এমন কোন চুক্তি হয়েছে।

জোনস একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চাপল। আলোর ফোয়ারায় ভেসে যাওয়া ষ্ট্রাণ্ডে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ডিনারের জন্যে কাফেতে ঢুকতেই তার মন আনন্দে নেচে উঠল। সুস্বাদু অনেক কিছুই উদরে পুরল তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ীতে ফিরে এল।

বাড়ীতে প্রবেশ করে সোজা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে, শীতল জলে গা ধুয়ে সোফায় এসে বসল তারপর আয়েস করে একটা চুরোট ধরাল। যদি প্রয়োজনে লাগে সেরকম কিছু জিনিস সাথে নিল, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে রজারসের ব্যাপারটা চিন্তা করতে লাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল—মাথাটা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রতিভাধর এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ওয়ালরোথ রোডে রজারসের প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা আছে, একথা জোনস শুনেছে। বাড়ীটা পুরণো আমলের এবং জীর্ণ, ধূসর মলিন চেহারা। সর্বদাই বাড়ীটার জানালা দরজা বন্ধ থাকে এবং ওই বাড়ীটার থেকেও, কথাটা মনে আসতেই জোনসের বেশ মজা লাগল, সেই একই সামন্তযুগীয় নোনাধরা গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

ওই বাড়ীটারই এক প্রান্তে থাকে ওরাবোনা এবং জোনস এটাও শুনেছে, ওই বাড়ীটার চিরন্তন অর্গলবদ্ধ কামরাগুলোতে এমন সব নিষিদ্ধ ব্লাসফিমেস, অজ্ঞাত দুর্জ্ঞেয় তন্ত্রমন্ত্রের বই ও মোমের মূর্তি রয়েছে যেগুলো নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং ভুলেও সেসব মিউজিয়মে নিয়ে যায় না রজারস।

সেদিন রাতেই, ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা বাজে, জোনস এসে উপস্থিত হল বেসমেণ্টের কাছে, যেখানে অন্ধকারে ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে রজারস।

জোনসকে দেখা মাত্রই হলদে দাঁতগুলো বের করে রজারস হেসে উঠল। তাদের মধ্যে কিছুর কথার আদান-প্রদান হল, তার মধ্যে একটা কথা বেশ স্পষ্ট বোধগম্য হল, আজকের সমস্তটা রাত জোনসকে বেসমেণ্টের এই যাদুঘরে একাকী জেগে থাকতে হবে।

ভেতরে প্রবেশ করে এ্যালকোভের পাশে প্রধান প্রদর্শনী হলঘরটার এককোণে একটা আসন গ্রহণ করল জোনস। নিমেষের মধ্যে ঘরের সব বাতি নিভিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে তুলল রজারস—তার কারখানা কামরার সুইচ বোর্ডের সুইচ টিপে। এখন প্রয়োজন হলেও জোনস সুইচ টিপে ওঘরের আলো জ্বালাতে পারবে না।

সারারাত জেগে থাকার জন্য জোনস যে ঘরটায় বসেছিল সে ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিল রজারস। জোনসের কানে স্পষ্ট ভেসে এলো রজারসের ভারী চাবি গোছাটা নাড়ার শব্দ। একটু পরই তার পদশব্দ মিলিয়ে গেল বেসমেণ্টের সিঁড়ির বাইরের দরজায় এবং দরজাটার গায়েও ভারী তালা লাগাবার কর্কশ, রুক্ষ শব্দটা শুনতে পেল জোনস। তারপর একসময়ে রজারসের পদ শব্দ উঠোন ছড়িয়ে পাথর পটি বসান জীর্ণ পথটায় মিলিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে জোনস চুপটি করে বসে রইল।

মুহূর্তের মধ্যেই জোনস ব্যাপারটা অনুভব করল। তার সামনে এগিয়ে আসছে জঘন্য কালো অন্ধকার লম্বা এক রাত—হারিয়ে যাওয়া এক আদিম কাহিনী যেন অক্টোপাশের মতন জড়িয়ে রেখেছে সেই অন্ধকার রাতকে আর তার বিনিদ্র জাগরণের এই ক্লান্তিক্ষরা সময়টায়, পলকটা হীরের মতন উজ্জ্বল তার চোখ দুটো কোন কিছু দেখবার আশায় হয়ত নিরাশ হয়েই মলিন বিবর্ণ হয়ে যাবে এক সময়ে ভোরের নতুন আলোক রশ্মির ছোঁয়ায়।

॥ চার ॥

হঠাৎ চমকের ফলে জোনসের চিন্তা-জাল ছিন্ন হয়ে গেল, জানে না এইভাবে বসে সে কতক্ষণ ধরে চিন্তা করে যাচ্ছে।

পিচের মত কালো অন্ধকার তার চারপাশে রাজত্ব বিস্তার করে রয়েছে। খিলান আবৃত বেসমেণ্টের অন্ধকার ঘরগুলো যেন তার চোখের সামনে একাকার হয়ে গেছে। তার সেই সহজ সরল কৌতূহলী মন কিংবা হঠকারীতা, যার জন্যে এই জঘন্য পাতা যে যাদুঘরটায় এসে রাত কাটাতে হচ্ছে তাকে, খুব একচোট গালমন্দ করল তাকে জোনস।

প্রথম দিকে, রজারস চলে যাবার পর জোনস পকেটে রাখা টর্চটা বের করে বেশ খানিকক্ষণ জালিয়ে রেখেছিল। তারপর দর্শকের যে আসনে সে বসে আছে সেখানেই অন্ধকারে চুপটি করে বসে চিন্তা করছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় এসে ভীড় জমাচ্ছিল। তারপর আবার টর্চের বোতাম টিপে তার আলো ফেলল এ্যালকোভ আর মূর্তিগুলোর ছোট ছোট মঞ্চের দিকে।

তার চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই সব মূর্তি, অসুস্থ বিকৃত আর বীভৎস মূর্তিগুলো, খুনী ল্যাড্রু, অনামী এক দানব, গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার-পিশাচ, নারীর হাতকাটা নরখাদক এক ডাকাত, স্কটল্যাণ্ডের পিশাচ-মানুষ, অর্দ্ধেক পোড়া যুবতী ডাইনী, একটা গিলোটিন, ফাঁসীর মঞ্চ, কুড়ুলের কোপে একটা স্কোয় নারীর শিরচ্ছেদ করছে ভয়ঙ্কর চেহারার এক মোহিকান এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক মূর্তি।

মূর্তিগুলো যেন জোনসের দিকে বিশীর্ণ রক্তাক্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। তারপর সেই কাটা মুণ্ডুটা ধড় থেকে সামান্য বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তের ঢল বইয়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ দেহে,—একেবারে ঠিক গিলোটিনের পাশেই একটা ঝুড়িতে রয়েছে কয়েকটা কাটা মাথা, গিলোটিনের ব্লেড থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে সেই ঝুড়িতে—জোনস যেন আর একবারের জন্য শিউরে উঠল। তারপর নিজেকে সামলানোর জন্য টর্চ নিভিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখল।

যদিও সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, এই সব ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলো এই

অন্ধকারে সত্যিই প্রাণ ফিরে পাবে না। কিন্তু তবুও সে স্থির করল, আর ঐ বীভৎস মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবে না।

কেন সে রজারসের সঙ্গে এ ধরণের ঠাট্টা করতে গেল একথা ভেবে তার মন দুঃখে ভরে উঠল। রজারস তার বাড়া ভাতে ছাই ফেলেনি, কিংবা ধরে নিচ্ছি রজারস তাকে প্রলুব্ধ করেছিল, কিন্তু তাই বলে আগকরিয়ে দিয়ে এরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়া তার ঠিক হয়নি। রজারস নীরবে যেমন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তেমনি চালাত, তার চেয়ে বরং সে যদি একজন মানসিক রোগের ডাক্তারকে রজারসের চিকিৎসার জন্য ডেকে আনত সেও অনেক ভাল হত।

খুব সম্ভবতঃ নিজে একজন আর্টিষ্ট বলেই হয়ত রজারসের ব্যাপারে কিছুটা অদ্ভুদার নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল সে। রজারসকে সাহায্য করতেই চেয়েছিল জোনস।

গোটা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ার ফলে প্রকৃতিতে যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বজায় রইল আর সেই নীরবতার মধ্যে জোনস একটা জড় পদার্থের মত দর্শকের আসনে বসে রইল।

সে অনড়ভাবে বসে আছে, কোনরকম হাঁসফাঁসানি নেই, কেবলমাত্র তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ সেই নীরবতার মধ্যে অদ্ভুতভাবে জেগে উঠেছে আর সেই সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনাগুলোকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিশ্রী অন্ধকারের স্রোতের দিকে।

তারপর বাতাসে জেগে উঠল খুব দূর থেকে ভেসে আসা একটা ঘণ্টার শব্দ। সেই ঘণ্টার শব্দ রাতের নীরবতাকে ভঙ্গ করে ঘন অন্ধকারের বুক চিরে যেন বেসমেণ্টের পাতালের ঘরগুলোয় ঢুকে তার হৃদয়ে মুহূর্তের জন্য একটা দোলা দিয়ে গেল এবং জোনস হঠাৎ যেন খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে, এই ঘড়িটাও তার মতন সারা রাত জেগে থাকবে এবং প্রহরে প্রহরে জানিয়ে দেবে রাত কটা বাজল।

এই অন্ধকারে ডুবে থাকা যাদুঘরটা যেন একটা সমাধি মন্দিরের মতনই— শহরের বহু দূরে যেখানে মানুষ বাস করে না সেখানে বিরাজ করছে। ঠিক এই মুহূর্তে, এই গা ছমছমে নীরব অন্ধকারের মধ্যে, একটা ইঁদুরের সঙ্গ পেলেও সে খুশী হবে, যদিও রজারস তাকে খুব অহঙ্কারের সঙ্গেই জানিয়েছিল যে কোন 'অজ্ঞাত কারণে', যে কারণটার কথা খুব কৌশলেই এড়িয়ে গিয়েছিল সে।

নেংটি ইঁদুর কিংবা পোকারাও এই যাদুঘরের ছায়া মাড়ায় না, ভেতরে ঢোকা তো দূরের কথা ! ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক এবং সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। এরকম একটা জীর্ণ পুরোণ বাড়ির ভূগর্ভের ঘরগুলোয় সত্যিই কোন ইঁদুর বা পোকামাকড়ের নাম গন্ধও নেই। বরফের মত ঠাণ্ডা এবং নীরব এই জমাট অন্ধকার তার চোখে অভ্যস্ত হতে যতক্ষণ সময় লাগবে তার মধ্যে দু-চারটে শব্দ শুনতে পেলেও সে শান্তি পেত। কেবলমাত্র শব্দ শোনা ছাড়া সে এখন আর কিছুই চায় না। মৃদু কোন শব্দ কিংবা তার চেতনাকে সজীব রাখতে পারে এমন কোন দূরাগত অচেনা শব্দ, ঠিক ওই ঘণ্টার শব্দের মতনই অথবা এই অন্ধকার সমাধি প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে থেকেই জেগে ওঠা কোন অচেনা শব্দ হোক, জোনস মনে-প্রাণে এখন সেটাই কামনা করছে।

অসহ্য এই নীরবতাকে ভঙ্গ করার জন্য সে মেঝের উপর জুতো দিয়ে বার কয়েক ঠোক্কর মারল, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সেই শব্দের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরে এল তার কাছে। দূরাগত সেই ঘণ্টার শব্দ রাত বারোটা বাজার ইঙ্গিত জানিয়েছিল তাকে, এখনও সারারাত পড়ে আছে সম্মুখে।

ইচ্ছা করেই জোনস একবার কেশে উঠল, আর সাথে সাথেই সেই শব্দটা একটা বাঁকা বিশ্রী বিদ্রূপের মতন প্রতিধ্বনি হয়ে তার কাছে ফিরে এল।

সে যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল, চেতনাকে অসাড় করে দিতে চাইল এবং সেই মুহূর্তেই জোনস অনুভব করল, সে যেন মনে মনেও কোন কথা আউড়ে যেতে পারছে না। তবে কী তার স্নায়ুগুলো অসাড় হয়ে গেছে? কিছুতেই যেন তার সময় কাটতে চাইছে না, খুব ধীর গতিতে মৃতপ্রায় রোগীর নাড়ীর স্পন্দনের মতনই সময় কাটছে।

জোনস প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারে, সে প্রথম যখন তার ঘড়িতে টর্চের আলো ফেলেছিল, ঠিক তখন থেকেই ঘড়ির কাঁটা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, নাহলে এতটা সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দূরাগত ওই ঘণ্টার শব্দে মধ্যরাতের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কেন?

জোনস বুঝতে পারল তার কালো চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতন জ্বলছে।

বেসমেন্টের ঘন আলকাতরার মতন অন্ধকারে যেন টুকরো টুকরো আলোর দাগ শূণ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে প্রায় নিবিষ্ট মনে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা আলোর রশ্মিও যেন বেরিয়ে এসেছে তার মনের অবচেতনার

অতলান্ত গভীর থেকে আর সেই রশ্মিটা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে ওই আলোর দাগগুলোকে বুকে নিয়ে।

পার্থিব আলো এটা নয়, অনুভব এবং চেতনার তীব্রতা থেকে, অজানার রহস্যকে জানাবার জন্যেই মানুষের মনের অন্তস্থলে রয়েছে এই গোপন আলোর উৎস।

একটা জড় পদার্থের মতন বসে জোনস বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল সেই আলোর দাগগুলোকে, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ওগুলো, কখনও জোনাকী পুঞ্জ হয়ে, কখনও চূর্ণ তারার মতন চুমকী ছড়িয়ে, কখনও পলকটা হীরের মতন দ্যুতি ছড়িয়ে।

এবার সে বাতাসে নোনা গন্ধ পেল। কফিনের মধ্যের ঠাণ্ডা গন্ধের মতন, সোরা জমান নোনাধরা, ধূসর ক্ষীণ কতগুলো শতাব্দীর সূক্ষ্ম গলিত গন্ধ যেন। সে বেশ উত্তেজনা বোধ করল। আর তার সঙ্গে টের পেল হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন তাকে শীতল করে দিয়ে গেল।

কিন্তু সেটাই বা সম্ভব কি করে? তার পরিষ্কার মনে পড়ছে, বেসমেণ্ট-এর কোন জানালা দরজাই খোলা নেই, তাহলে ঠাণ্ডা হাওয়াটা এল কোথা দিয়ে? তবে কী অন্ধকারে দরজা খুলে কেউ প্রবেশ করেছে? কিন্তু সেটাও তো অসম্ভব ব্যাপার? অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জোনস ঠিকই তবে এটুকুও জোর-দিয়ে বলতে পারে এই অতলস্পর্শ অন্ধকার স্তব্ধতার রাজ্যে সে কোন তালাবন্ধ দরজা খুলবার বিন্দুমাত্র শব্দও পায়নি।

হাওয়াটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা—তার সঙ্গে মিশে আছে একটা নোনা স্বাদ; যেন এই পাতালঘরের নিচেই রয়েছে লবনাক্ত এক গুপ্ত ঠাণ্ডা প্রস্রবন, কোন ছিদ্র দিয়ে বাষ্পের মতন উঠে এসেছে উপরে। সেই সঙ্গে একটা দুর্গন্ধ, অনেকটা চিড়িয়াখানার হিংস্র জন্তুর খাঁচায় অনেকদিন ধরে জমে থাকা পচা এক গন্ধের মতন সেই শীতল হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে তার নাকে প্রবেশ করল।

গন্ধটা কী তবে ওই মোমের প্রতিমূর্তিগুলো থেকে এসেছে? দিনের আলোয় যখন সে মূর্তিগুলোর কাছে গিয়েছিল, কই তখন তো এধরণের কোন গন্ধ সে পায়নি বরং এখনও তার মনে হচ্ছে, গন্ধটা ওই মূর্তিগুলোর থেকে মোটেও আসছে না।

তার এই দুর্বল হয়ে যাওয়া স্নায়ুতেও হঠাৎ মনে পড়ল, ঠিক এমনি ধরনেরই একটা গন্ধ সে পেয়েছিল বিখ্যাত এক ন্যাচারাল হিষ্ট্রির যাদুঘরে ঘুরতে গিয়ে।

প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় একটা ম্যামথ-এর কঙ্কালের কাছে যাওয়া মাত্রই সে এধরণের একটা সূক্ষ্ম গন্ধ পেয়েছিল।

কিন্তু, কিন্তু কী অদ্ভুত গা কাঁপানো নিষ্ঠুর এই স্তব্ধতা এবং অন্ধকার! এছাড়াও, দূর থেকে ভেসে আসা সেই ঘন্টার ধ্বনি শব্দ আবার যখন সে শুনতে পেল, তখন মনে হল ঘন্টার ওই স্বর যেন মহাকাশের ওপারের কোন অচেনা গ্রহ থেকে ক্রমবিলীয়মান ক্ষীণ হয়ে পৌঁছচ্ছে পাতাল যাদুঘরের এই নিঝুম পরিবেশে।

জোনস মস্তবড় এক হাই তুলল।

আর তখনই তার মনে পড়ল সেই ফটোটার কথা, যেটা রজারস তাকে সন্ধ্যের পর দেখিয়েছিল।

মেরুর এক অজানা স্থলে একটা ধ্বংসস্তূপের তলায়, তিন লক্ষ বছর আগে যেখানে ছিল সাইক্লোপিয়ান নামক এক বিচিত্র শ্রেণীর মানুষেরা, লম্বায় দৈত্যের মতন, কপালের মধ্যভাগে রয়েছে বড় একটা চোখ, একচক্ষু দৈত্য, আর সমস্তকিছুই মানুষের মতন।

সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে বিরাট উঁচু পাথরের সিংহাসনে বসে আছে দশ ফুট উঁচু একটি মূর্তি, সেখানে ওরাবোনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল রজারস।

সত্যিই হয়ত রজারস গিয়েছিল সেই সুদূর উত্তরে, কিন্তু তবুও মনে হয় ছবিটা কোন চাতুরীময় মঞ্চদৃশ্য থেকেই তোলা। এ বিষয়ে জোনসের মনে কোন সন্দেহ নেই। চতুরতায় আর কৌশলতায় রজারসকে হারানো মুস্কিল। যদিও ফটোতে সেই সিংহাসনের খোদাই করা প্রতীকী চিহ্নগুলো এইবনের 'নেকরোনেমিকন' পুঁথির চিহ্নের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে এবং প্রতীকগুলো বিভীষিকার ইঙ্গিতই বয়ে আনছে, তবুও ফটোর ব্যাপারটা আগাগোড়াই অবাস্তব।

ফটোর ওই দৈত্যের মতন চেহারার মূর্তিটা যেটা সিংহাসনে বসেছিল বলে রজারস বলেছে এবং ছবিও সেটাই জানাচ্ছে, ওটাকে নিয়ে রজারসের এই উন্মাদনার কারণ কী থাকতে পারে?

সহসা জোনস চমকে উঠল যখন তার স্মরণে এল প্যাসেজের ওই অন্ধকার প্রান্তে ওয়ার্করুমের ঠিক পাশেই তালাবদ্ধ বিরাট ঘরটার ভেতরে সেই মূর্তিটা রয়েছে।

অদ্ভুত নিপুণতায় বিন্দু বিন্দু বিস্ময় দিয়ে হয়ত ওই মোমের মূর্তিটা তৈরী

হয়েছে, যেটা নাকি দেখতে কুশ্রী এবং ভয়াবহ। এই মুহূর্তে জোনস ওই প্রতীক চিহ্নের তালাবদ্ধ ঘরটার খুব কাছেই রয়েছে! কিন্তু এখন যে ঘরটায় বসে আছে এবং তার সামনের মঞ্চগুলোয় যে মূর্তিগুলো রয়েছে সেগুলোই বা হিংস্রতা, আতঙ্ক আর বিভীষিকা জাগাতে কম কী? একটা লোক নাকি এঘরে রাত কাটাতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ জোনসের কানে ভেসে এল, অন্ধকার মঞ্চের উপর গিলোটিনটার থেকে যেন মৃদু একটা কিচ কিচ্ শব্দ—যেন ওটার মরচেধরা ধারাল ব্লেডখানা বেশ কষ্টের সঙ্গে নীচে নেমে আসছে? গোঁফ দাড়িওলা লানড্রু, যে লোকটা তার পঞ্চাশটি প্রণয়িনীকে হত্যা করেছিল, তার মূর্তিটা যেন শরীরকে টান করে অন্যদিকে ফিরল, আর মাদাম দেমার, যার মথাটাকে কুড়ুলের কোপে দেহ থেকে আলাদা করা হয়েছিল, তার একটা হাত যেন অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়ে ঝুড়ির কাটা মুণ্ডুগুলোর থেকে নিজের মাথাটা তুলে আনতে চাইছে। তারপর সেই কাটামাথাটা, ধড় থেকে যেটা অর্দ্ধেক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার গলার কাছে থেকে রক্তস্রোত এবং সেই রক্তের বুদ্‌বুদ্ হয়ে ফেটে যাবার কুশ্রী শব্দটা স্পষ্ট শুনল জোনস।

ভয়ে আতঙ্কে জোনস চোখ বুজে ফেলল, কিন্তু সেই রশ্মিটা, যেটা আলোর দাগগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অন্ধকার ঘরের শূন্যে, সেটা এবার তার বন্ধ চোখের ভিতরে গিয়ে যেন ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল, জোনাকীর মতন খেলা শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে আধপোড়া ডাইনী মেয়েটির বীভৎস মুখটা জেগে উঠল তার কল্পনায়, রক্ত বুদ্‌বুদের ফেটে যাওয়ার শব্দ আরও তীব্র হয়ে উঠল এবং সে যেন তার মানস চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল মুণ্ডুহীন দুটো ধড় ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঝুড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের কাটা মুণ্ডু দুটো তুলে আনল।

মুদ্রিত নয়নে, প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বার বার জোনসের চোখে একই দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল। তার সাথে ফাঁসীমঞ্চটা থেকে ধপাস্ করে কোন কিছু পড়ে যাবার শব্দও ভেসে এল তার কানে এবং গিলোটিনের কিচ্ কিচ্ শব্দটাও একনাগাড়ে হতে লাগল।

জোনস আর স্থির থাকতে পারল না, অন্ধকারেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ততঃ মিনিট কয়েকের জন্য সে এ স্থান ত্যাগ করতে চায়। সেই সঙ্গে এই বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলোর হাত থেকেও রেহাই পেতে চায়।

জোনস টর্চ জ্বালিয়ে দ্রুত এ্যালকোভের দিকে এগিয়ে চলল। যদিও, এই সব

ভয়ার্ত দৃশ্যগুলো তাকে কিছুই তেমন করেনি। কিন্তু তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই হিমশীতল হাওয়াটা, যেটা তার নাক ছুঁয়ে গিয়েছিল এবং যে হাওয়ায় মিশ্রিত ছিল প্রাচীনকালের এক লোমশ জান্তব দুর্গন্ধ, সেটার কথা মনে আসতেই জোনস এ্যালকোভের এদিকটায় এসে পড়ল।

এ্যালকোভের ঢাকা দেওয়া ক্যানভাসের গায়ে সে টর্চের আলো ফেলল—প্যাসেজের ওদিকটায়, ওয়ার্করুমের তালা দেওয়া দরজার উপর। তারপর আপনমনেই বিড় বিড় করে উঠল একবার। ঘুরে দাঁড়াল! আবার চলতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে বসে পড়ল তার আগের জায়গায়।

জোনসের দু'চোখ মুদ্রিত। কিন্তু সেই দৃশ্যগুলো, আরও জঘন্য আরও মারাত্মক হয়ে আলোর রশ্মিটার বুকে যে দাগগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছিল, তারই ভেতরে আবার ভেসে উঠতে লাগল তার মনের ভিতরে।

আবার দূর থেকে ভেসে এল সেই ঘণ্টার শব্দ।

রাত একটা বাজে! জোনস অবিশ্বাস্য দৃষ্টি মেলে, টর্চের ফোকাস ফেলল তার ঘড়ির উপর, সত্যিই ত' ঘড়িতে এখন একটাই বাজে। তাহলে ভোরের আলোর মুখ দেখতে হলে এখনও অনেক বাকী। এখনও দীর্ঘ সময় এভাবে বসে রাত কাটিয়ে তবে ভোরের মুখ দেখতে পাবে। সকাল আটটা হলে তবেই রজারস এখানে আসবে তার আগে নয়, আর ওরাবোনা আসবে তারও অনেক বাদে।

কিন্তু ওদের এখানে পদার্পণ করার অনেক আগেই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলোক রশ্মি, গেবলঅলা জীর্ণ অট্টালিকাগুলোর চূড়োয় চূড়োয় আছড়ে পড়বে সোনালি রোদ, কিন্তু যাদুঘরের এই বেসমেন্ট ঘরগুলোয় তখনো রাজত্ব চালাবে অন্ধকার। বাইরের আলো যেন এখানে ঢুকতে ভয় পায়।

কেবল মাত্র ওই রঙীন অর্দ্ধচন্দ্রাকার জানালা তিনটে, বাইরের পাথুরে জংলা উঠোনটার দিকে যে জানালা তিনটে রক্তাক্তচোখে তাকিয়ে থাকে সর্বদা, কেবল সেই জানলাগুলোর বিবর্ণ রঙীণ কাচের মধ্য দিয়ে অতি সামান্য এক চিল্তে আলোক রশ্মি এসে পড়বে এ্যালকোভের দিকটায়।

কেবলমাত্র এই জানালা তিনটে ছাড়া বাদবাকি সব জানালাগুলো ইটের গাঁথুনী দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে রজারস।

যুদ্ধে আহত রুগ্ন অসহায় এক সৈনিকের মতই লাগছিল নিজেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই, জোনস জোরালো কণ্ঠে বলতে পারে যেন অদৃশ্য কোন কিছুর, মন্থর আর চুপি চুপি পায়ের একটা শব্দ, প্যাসেজের পাশের ওয়ার্করুমের দিক থেকে কানে এসে পৌঁছল তার। চোরের মতন সতর্ক পা ফেলে কে যেন ওদিকটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এটা যদি তার স্পর্শকাতর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন হ্যালুসিনেসনই হয়ে থাকে তাহলেও সে শপথ করে বলতে পারে, ঠিক দ্বিতীয়বার সেই পদশব্দ আবার কানে ভেসে এল।

সত্যি কথা বলতে কি, রজারস যে বিস্ময়কার সাইক্লপিয়ান আদিম দেবতার মূর্তির কথা বলেছে তাকে এবং ওই তালাবন্ধ বিরাট ঘরটার মধ্যে যে মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তির সঙ্গে তার আজকের এই রাত কাটানোর ব্যাপারটার মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই এবং যদিও ওই ব্লাসফিমেস কলুষিত মূর্তিটার জন্যে রজারস গর্ব বোধ করে, তবুও জোনস ভালভাবেই জানে, মূর্তিটা ওয়ার্করুমে নেই—ওটা আছে ওই তালাবন্ধ ভারী দরজার ঘরটার মধ্যে। কাজেই একটু আগে যে ক্ষীণ পদশব্দ সে শুনেছে সেটা তার মনেরই কোন উর্বর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু, কয়েক সেকেণ্ড পার হতেই যখন সে পরিষ্কার শুনতে পেল কে যেন ওয়ার্করুমের দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে তখন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সে টর্চের আলো ফেলল কিন্তু ওয়ার্করুমের দরজায় কিছুই দেখতে পেল না। ছয় প্যানেলের তালাবদ্ধ বিরাট দরজাটা তেমনিই বন্ধ রয়েছে এবং টর্চের আলোয় জ্বল জ্বল করছে প্রতীক চিহ্নগুলো।

টর্চের আলো নিভিয়ে দিল, নেমে এল অন্ধকার, আবার সে চোখ বন্ধ করল। প্রহেলিকার মতন সেই শব্দটা আবার জেগে উঠল, কিচ কিচ্। কিন্তু এবার আর শব্দটা গিলোটিন থেকে এল না, সেটা ছিল তালার গর্তে চাবি ঘোরানোর শব্দ এবং শব্দটা আসছে ওয়ার্করুমের দিক থেকেই। কথায় বলে না, "নিস্তব্ধ অন্ধকারে সুঁচ পড়লেও সে শব্দ শোনা যায়, তার থেকেও স্পষ্ট শব্দটা কানে ভেসে এল তার।

জোনসের গলা দিয়ে আর্তচীৎকার বেরিয়ে আসছিল আর কি, কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সংযত করল সে কারণ ভয়ে, আতঙ্কে একবার যদি সে চীৎকার করে ওঠে তাহলেই শেষ তার। নিষ্ঠুর এক ভয়ের আতীব্র আশ্লেষে সে শেষ হয়ে যাবে।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল জোনস সতর্ক কান পেতে।

ভেসে এল একটা খসখস্ খস্‌খসে শব্দ এবং শব্দটা ক্রমাগত এই প্রদর্শনী হলের দিকেই এগিয়ে আসছে।

জোনস মেরুদণ্ড সোজা করে, নিজেকে বেশ শক্ত করে, সেই শক্তির আবেগকে আপন মুঠোয় সংহত করে বসে রইল। সে কোন ক্রমেই এই সংহত শক্তিকে হারাতে চায় না তাছাড়া সত্যি বলতে কী এই সাহস ও শক্তিটা ছিল বলেই, এত রাত পর্যন্তও সে এই নরকের পাষাণ স্তব্ধ অন্ধকারে একা জেগে থাকতে পেরেছে।

ক্রমশই প্যাসেজের দিক থেকে শব্দটা নিকটবর্তী হচ্ছে, চোরের মতন সতর্ক পা ফেলে কিংবা হিংস্র পশুর মতন হামাগুড়ি দিয়ে মিশমিশে অন্ধকারে শব্দটা এদিকেই আসছে আর জোনস হঠাৎ বুঝতে পারল তার সেই সংহত শক্তির কিছুটা কেউ যেন জোর করে কেড়ে নিল। যদিও ভয়ে সে চিৎকার করে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই কিছুটা চ্যালেঞ্জের মতন স্বরেই তার গলা কাটিয়ে এক শুকনো তীক্ষ্ণস্বর বেরিয়ে এল সেই মুহূর্তে।

—কে হাঁটে ওখানে, কী তোমার পরিচয়, কী জন্যে এসেছো তুমি?

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না, আগের মতই সেই অস্বস্তিকর খসখসে খসখসে শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে।

এই মুহূর্তে কি করা উচিত জোনস স্থির করতে পারল না. সে কী টর্চের আলো ফেলবে ওই-এগিয়ে আসা অপার্থিব জিনিষটার দিকে নাকি চুপটি করে বসে থাকবে এই অন্ধকার ঘরে?

সেই সন্ধের পর থেকে এই মিউজিয়মে মোমের ভয়ঙ্কর সব প্রতিমূর্তি কিংবা অন্য যেসব বীভৎস ব্যাপার দেখেছে সে. পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সেসব থেকে ভিন্ন ওই ঘষড়ে আসা জিনিসটা, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কোন আলাদা জিনিস।

প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল সে এবং সেই সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার আঙুলগুলো। শারীরিক পেশী সংকোচনের ফলে মাঝে মাঝে দেহটা কেঁপে উঠতে লাগল, দ্রুততর হল ওষ্ঠবিক্ষেপ।

এই অন্ধকার পরিবেশে সে যেন আর থাকতে পারছে না বিশেষ করে ওই অপার্থিব বীভৎস শব্দটা এ্যালকোভ পার হয়ে প্রধান প্রদর্শনী হলের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসার পর থেকেই।

ধৈর্য্যের সীমা হারিয়ে আবার সে চীৎকার করে উঠল ফের। প্রলাপবকা রোগীর চীৎকারের মতন সেই কণ্ঠস্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল!

—আর একপাও এগিওনা, থামো বলছি! কে তুমি? কে ওখানে?

শব্দটা অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ সে টর্চের আলো ফেলল সেই দিকে, বিদ্যুৎ-চমকের মতনই হঠাৎ। আর সেই মুহূর্তেই যে দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল, হতবুদ্ধিকর বীভৎস এক দৃশ্য, হাত থেকে পড়ে গেল টর্চটা এবং মাত্র কয়েকবারের জন্যেই নয়। ক্রমাগত চীৎকারধ্বনিতে ভরিয়ে তুলল সে মিউজিয়মের সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরগুলো।

টর্চের ফোকাসে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, একটা কিম্ভূত আকারের বিশাল প্রাণী হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মিশমিশে কালো গায়ের রং, চেহারা বনমানুষের মতন নয় আবার পতঙ্গদের মতনও নয়—অথচ বিশাল প্রাণীটার চেহারা এই দুটোর সংমিশ্রনেই গঠিত।

টর্চের আলোয় প্রাণীটাকে ক্ষণিকের একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতন দেখিয়েছিল কিন্তু সেই দৃশ্যই জোনসের চোখে এমন বীভৎসরূপ নিয়ে ফুটে উঠছিল যাতে মনে হয়েছিল প্রাণীটার দেহ যেন কালো লোমস কম্বলের মতন চামড়ায় আবৃত এবং জায়গায় জায়গায় ঝুলে পড়ছে সেই চামড়া, মরা মানুষের মতন স্থির নিষ্ঠুর দুটো চোখ, মদ্যপায়ীদের মতন এদিকে ওদিকে দুলছে মাথাটা, চার পায়ের প্রসারিত থাবার তীক্ষ্ণ নখরশাণিত উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জঘন্য এক হত্যার ফন্দি এঁটেই প্রাণীটা জোনসের দিকে এগিয়ে আসছে।

জোনসের সেই তীব্র আর্তনাদ অন্ধকার ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তেই এবং হাত থেকে টর্চ পড়ে গিয়ে আলো নিভে যেতেই সেই বীভৎস প্রাণীটা প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোনসের ঘাড়ের উপর এবং তখনই শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে জোনস লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। অন্ধকারে কোন সংঘর্ষের শব্দই জাগল না কারণ জোনসের চেতনা তখন একেবারেই লুপ্ত।

ঘোর অন্ধকার। যেন কোন বিলুপ্ত যুগের এক ম্যমীগন্ধী শীতল অন্ধকার চিরকালের মতন বাসা বেঁধেছে এই পাতাল মিউজিয়মের ঘরগুলোয়। আর তখনই বাতাসে জেগে উঠল তীব্র গতিতে ভারী কোন জিনিসকে ঘষড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা শব্দ।

শব্দটা আর কিছুরই নয়, সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা জোনসের অবসন্ন দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা শব্দ।

জোনসের অসাড় দেহ এমন একটা জিনিস স্পর্শ করল, যাতে নিমেষের মধ্যেই তার চেতনা ফিরে এল এবং সাথে সাথেই শুনতে পেল প্রাণীটা গর্জনের সুরে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ করে উঠছে—প্রায় অস্পষ্ট বোধগম্য নয় এমন সব শব্দ।

জোনস উৎকর্ণ হয়ে শুনল। সে প্রায় চমকেই উঠল, কারণ শব্দগুলো মানুষের কণ্ঠস্বরের মতনই এবং যে ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারে ওই বিচিত্র দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর তার খুবই পরিচিত। একমাত্র জীবিত কোন মানুষের পক্ষেই এভাবে ভাঙা ভাঙা রুক্ষ বিকৃত ভয়ঙ্কর গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করা সম্ভব।

……আইয়া! আইয়া! পাহাড়ের দেয়ালে প্রতিধ্বনি-জাগা ঠিক নেকড়ের গর্জনের মতনই সেই শব্দগুলো শোনাল, শোনো রান টেগোথ, আমি আসছি! অবশেষে আমি তোমার পুষ্টির জন্যে শিকার পেয়েছি: তুমি অনেকদিন যাবৎ অতৃপ্ত রয়েছ এবং আমিও তোমাকে তোমার উপযুক্ত কিছু দিতে পারিনি। অথচ তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তোমার পুষ্টি এবং তৃপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ আত্মদানের ব্যবস্থা শীঘ্রই করব আমি! তোমার অস্তিত্বকে ও অবিশ্বাস করছে। ওরাবোনার চেয়েও ও বেশী অবিশ্বাসী, তুমি ওকে চূর্ণ করে সব রক্ত আর মজ্জার রস শুষে নাও! তারপর ওর সেই শুকনো চিমসে দেহটার উপরে মোমের প্রলেপ লাগিয়ে এমন প্রতিমূর্তি গঠন করব আমি যে পৃথিবীর মানুষ সেই দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে রাণ টেগোথ! মানুষের ধ্যানধারণায় প্রায় অসম্ভব এবং অদৃশ্য হে আদিম দেবতা, অনেক দিন তুমি উপোসী রয়েছ তাই আমি তোমার কাছে নিবেদন করছি এই নধর শিকার, রক্ত মাংসে গড়া নাদুস-নুদুস চমৎকার এক শিকার। তোমার প্রধান পূজারী হিসাবে এটাই আবার শ্রেষ্ঠ নিবেদন! এখুনি তোমাকে নিবেদন করব প্রচুর রক্ত আর অস্থিমজ্জার রস এবং সেই সঙ্গে আমার প্রার্থনা এই, তুমি আমাকে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী কর। আইয়া! সার নিগ্‌গুরাথ্‌! আইয়া!

গর্জনের সেই ভাষা থেমে যেতেই জোনসের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের বিভীষিকাটা যেন একটা পুরানো পরিত্যক্ত আবরণেরই মতই খসে পড়ল।

সেই সংহত শক্তির আবেগ, যেটাকে কেউ কেড়ে নিয়েছিল, সেই শক্তি যেন আবার তার মধ্যে ফিরে এল এবং আপন মুঠোয় সেই শক্তিকে আঁকড়ে ধরে এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার শরীর।

সে স্পষ্ট উপলব্ধি করল, প্রাণীটা আসলে কোন দানব নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক

একটা উন্মাদ ছদ্মবেশে রয়েছে ওই বীভৎস দানব-চেহারার আড়ালে। সে হল রজারস। ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মতন, তারই কল্পিত কোন মূর্তির চামড়ার আবরণে নিজেকে আড়াল করে, তাকে ভয় দেখিয়ে অচেতন করে তার দেহটাকে ও নিবেদন করতে চায় ওই সাইক্লোপ আদিম দেবতার কাছে, যে দেবতার আসুরিক এক প্রতিমূর্তি লুকান আছে প্যাসেজের ছায়ান্ধকার কোণের দিকের তালাবন্ধ ঘরটার মধ্যে।

জোনসের কাছে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হলো। তার ধারণা নুড়ি পাথরে ঢাকা জংলা উঠোনটার সেই মরচে ধরা দরজা দিয়েই সে মিউজিয়ামে প্রবেশ করেছিল, তারপর ওয়ার্করুমে ঢুকে ছদ্মবেশ ধারণ করে, অন্ধকারে গুড়ি মেরে এগিয়ে এসেছিল তার যাদুঘরে, আগন্তুক সরল বিশ্বাসী, ভীত সন্ত্রস্ত অথচ কৌতূহলী যুবকটির কাছে।

তার যে জ্ঞান ফিরে এসেছে এটা যাতে রজারস বুঝতে না পারে এ জন্যে সে মৃত একটা পশুর মতন মেঝেতে লেপ্টে পড়ে রইল, আর সেই সঙ্গে মনকে শক্ত করল।

মেঝের উপর দিয়ে তাকে ঘষড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দটা এতক্ষণ রজারসের কণ্ঠস্বরে ডুবেই গিয়েছিল। এবার শব্দটা আবার স্পষ্ট হল এবং জোনস যখন উপলব্ধি করল তার শরীর একটা গোবরাটের শক্ত কাঠে লেগে ঠেকেছে, তখনই বুঝল রজারস তাকে ওয়ার্করুমের অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকার ওয়ার্করুমে প্রবেশ করতেই রজারসের হাতের মুঠি খানিকটা আলগা হতেই, ছাড়া পাওয়া একটা নেকড়ের মতন জোনস লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রজারসের দেহের উপর।

আচমকা এরকম আক্রমণে রজারস ঘাবড়ে গেল, সুযোগ সন্ধানী জোনস নিমেষের মধ্যে চামড়ায় আবৃত তার গলার দিকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল তারপর সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরল রজারসের কণ্ঠনালী।

মুহূর্তের মধ্যেই রজারসের হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল, হ্যাঁচকা একটান মেরে সে একদিকে সরে গেল এবং পলকের মধ্যেই জোনসের দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুটি চেপে ধরল অমানুষিক এক শক্তিতে।

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই, টেবিল চেয়ার এবং যন্ত্রপাতির দ্রুত আছড়ে পড়ার শব্দ জেগে উঠল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। মুহূর্তের

মধ্যেই জীবন মরণের এই লড়াই এক ভয়ানক রূপ ধারণ করল। এ্যাথলেটিক চেহারার সুঠাম পায়ের অধিকারী স্টিফেন জোনস, সহজেই বোঝা যায়, এই তীব্র লড়াইয়ে এতটুকুও পেছপা হয়ে হার স্বীকার করার মতন অবস্থায় নেই।

জোনস প্রবল শক্তিতে মোক্ষম কয়েকটা কৌশলী মার দিয়ে রজারসকে যখন প্রায় পরাস্ত করে তুলেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই রজারস তার হিংস্র অমানবিক এবং সভ্য আচরণের একান্ত বিপরীত এক অন্যায় নিষ্ঠুর বন্য ভয়ঙ্করতা নিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অভাবনীয় এমন একটা চীৎকার করে উঠেছিল রজারস যেন কোন একটা হিংস্র নেকড়ে অথবা প্যানথার কণ্ঠস্বর সেটা।

জীবন মরণ লড়াইয়ের এই খেলা প্রায় মিনিট পনেরোর মত হল। এই নিষ্ঠুর তীব্র লড়াইয়ের শব্দ বেসমেন্টের স্তব্ধ অন্ধকারকে চিরে ফালা ফালা করে দিল। দেহের পোশাক নিষ্ঠুর সংঘর্ষে শতছিন্ন হয়ে গেল, শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল আর ঠিক তখনই জোনস আবিষ্কার করে ফেলল লোমশ শক্ত চামড়ার আড়ালে রজারসের আসল কণ্ঠনালী। আবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জোনস সেটা চেপে তার তখনই তারা গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর।

মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে খেতে এক সময়ে তারা দরজার একেবারে কাছে চলে এল

জোনসের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য রজারস আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল, মাঝে মাঝে চীৎকার করে গালাগাল দিতে লাগল, সেই সঙ্গে হিংস্র শপথ উচ্চারণ করে তার আদিম দেবতার উদ্দেশ্যে কী সব যেন প্রার্থনা করতে লাগল।

জোনসের কাছে সবই দুর্বোধ্য, 'নেকরোনোমিকন' পুঁথির দু-চারটে পরিচিত শব্দ থেকে আন্দাজ করতে পারছে, একবার যদি রজারস তাকে বাগে আনতে পারে তাহলে সেই মুহূর্তেই তাকে হত্যা করবে এবং তার সেই মৃত দেহটা উৎসর্গ করবে ওই ব্লাসফিমেস জঘন্য মূর্তিটার কাছে।

বীভৎস--বীভৎস এই অনুভব! জোনস তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সে এই লড়াইতে রজারসকে হারাতে পারবে কিনা এবং এই লড়াইতে যদি সে রজারসের কাছে হেরে যায় তাহলে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতন তীক্ষ্ণ নখরের থাবা এবং বিসর্পিল শুঁড়োগুলোর সাপমুখগুলো তার দেহ চূর্ণ করে সব রক্ত আর রস শুষে নেবে এক সময়ে। তারপর এই পৃথিবীতে তার আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

এসব চিন্তা মাথায় আসতেই তীব্র গতিতে জোনস লাফিয়ে উঠল, রজারসের আঁকড়ে ধরা সাঁড়াশীর মতন হাতদুটোকে সবলে মুচড়ে দিল, তারপর তড়িৎগতিতে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ছদ্মবেশী উন্মাদটার উপরে। তারপর, শরীরের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় করে, দুঃসহ দুর্বার এক ক্ষিপ্রতা, নিয়ে দুর্ধর্ষ এক ঘুষি মারল রজারসের গলার কণ্ঠার উপরে।

প্রায় সাথে সাথেই রজারসের দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়, কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ নিথরভাবে পড়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ জোনস লক্ষ্য করল, রজারস সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই ভয়াবহ জীবন মৃত্যুর লড়াইতে অবশেষে তারই হল জয়।

ব্যাপার উপলব্ধি করেই জোনস টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল। দ্রুত নিশ্বাস নিতে লাগল—যেন অসহায়ভাবে এখুনি তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। মাতালের মত টলতে টলতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে দেয়ালের কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাতড়ে স্যুইচবোর্ডটা খোঁজার চেষ্টা করল, কোথায় যে তার টর্চটা ছিটকে পড়েছে তা সে বলতে পারবে না। তার দেহের পোশাকও শতছিন্ন হয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কেবলমাত্র কোমরের কাছে প্যান্টের মতন অবশিষ্ট একটু কাপড় রয়েছে!

আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে দেহটাকে সিধে রেখে জোনস হাতিয়ে হাতিয়ে স্যুইচ বোর্ড বের করল। তারপর স্যুইচ টিপতেই ওয়ার্করুমের চারিদিক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই বুঝি উন্মাদটা আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আলোর রোশনাই-এ জোনস ঘরের কোণে এক গাছা মোটা দড়ি পড়ে থাকতে দেখল আর দেখতে পেল ওল্টানো টেবিলটার পাশেই পড়ে আছে বেশ লম্বা একটা চামড়ার শক্ত সরু বেল্ট।

ছদ্মবেশী রজারসের সেই কুৎসিত ছদ্মবেশ তখন অর্দ্ধেক খুলে গেছে। যাতে আর কোন বিপদ না ঘটে সেই সাবধানতা অবলম্বন করে জোনস বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল রজারসের দেহটা। কম্বলের মতন সেই চামড়ার ছদ্মবেশ শুদ্ধই দেহটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল

তারপর রজারসের পকেট হাতড়ে খুঁজে বের করল চাবির গোছা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে জোনস দেখল, অদ্ভূত এক কৌশলে রজারসের ছদ্মবেশের সেই কালো লোমস বীভৎস চামড়ার আবরণটা তৈরী হয়েছে। সেই চামড়াটার থেকে

বেরচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ। গন্ধটা মাংসাশী কোন হিংস্র জন্তুর দেহের দুর্গন্ধের মতন। খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি খাটিয়ে গভীর একটা ফন্দী এঁটে রজারস এটা তৈরী করেছে তা বোঝা গেল।

সামনে এখন মুক্তির উজ্জ্বল পথ। জ্ঞান হারিয়ে বন্দী অবস্থায় মেঝের উপর পড়ে আছে রজারস।

জোনস এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রঙান কাঁচের সেই জানালা তিনটে। ওই জানালাগুলোর বাইরে বিরাজ করছে আর এক পৃথিবী, কিছু সময় পার হলেই সেই পৃথিবীর অন্ধকার বিদায় নেবে। সেই জায়গায় আসবে ভোরের নতুন আলোক-রশ্মি—যা বাইরের জগতকে করে তুলবে আলোকময়।

প্রত্যূষের সেই আলোক রশ্মি এসে আছাড় খেয়ে পড়বে ওই ধুলোর আবরণে ঢাকা সেই কাঁচের জানালা তিনটের উপর। সামান্য কয়েক ফালি অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল আলোর ছোঁয়া নেমে আসবে এই ভূগর্ভ যাদুঘরে।

কিন্তু এখনও ঘণ্টা দুয়েকের মত পৃথিবীতে চলবে অন্ধকারের রাজত্ব।

জোনস তার মুক্তির পথ খুলে রেখে, হাতের শক্ত মুঠোয় চাবির গোছা রেখে অ্যালকোভের দিকে এগোতে লাগল। ওখানে দেয়ালের গায়ে লাগান আছে জলের বেসিন।

জোনস সেখানে গিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিল, শরীরে যেসব রক্তের দাগ লেগেছিল তা তুলে ফেলল তারপর দৃষ্টি মেলে দিল কোণের দিকের এক কষ্টিউম হুকের দিকে। সেই হুকে ঝোলান ছিল কয়েকটা রঙ ওঠা পুরোন জামা।

তার চেহারায় ওই বিবর্ণ পোষাক একেবারেই মানাবে না কিন্তু সেই পোশাক পরিধান না করে সে এখান থেকে বেরুতেও পারবে না, কারণ তার পরিধেয় পোশাকের যা অবস্থা তাতে একবার যদি পুলিশের নজরে পড়ে তবে নির্ঘাত তাকে গ্রেপ্তার করবে। তাছাড়া এই পোশাকে লোক সমাজেও বের হওয়া যায় না।

কষ্টিউম পোশাকে দেহ ঢেকে জোনস এগিয়ে চলে বেসমেন্টের সিঁড়ির দিকে। দরজার তালার গর্তে চাবি ঘুরিয়ে তালাটা খুলে ফেলল—অপেক্ষায় রইল ভোরের আলো ফোটার। পৃথিবীর বুকে আলো জেগে উঠলেই সে এই স্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়বে।

এবার সে প্রধান প্রদর্শনী হলের দিকে তাকাল। না, সেখানে কোন টেলিফোন দেখা গেল না। কিন্তু সে যদি এই অন্ধকার রাতেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে তাহলে রাস্তায় হয়ত কোন রেস্তোরাঁ বা ওষুধের দোকান পাওয়া

যাবে, যারা সারারাতই খুলে রাখে তাদের দোকান হয়ত সেইখানেই টেলিফোন পেতে পারে।

যাই হোক রাস্তায়ই বেরোবে ঠিক করে সে যেই দরজা খুলে পা বাড়াতে যাবে অমনি তার কানে ভেসে এল ওয়ার্করুমের দিক থেকে রজারসের তীব্র কণ্ঠস্বর।

রজারসের জ্ঞান ফিরে এসেছে তাহলে।

জোনস স্পষ্ট দেখতে পেল, বন্দী অবস্থায় উঠে বসা রজারসের ডান দিকের গালের নীচে চিবুক পর্যন্ত মস্তবড় একটা সরু লম্বা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ক্ষতটা বেশ গভীর হয়ে বসেছে গালের নীচে।

হাত দুটো পেছনের দিকে বাঁধা অবস্থায় রজারস উন্মাদের মতন চীৎকার করে বলল, 'ওরে মূর্খ, ওরে শোকার বাচ্চা তুই যে সুযোগ হারালি তার মূল্য যে কত তা তুই কোনদিনই বুঝতে পারবিনে! তোকে নিয়ে আমি যে পবিত্র কাজে এসেছিলাম তাতে তুই চিরদিনের মত অমর এবং পবিত্র হয়ে থাকতিস! কিন্তু তুই তার মূল্য না বুঝে 'ওকে' অপমান করলি এবং 'ওর' পূজারী আমায় করলি জখম! জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করলি তুই! কিন্তু সাবধান, 'ও' এখন ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং পিপাসাকাতর! আমি ওরাবোনাকেই ওর প্রথম নৈবেদ্য হিসাবে ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু ও ন্যাটা বিশ্বাসঘাতক, সর্বদাই সঙ্গে রাখত একটা পিস্তল এবং বদমাশটা এখন পুরোপুরি আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে। ঠিক এই কারণেই আমি তোকে বেছে নিলাম। 'ওর' কাছে নিবেদনের জন্যে প্রাপ্য সম্মান তোর ভাগ্যেই ছিল কিন্তু তুই তা জঘন্যভাবে প্রত্যাখ্যান করলি! কিন্তু এখন, এই মুহূর্ত থেকে তোরা দু'জনেই খুব সতর্ক থাক, কারণ 'ওর' পুরোহিতের অপমানে 'ও' এখন হিংস্র দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে!

'আইয়া! আইয়া! এবার হাতে হাতে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেওয়া হবে! কীভাবে তোকে অমর করে রাখতাম তা কী তুই জানিস? ওই চুল্লীর দিকে একবার তাকা! ওখানে একটা কড়াতে প্রচুর মোম রয়েছে এবং চুল্লীতেও আগুন ধরাবার ব্যবস্থা একদম পাকা।

এর আগে অন্যান্য প্রায় জীবিত মুমূর্ষু চেহারাগুলোকে নিয়ে আমি যা করেছিলাম তোকে নিয়েও আমি ঠিক তাই-ই করতাম! হেই! তুই তো আমার মোমের প্রতিমূর্তিগুলো দেখে ব্যঙ্গ করেছিলি, বলেছিলি ওগুলো কেবলমাত্র মোম দিয়েই তৈরী, তাই আমার ইচ্ছে ছিল যে তোর দেহটার উপরই ঢেলে এক আশ্চর্য মূর্তি গঠন করব।

চুল্লীতে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা একদম প্রস্তুত ছিল এবং যে মুহূর্তে 'ওর' পিপাসা মিটে যেত তোর দেহের রক্ত আর অস্থিমজ্জার রস পান করে এবং ওই কুকুরটার মতন যখন তোর চেহারার দশা হত ঠিক তখনই তোর গায়ে ঢেলে দিতাম গলানো মোম এবং তোর চেহারাতে সৃষ্টি করতাম এক আশ্চর্য প্রতিমূর্তির রূপ ! আমি যে একজন চমৎকার আর্টিষ্ট একথা তো তুই-ই বলেছিলি ! কী রে বলিস নি ? তোর পরেই সুযোগ আসত ওরাবোনার, তারপর আর সবার—বিরাট এক মোমের মূর্তির পরিবার গড়ে উঠত আমার। আইয়া ! আইয়া !

ওরে কুত্তার বাচ্চা, তুই এখনো মনে করছিস এগুলো সব মোমের মূর্তি ? না, এবার থেকে জেনে রাখ এগুলো সবই 'সংরক্ষিত' ! তুই জানিস আমি এক আশ্চর্য অজানা দেশে গিয়েছিলাম এবং অতি 'বিস্ময়কর' একটা জিনিস নিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। তুই এত কুশ্রী একটা কাপুরুষ যে, তোকে এখনো 'ওর' আসল মূর্তি দেখাতে সাহস পাচ্ছি না আমি ! কারণ, আমি মনে করি, 'ওকে' দেখামাত্রই তুই ভয়ে, আতঙ্কে হার্টফেল করবি ! রক্তের জন্যে পাগল হয়ে 'ও' সময় গুনছে ! আইয়া ! আইয়া !

চীৎকার করে কথাগুলো বলেই রজারস ধরফড়ে ধরফড়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল তারপর হাতে পায়ের বাঁধন খুলবার জন্যে সারা শরীরটাকে মোচড় দিতে লাগল।

শোন্ জোনস—আমি যদি তোকে এখান থেকে চলে যেতে দিই তাহলে কী তুই আমাকে মুক্তি দিবি ? ব্যাপারটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করে দেখ। সত্যিই তোকে এখন আর আমার প্রয়োজন নেই। আপাততঃ ওরাবোনাকে নিয়েই কাজটা চালিয়ে নেব। 'ওকে আপাততঃ ওরাবোনার রক্ত আর মজ্জারসেই তৃপ্ত করা যাবে এবং আমার পরিকল্পনা মত ওরাবোনার সেই চিমসে ছিবড়ে দেহটার উপরেই মোম ঢেলে আশ্চর্য এক মূর্তি দেখে পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত হবে ! অবশ্য, প্রথমে সেই সম্মানটা আমি পাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুই তা গ্রহণ করলি না তাই ওরাবোনাই সেই সুযোগটা পেল।

কিন্তু অসুবিধে হল, হতচ্ছাড়াটা সবসময়ই সঙ্গে রাখে একটা লোডেড পিস্তল। অবশ্য, কায়দা করে আমি ওকে অবশ করতে পারব। কিন্তু তোকে আর বিরক্ত করব না। বরং 'ও' যে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে দিচ্ছে আমায় খুব শীগগিরই, তার খানিকটা অংশ তোকে দেব আমি। তুই এবার

আমায় ছেড়ে দে—আইয়া! আইয়া! মহান রান টেগোথ! ভাল চাস্ তো আমায় ছেড়ে দে! ছেড়ে দে বলছি! ওই বিশাল কাফের ভেতরে 'ও' এখন উপোসী থেকে ছটফট করছে, রক্তের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে 'ও'! ছেড়ে দে আমায় জোনস! হেই! হেই! জয় রাম টেগোথের জয়!

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল জোনস। তীক্ষ্ণ চোখে ঘন ঘন দৃষ্টি ফেলল রজারসের দিকে। রজারসের কথা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ সেই নিষ্ঠুর লড়াইয়ে সে যদি হেরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ত রজারসের পায়ের তলায়, তাহলে এতক্ষণে হয়ত সেই কুকুরটার মতনই তার দশা হত। কথাটা চিন্তা করতেই তার শরীর শিউরে উঠল। তার দেহ ও মন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রজারসের এই যাদুঘরের সমস্ত গোপন রহস্যই জোনসের কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে বেশ বুঝতে পারল, রজারস ঘন ঘন তাকাচ্ছে প্যাসেজের শেষপ্রান্তের তালাবদ্ধ দরজার দিকে। আর বার বারই দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পায়ের হাঁটু দুটো শূন্যে উঁচিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে নীচে, তার গালের নীচের সরু লম্বা ক্ষতটা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে—জোনসের আশঙ্কা হল হয়ত রজারস এর ফলে আরও আহত হবে। অথবা এর ফলে তার বাঁধন ছিঁড়ে যাবে এবং সে তখন হয়ে উঠবে অতীব ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।

বেসমেন্টের সিঁড়ি থেকে নেমে এসে এ্যালকোভের এক কোণ থেকে আর এক গাছা দড়ি খুঁজে বের করল জোনস। তারপর আবার ভাল করে বাঁধল রজারসকে

বন্দী অবস্থায় প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, মেঝের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে দেহটাকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গেল রজাবস। প্যাসেজের মাঝখানে, প্রতীক চিহ্নের তালাবদ্ধ দরজা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে রইল সে। তার সর্বাঙ্গে ধুলো-ময়লা, ছিন্ন-ভিন্ন পোশাকে লেগে আছে রক্তের দাগ, চিবুকের উপর দিকের সরু গর্তের মতন ক্ষতটা থেকে রক্তের ধারা নেমে এসেছে গলা আর কাঁধ ছাপিয়ে সারা দেহে। এই অবস্থাতেই সে আবার চীৎকার করে উঠল, গলার স্বর অতীব ভয়ঙ্কর!

'পুয়াহটিক' পুঁথির যতসব নিষিদ্ধ এবং দুর্বোধ্য শব্দ, 'নেকরোনোমিকনের' তান্ত্রিক মন্ত্রের গুরু গম্ভীর অমঙ্গলকর শপথগুলো এবং 'আনঅসপ্রিচলিচেন কালটেন'—এর উচ্চারণের অযোগ্য অপদেবতা প্রার্থনার মন্ত্রগুলো ভীষণ চীৎকারের সঙ্গে আউড়ে যেতে লাগল রজারস।

মানুষের গলার স্বর যে এত ভয়ঙ্কর কর্কশ ও তীক্ষ্ণ গুরুগম্ভীর হতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যারা রজারসের এই চীৎকার না শুনেছে।

হঠাৎ জোনসের খেয়াল হল, রজারস যদি এইরকম চীৎকার করে যায় তাহলে হয়ত টেলিফোনের আর কোন দরকার হবে না এবং হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন কনস্টেবল এখানে ছুটে আসবে। এবং এসে জিজ্ঞাসা করবে এই পুরোন বাড়ীটার বেসমেণ্টের ঘরগুলোয় কী ব্যাপার ঘটেছে। তাছাড়া আশেপাশের ওই জীর্ণ বাড়ীগুলোয় এ চীৎকার গেলেও কোন সুবিধা হবে না। কারণ, ওইসব বাড়ীগুলোয় কোন লোকই থাকে না, একেবারে ফাঁকা। কেবল দিনের বেলায় মালগুদোমের কাজের জন্যে ঘণ্টাকয়েক ব্যস্ত থাকে গুদোমকেরানী আর কিছু কুলির দল।

সিংহের মতন গর্জন করতে থাকে রজারস—চীৎকার শেষ করার একটু আগে, সম্ভবত তার শপথ আর প্রার্থনামন্ত্রের পাঠ শেষ হয়ে এসেছে ততক্ষণে, হিংস্র জন্তুর মতন চীৎকার করে উঠল সে আর ঘষড়ে ঘষড়ে এগোতে লাগল তালাবদ্ধ দরজার দিকে। জবা ফুলের মতন লাল চোখ দুটো তার মুখে তেমনি আদিম দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুর্বোধ্য সব আবেদন : উজ্বা ওয়াই!

উজ্বা ওয়াই! ওয়াই! ওয়াই কা বা ভো হই, রান টেগোথ—সিথুলহু ফথাগন্—এই এই এই! রান টেগোথ রান টেগোথ রান টেগোথ!

রজারস এবার থামল! জোনস দেখল, রজারস দেহটাকে ঘষতে ঘষতে একেবারে তালাবদ্ধ দরজাটার কাছে নিয়ে এসেছে। তারপর দেহটাকে একটু উঁচু করে দরজার গায়ে মাথা দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারতে লাগল।

আবার তাকে বাঁধবে কিনা কথাটা চিন্তা করতেই জোনসের শরীরটা যেন অবশ হয়ে এল। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করল সে, বলতে গেলে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা তার।

রাত ভোর হতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকী।

জোনসের ভয় হচ্ছিল, লোকটা যা কাণ্ড বাঁধিয়েছে তাতে কয়েক ঘণ্টা আগের রাতের অন্ধকারের সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো আবার এসে হাজির না হয় তার মগজের ভিতর। আসলে রজারসের এই যাদুঘরের সমস্ত কিছুই বিভীষিকা এবং অসুস্থ বিকৃতিতে এতই পূর্ণ যে এখানে কোন সুস্থ ধ্যানধারণার স্থান নেই।

দরজার গায়ে সশব্দে মাথা ঠুকে যাচ্ছে রজারস আর আপন মনেই বিড়বিড়

করে যাচ্ছে, তার গালের নীচের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া থিতিয়ে এসেছে, চিবুকের তলায় শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে সেই রক্ত, চোখমুখের ভঙ্গী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জোনস সেদিকে তাকিয়ে রইল। উপলব্ধি করল তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল, দেহের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সে রজারসের দিকে।

হঠাৎ যেন রজারস তার বিড়বিড় করা গুপ্ত মন্ত্রপাঠ এবং মাথা ঠোকা বন্ধ রেখে শান্ত হয়ে গেল। তারপর দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে কোন রকমে বসে পড়ার ভঙ্গীতে একদিকে হেলিয়ে, মাথাটাকে ঠেকিয়ে রাখল দরজার গায়ে—যেন উৎকর্ণ হয়ে সে ভেতরের কারো কোন কথা শুনছে

জোনসের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল যখন সে দেখতে পেল রজারসের চোখমুখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা খুশীর স্রোত। আর সেই সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে জেগে উঠল এক শয়তানী হাসি। মুহূর্তের জন্য রজারস ক্রূর চোখে তাকাল জোনসের দিকে।

পাথরের মূর্তির মতন জোনস শক্ত হয়ে গেল। ঠিক সেই অবস্থাতেই শুনতে পেল রজারস তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, শোন বোকা! মন দিয়ে শোন আমার কথা! 'ওই' দেবতা আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছে এবং 'ও' এখুনি এখানে আসছে! তুই কী শুনতে পাচ্ছিস না ঘরের ভেতরের মস্তবড় পুকুরটার মধ্য থেকে 'ও'র জল ছিটানোর শব্দ? ঘরের ঠিক মধ্যেখানেই রয়েছে পুকুরটা। আমিই ঘরের মধ্যে ওই গভীর পুকুরটা কাটিয়েছিলাম। কারণ 'ও' আবার মাঝে মাঝে পুকুরের জলেও গা ডুবিয়ে থাকতে ভালবাসে।

'ও' উভয়চর প্রানীর মতই জীবনধারণ করে তাই 'ওর' সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দিয়েই আমি এসব তৈরী করিয়েছি। তুই নিশ্চই ফটোতে দেখেছিস, ওর কুণ্ডলী পাকানো শুঁড়ের পাশেই রয়েছে মাছেদের কানকোর মতন স্ফীত দুটো ফুলকো। তিন লক্ষ বছর আগে—তোর কাছে হয়ত অবিশ্বাস লাগবে, 'ও' পৃথিবীতে এসেছিল উগোথ গ্রহ থেকে। আর উগোথের সমস্ত শহরগুলো ছিল গভীর, উষ্ণ সমুদ্রের নীচে।

এই ঘরটার নীচে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সে পারত না কারণ 'ও' ছিল লম্বায় ষোল ফিট উঁচু—কেবল মাত্র বসে আর গুঁড়ি মেরে থাকতে হত তাকে। তাই ঘরের মধ্যে গভীর গর্ত খুঁড়ে একটা পুকুর কটিয়েছি আমি।

ওই শোন, পুকুরের জলে কী তোলপাড় হচ্ছে! দে, চাবির গোছা আমায়

ফিরিয়ে দে বুদ্ধু ! এই বিরাট ভারী তালাটা খুলে 'ও'কে এখানে আসার সুযোগ দিই তারপর ও বাইরে এলে আমরা দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে শ্রদ্ধা জানাই ! শেষে দুজনে বাইরে গিয়ে একটা কুকুর কিংবা বেড়াল নয়ত সম্ভব হলে কোন মদ্যপায়ী মাতালকে ধরে এনে 'ওর' কাছে নিবেদন করি ! নিজের শরীরের পুষ্টি মেটাতে তার পরের ব্যবস্থা না হয় সেই করে নেবে।

নীরবে নিঃশব্দে তালাবন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জোনস। দরজার উপর ফেলল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দুটি প্যানেলের ভারী বিরাট দরজা। একেবারে উপর দিকে প্যানেলের গায়ে রয়েছে 'নেকরোনোমিকনের' কিছু প্রতীক চিহ্ন।

ওপরের দিক থেকে জোনসের চোখের দৃষ্টি এবার নেমে এল দরজার মাঝামাঝি জায়গায়, বেশ কিছু ছোট ছোট গর্তের জন্ম হয়েছে দরজার পাল্লার গায়ে। সেগুলোকে গর্ত না বলে, কোন ভারী ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ফাটল কিংবা চেরা ফাটলের গর্ত বা ফোকর বলাও চলে।

ব্যাপারটা জোনসকে খুব কৌতূহলী করে তুলল। কারণ, পাল্লার গায়ের গর্তগুলো সবই সৃষ্টি হয়েছে দরজার ভেতরের দিক থেকে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করেই সে চমকে উঠল। একটা গর্তের মধ্যে চোখ রেখে সে উঁকি মেরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল।

হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ধ্যের দিকে কুকুর রহস্যের ব্যাপারটার খোঁজ করতে গিয়ে যখন বেসমেন্টের ছাইয়ের উঠোনে গিয়েছিল, তখন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধুলোর আবরণে ঢাকা রঙীন জানালা তিনটের ঠিক শেষেরটির গায়ে চোখ রেখে এই ঘরের ভেতরটাই দেখার চেষ্টা করছিল সে। তখন সে ঘরের অন্ধকারে দুটো বিন্দুর মতন আলো দেখতে পেয়েছিল।

সেই অন্ধকার ঘরেই এখন সে উঁকি মারছে। দেখতে পেল, ঘরে বেদীর মতন একটা কিছু রয়েছে এবং সেই বেদীর উপরে রয়েছে দুটো আলোর বিন্দু। না, ঘরের মধ্যে কোথাও কোন সিংহাসন দেখা যাচ্ছে না। তবে ঘরটা যে মস্ত বড় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য, সিংহাসনের ছবি দেখেছিল সে ফটোর ভেতরেই এবং রজারস বলেছে ওই ফটো তুলেছে সে সুদূর আলাস্কার এক অজ্ঞাত অঞ্চলে গিয়ে, যে অঞ্চলে তিন লক্ষ বছর আগে বাস করত একচক্ষু নরদানব সাইক্লোপিয়ানরা।

জোনস তার দৃষ্টিশক্তিকে আরও প্রখর করে তুলল। বেদীর একধারে নীচে ওটা কী পড়ে আছে ? ওঃ, কী বীভৎস !

ভীষণ এক চীৎকার করে, যে চীৎকারে তার গলার নালীটা চিরে ফেটে যেতে পারে, সেই রকম আতীব্র এক আর্তনাদে সবকিছু ছাপিয়ে দিতে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু অতিকষ্টে মনের সেই ইচ্ছাকে দমন করল সে।

বেদীর উপরের আলোর বিন্দুর সামান্য খানিকটা আভা পড়েছিল নীচে; তাতেই দেখা যাচ্ছে কুকুরটার সেই বীভৎস শুকনো চিমসে মাংসস্তূপের মতনই একটা মানুষের ছিবড়ানো চিমসে আস্ত দেহ পড়ে আছে বেদীর তলায়। প্রায় করোটির মতন দেখতে মাথাটার এখানে সেখানে এখনো লেগে আছে ছিটে ফোঁটা মাংস। ওঃ, কী মারাত্মক বীভৎস দৃশ্য!

ভয়ে, আতঙ্কে নিস্তব্ধ অবস্থায় প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জোনস দাঁড়িয়ে রইল। সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে।

বেশ ভালই সে বুঝতে পারছে, আর কিছুক্ষণ এই যাদুঘরে থাকলে এবং এইসব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করলে সে নির্ঘাত উন্মাদ হয়ে যাবে—যেমন রজারস ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছে।

মাত্র কয়েক মিনিট আগেই রজারস বলেছিল, কুকুর বেড়াল না জুটলে একটা মাতালকে ধরে এনে উৎসর্গ করবে ওই ব্লাসফিমেস কুশ্রী দেবতার কাছে। ব্যাপারটা জোনসের কাছে এবার পরিষ্কার হল—এর মানে ইতিপূর্বে আর একটা মানুষকে ওই দেবতার কাছে নিবেদন করা হয়েছে। সেই মানুষটারই প্রায় কঙ্কাল চেহারার শরীরটা পড়ে আছে ওই বেদীটার নীচে।

সে-ও কী রজারসের মতন উন্মাদ হয়ে গেল নাকি? যদি নাই হয়, তাহলে এখনও ওই গর্তের ভেতরে উঁকি মারবার দুর্নিবার ইচ্ছেটা প্রবলতম হয়ে আঁকড়ে ধরছে কেন তাকে? এইমাত্র ঘরের মধ্যে কিসের শব্দ জেগে উঠল? সত্যিই তার মাথার আর ঠিক নেই, কারণ রাত এগারোটার পর থেকে এই যাদুঘরের পাষাণচাপা অন্ধকারের ভেতরে বসে থেকে যেরকম হ্যালুসিনেসন-এর রোগে পেয়েছিল তাকে। এখন আবার সেই অসুস্থ অনুভবগুলো ধীরে ধীরে এসে গ্রাস করছে তাকে।

ঘোর উন্মাদ রজারস তাকে বলেছে এই বিশাল প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটা গভীর পুকুর রয়েছে এবং তিন লক্ষ বছর আগের এক আদিম দেবতা সেই পুকুরের জল তোলপাড় করে, জলকাদা ছিটিয়ে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে, উঠে আসছে মেঝের উপরে।

রজারস তাকে সেই শব্দ শুনবার অনুরোধ জানালে সে দ্বিতীয়বার গর্তের মধ্যে

চোখ রাখল—ওঃ কী বীভৎস! হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর। বলে চীৎকার করে উঠল জোনস। কারণ, সত্যিই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে আলোড়নের প্রচণ্ড শব্দ!

জোনসকে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখে রজারসের চোখ জ্বলে উঠল। তীব্র এক অট্টহাসিতে দুলে উঠল তার শরীর। মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে সে কর্কশভাবে বলল, অবশেষে ওকে তুই বিশ্বাস করলি, বোকা। কিছুই আর তোর অজানা নয়! তুই ওর জল থেকে উঠে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিস। এবার আমার চাবির গোছা ফিরিয়ে দে মূর্খ! চাবির গোছা হাতে পেলেই আমি এই ভারী তালাটা খুলে 'ওকে' এখানে আসার পথ করে দেব—তারপর 'ওর' সামনে আমরা দুজনে জানু মুড়ে বসে থাকব—ওর নৈবেদ্যের জন্য প্রাণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব!

কিন্তু জোনস তখন পাথরের মূর্তির মতন স্থির, যেন কোন কথাই তার কানে প্রবেশ করেনি। আতঙ্ক আর ঘৃণায় হারিয়ে ফেলেছে তার বাকশক্তি, পাথরের মূর্তির মতন একভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে—যেন কোন মন্ত্রবলে কেউ তাকে অনড় অচল করে দিয়েছে।

শেষ রাতের সেই আলোয় ভরা প্যাসেজের শূন্য পথে তার চোখের সামনে দিয়ে যেন দুঃস্বপ্নের এক মূর্তির দল দৌড়ে পালাচ্ছে তার বেদীর নীচের মানুষের শুকনো মাংসের স্তূপটার দিকে। একটা কঙ্কাল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেই মূর্তিগুলোকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে।

হ্যাঁ, স্পষ্ট কানে ভেসে আসছে বিশাল কক্ষের ভিতর থেকে জলকাদা ছিটকানোর শব্দ! সেই সঙ্গে ভারী ভারী থাবা ফেলার শব্দ।

বেশ বোঝা যাচ্ছে কে যেন ভারী ভারী পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। তার নাকের ডগায়, এই প্রকাণ্ড দরজার ফাটলগুলো থেকেই, একটা দুর্গন্ধ ভেসে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে নাকের পাশ দিয়ে।

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা জান্তব দুর্গন্ধ আর সেই সঙ্গে লবণাক্ত এক ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ।

জোনসের মনে পড়ল, ঠিক এমনি ধরনেরই একটা হিমস্পর্শী গন্ধ সে পেয়েছিল প্রধান হলের ভেতরে রাত জাগার সময়ে দর্শকের আসনে বসে।

এবার বুঝতে পারল, দরজার ওই ফাটলগুলো থেকেই হিমস্পর্শী গন্ধটা ভেসে গিয়েছিল তার নাকে! আর এই জান্তব দুর্গন্ধ, ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়ামে

বেড়াতে গিয়ে একটা ম্যামথের কঙ্কালের কাছে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি গন্ধই পেয়েছিল জোনস।

বিস্ফারিত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রজারস, মাঝে মাঝে কি যেন বিড় বিড় করে বলছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই জোনসের কানে ভেসে এল দরজার ওপারে পাল্লার কাছে কোন ভারী বস্তুর চলে আসার শব্দ।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেই বস্তুটা পাল্লার ছিটকিনি কিংবা অন্য কিছু হাতড়াচ্ছে—দরজাটা মৃদু কেঁপে উঠছে।

প্রায় পাঁচ ইঞ্চি চওড়া, ওক কাঠের দুটি প্যানেলের ভারী বিশাল দরজা—সেই দরজার গায়ে ওদিক থেকে কেউ যেন প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারছে, চড় চড় বিকট শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে ভারী মুগুরের আঘাতের মতন আবার শব্দ জেগে উঠছে পাল্লার গায়ে।

ক্রমশ সেই শব্দ আরও তীব্র, আরও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল……যেন মস্তবড় এক লোহার হাতুড়ি দিয়ে কেউ আঘাত হানছে দরজার গায়ে।

বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বিকট দুর্গন্ধ। দরজার মাঝামাঝি অংশগুলোয় চড় চড় করে ফাটল জেগে উঠল। তারপরই গোলাবিধ্বস্ত প্রাচীরের মতনই বিশাল দরজাটার একটা অংশ ধ্বসে পড়ল……পলক ফেলতে না ফেলতেই আর একটা অংশও ভেঙেচুরে সশব্দে পড়ে গেল মেঝের উপর।

জোনস বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখে, ওপাশের অন্ধকার থেকে দুটি দীর্ঘ বিসর্পিল শুঁড় বেরিয়ে আসছে……কালো কালো শুঁড়গুলোর মাথায় ধারাল তীক্ষ্ণ নখর, কাঁকড়ার দাঁড়ার থাবার মতন বিভক্ত সেই তীক্ষ্ণ থাবা।

তীর বেগে লাফ মেরে জোনস ছুটে চলে গেল ওয়ার্করুমের সামনের দিকে।

—বাঁচাও বাঁচাও! হে দয়াময় ঈশ্বর আমায় রক্ষা কর। আ—আ—আ—আ… ·!!

জোনস নিজেই জানে না কী করে দমকা বাতাসের মতন সে বাইরে চলে এল। রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই—মস্তবড় দুই লাফ মেরে, বেসমেণ্টের সিঁড়ি পেরিয়ে, সে যখন দরজা খুলে উপল খণ্ডে ভরা পথের একদিকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, পেছনের দরজা তখন সশব্দে আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রায় উন্মাদের মতই, বিদায়ী রাতের পাতলা অন্ধকারে সাউথ ওয়ার্ক স্ট্রীটের

পাথর বসান পিচ্ছিল পথ দিয়ে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে চলল। কোনদিকে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই সে জানে না।

জোনসের শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে আর সেই ক্ষতের ভেতরে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। তার দেহে জড়ানো রয়েছে পুরোণ বিশ্রী গন্ধওলা একটা কষ্টিউম পোশাক—এই অবস্থায় যে তাকে দেখবে সেই তাকে পাগল বলে মনে করবে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতন জোনস দৌড়চ্ছে—দেহের সব শক্তি দিয়ে সে দৌড়চ্ছে। এইভাবে একসময়ে সে ওয়াটালু ব্রীজের সামনে এসে পড়ল।......

ব্যাস, তার পরের ঘটনা আর কিছুই তার মনে নেই। কখন যে রাত ভোর হল, কী করেই বা সে বাড়ীতে পৌছল, কিংবা ওয়াটালু ব্রীজের ওপার থেকে কেমন করে একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে পড়ল...এ সবের কোন প্রমাণই সে দিতে পারবে না।

কিংবা হয়ত সে সারাটা রাস্তাই উন্মাদের মতন ছুটে এসেছে, ওয়াটালু ব্রীজ পার হয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড, তারপর চারিংক্রস পেরিয়ে হে মারকেট এবং অবশেষে রিজেন্ট ষ্ট্রীটে তার বাড়ীতে—এই সবটা পথই হয়ত সে ছুটে এসেছে বিদায়ী রাতের আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

জ্ঞান আসার পরও, সকালের সেই ঝলমলে সোনালী রোদের স্পর্শে যখন সে চোখ মেলে তাকাল জানালার দিকে, তার নাকে লেগে রয়েছে মিউজিয়মের বিশ্রী গন্ধটা। সে বিস্মিত হয়ে খেয়াল করল তার দেহের সেই নোংরা কষ্টিউম পোশাকটা থেকেই আসছে ওই বিশ্রী গন্ধটা।

ফোনে ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল। ফোন করার ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার এসে হাজির হল, তাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছু ওষুধ এবং কমপক্ষে সাতদিনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিয়ে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

সাতদিন পেরিয়ে যেতেই আবার ডাক্তার এল। জোনস এখন পুরোপুরি সুস্থ, দেহে মনে ফিরে পেয়েছে পুরোণ বল আর সাহস। যে সকল স্নায়ু চূর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সবল ও সতেজ হয়ে আবার ফিরে এসেছে তার দেহে মনে।

জোনস সুস্থতা বোধ করায় ডাক্তার তাকে বিছানা ছেড়ে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় ঘোরাফেরা করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

জোনসের মনে দেখা দিল আনন্দের জোয়ার।

সমস্ত ব্যাপারটা ডাক্তারের কাছে সে প্রকাশ করেনি কারণ সেসব কথা কাউকে বলা যায় না। যে তার এই ভয়ঙ্কর কাহিনীর কথা শুনবে, সেই তা অবিশ্বাস করবে এবং হয়ত তাকে উন্মাদ ভেবে বসবে। কাজেই এসব কথা কাউকে না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাই হোক ডাক্তার চলে যেতেই, জোনস এই সাতদিনের জমে থাকা খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু কাগজগুলোর কোথাও মিউজিয়মের কোন সংবাদই তার চোখে পড়ল না।

তবে কি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনের ভুল না সত্যিই ঘটেছিল ?

এই যে তার সঙ্গে রজারসের জীবন-মৃত্যুর লড়াই হয়েছিল এবং যার ফলে তার দেহের নানান জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল এ সবই কি একটা মিথ্যে দুঃস্বপ্নের ব্যাপার নাকি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা রোগীর হঠাৎ ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের মতন ?

সে মনে মনে ঠিক করল আরও একটু সুস্থ সবল হলেই আবার সেখানে যাবে এবং সত্যিই ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তা যাচাই করে দেখবে।

কিন্তু সে যে রজারসের ওই ব্লাসফিমেস কুশ্রী ছবিটা দেখেছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাছাড়া নিজের চোখে দেখেছে সে দরজাটা বিধ্বস্ত প্রাচীরের মতনই মেঝের উপর পড়ল…দু'টা প্রকাণ্ড শুঁড় কিলবিল করে বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে…এ সবই কী ভয়াবহ মিথ্যা দুঃস্বপ্ন ? তারপর গর্তের ফুটো

দিয়ে বেদীর নীচে যে মানুষের ক্ষত বিক্ষত নরকঙ্কালের মতন দেহটা দেখেছে, সবই কী তার চোখের ভুল ?

তার ঠিক দু'সপ্তাহ বাদে, উজ্জ্বল আলোকরশ্মি মাথায় নিয়ে সবাই যখন অফিসের দিকে ছুটছে, ঠিক তখনই জোনস উপস্থিত হল সাউথওয়ার্ক স্ট্রীটের সেই পুরোণ বাড়ীটায়।

সে যখন ওই যাদুঘরে এসে পৌছাল তখন আর যাদুঘরের আশেপাশের জীর্ণ অট্টালিকাগুলো নিস্তব্ধ ছিল না—সেগুলোর মালগুদামে কেরানীবাবুরা এবং কুলীরা, লরী ড্রাইভার এবং ঠিকেদাররা বেশ সোরগোল বাধিয়ে দিয়েছিল। সেই পুঁতিবাষ্পময় সূক্ষ্ম দুর্গন্ধ কিংবা টিউডরযুগীয় বাড়ীগুলোর নোনা গন্ধ রোদালো হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছে কোথায়ও নয়ত সাপের মতন লুকিয়ে পড়েছে কোন অজানা গর্তের ভেতরে। আর আশ্চর্য, বাড়ীটার নীচে যদুঘরটি ঠিক একই অবস্থায় আছে।

জোনস বিস্মিতভাবে দেখল, যাদুঘরের বেসমেন্টের দরজা খোলাই রয়েছে।

তাকে দেখামাত্রই দারোয়ান মুচকি হেসে অভিবাদন জানাল তারপর পথ ছেড়ে দিল। জোনস বেশ সাহসের সঙ্গেই বেসমেন্টের সিঁড়ি পেরিয়ে নীচে নেমে এল।

প্রধান প্রদর্শনী হলের দরজার কাছে হাজির হতেই একটি পরিচারক জোনসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার টুপী ওভারকোট নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে এল। সবই স্বাভাবিক, ছিমছাম, মার্জিত, এই পরিচালক লোকটির হাসিও স্নিগ্ধ এবং সুন্দর।

স্বাভাবিক ভাবেই জোনসের মনে হল, হয়ত সবই ছিল তার দুঃস্বপ্ন। হয়ত দর্শকের আসনে বসে সে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার চোখে নেমে এসেছিল রাজ্যের দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু এখন কী জোনসের সাহস করে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে আর ওয়ার্করুমের দরজায় টোকা মেরে রজারসকে ডাকা উচিত হবে ?

ঠিক সেই মুহূর্তেই তার সামনে হাজির হল ওরাবোনা। মুচকি হেসে সে জোনসের সঙ্গে করমর্দন করল।

ওরাবোনার মসৃন তামাটে রঙের মুখ আর কালো চোখ দুটোয় মনে হয় ফুটে উঠেছে কষ্টের হাসি, নাকি কাষ্ঠহাসি, জোনস ঠিক অনুমান করতে পারল

না। তবে ওরাবোনার মুখে-চোখে যে আগের সেই ধূর্ত হাসি নেই এটা বুঝতে তার দেরী হল না। বরং তার হাবভাবে ফুটে উঠেছে বন্ধুত্বের ছাপ।

গুডমর্নিং মিষ্টার জোনস! ওরাবোনা খুব শান্ত কণ্ঠে হাসি মুখে বলল, মনে আছে বেশ কিছুদিন আগে আপনাকে আমি এখানে দেখেছিলাম। আপনি কী এখন মিঃ রজারসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? কিন্তু তিনি এখন এখানে নেই জরুরী কাজে আমেরিকায় চলে গেছেন। হ্যাঁ, অত্যন্ত জরুরী কাজে গেছেন। ওনার অবর্তমানে আমিই এখানকার সবকিছু দেখাশোনা করছি এবং আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে মিঃ রজারসের মহৎ কাজের বাকীটা আমি খুব ভালভাবে সমাধা করতে পারি—যতদিন তিনি এখানে না আসেন।

ওরাবোনার চেহারাটা গোলগাল এবং তার মধ্যে রয়েছে বিদেশী ছাপ। ওরাবোনার ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে হাসির ছোঁয়া।

কিছুক্ষণ নীরব রইল জোনস, হয়ত ওরাবোনাকে কিছুটা জরীপ করে দেখল। তারপর নানা রকম ভনিতা করে পনেরো দিন আগের রাতের সেই ঘটনাটার কথা জানতে চাইল—এবং কথার মাঝে সে এটাও জানিয়ে দিল যে সেইদিন রাতেই সে শেষবারের মতন এসেছিল এই যাদুঘরে।

ওরাবোনার মধ্যে ফুটে উঠল একটা পুলকিত ভাব, খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে তারপর মাথা নেড়ে খুব পুলকিতভাবে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক মনে আছে মিঃ জোনস! ঘটনাটা ঘটেছিল গত মাসের আঠাশ তারিখে। সবে মাত্র প্রত্যুষের আগমন ঘটছে—মিঃ রজারস তখনো আসেননি এখানে—আসল কথা কথা কী স্যার—আমি তার আসার আগেই এখানে চলে এসেছিলাম—আর এখানে পা ফেলেই দেখি তুলকালাম কাণ্ড ওয়ার্করুমের ভেতরে, প্যাসেজের ওদিকে! আর কি বলব স্যার, সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে জুটল মস্ত খাটুনি—দ[illegible] ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম—সে কী চারটিখানি কথা! রাজ্যের খাটুনি যেন!

নতুন টাটকা স্পেসিমেন, মোম ঢালাইয়ের নিখুঁত ব্যাপারটা শুরু···হেঁ হেঁ [ব]ুঝলেন কিনা—একেবারে নিখুঁত কাজের শুরু···আর সেই তখন থেকেই আমার [ঘ]াড়ে চাপল এই যাদুঘরের দায়িত্ব। অত্যন্ত শক্ত এবং জটিল স্পেসিমেন তৈরী [ক]রে নেবার ব্যাপারটা।

কিন্তু যেহেতু আমি এ ব্যাপারে মিঃ রজারসের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম তাই তমন বেশী কষ্ট হয়নি আমার আসল মূর্তিগুলো তৈরী করতে।

রজারস যে একজন নামকরা গুণী শিল্পী, তা আপনার অজানা নয়।

যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন এই স্পেসিমেনগুলোকে তিনি আরও বাস্তব করে তুলবেন—আমি জোর গলায় তা বলতে পারি।

কিন্তু তিনি হঠাৎই আমেরিকার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। রাসায়নিক এমন কতকগুলো প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওই স্পেসিমেনগুলোর ব্যাপারে যে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো সারতে হয়েছে।

বুঝলেন কিনা স্যার—কিছু লরী ড্রাইভার পুলিশে জানিয়েছে যে তারা এই যাদুঘরের ভেতর থেকে পর পর বেশ কয়েকটা পিস্তলের গুলির শব্দ শুনেছে। ব্যাপারটা খুব মজার, তাই না?

সামান্য বিরতি। তারপর ওরাবোনা আবার বলতে থাকে, সেই নতুন স্পেসিমেনের ব্যাপারটা—বুঝলেন কিনা মিঃ জোনস—সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার! এটা একটা মহান শিল্পকাজ অথচ ডিজাইন প্রায় তৈরী হয়েই ছিল—মিঃ রজারস নিজেই সেটা তৈরী করেন! এখন তিনি ফিরে এলেই ওই মহান কাজটা সমাপ্ত করবেন।

ওরাবোনার মুখে ফুটে উঠল ঠোঁট চেরা হাসি।

পুলিশ, বুঝলেন কিনা মিঃ জোনস! মাত্র সপ্তাহ কয়েক আগে ওই স্পেসিমেনকে আমরা প্রদর্শনী মঞ্চে সাধারণ দর্শকের জন্য রেখেছিলাম, হেঁ হেঁ, দু'তিনজনের মত দর্শক ওটা দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়—তবুও পরদিনই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একদল পুলিশ এখানে আসে এবং কড়া হুকুম করে যায় প্রকাশ্যে এটা রাখা চলবে না। কারণ ওই স্পেসিমেনকে আমরা 'অ্যাডাল্ট এ্যালকোভে রেখেছিলাম।

এই স্পেসিমেনটা প্রচণ্ড ভারী ওজনের। অপূর্ব তার শিল্পশৈলী—অবশেষে বাধ্য হয়ে সেই স্পেসিমেনকে এ্যালকোভ থেকে সরিয়ে আর একটা ঘরে রাখা হল! পর্দা দিয়ে ভালভাবে তাকে ঢাকা হল যাতে কোন ভাবেই সেটা দর্শকদের নজরে না পড়ে।

আমি মনে করি পুলিশের এ আদেশ আইনবিরুদ্ধ—তবে এটুকু আশা করি মিঃ রজারস আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই পুলিশের এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবেন।

ওরাবোনার এইসব একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে জোনস অস্বস্তি বোধ করল, তবুও দুর্নিবার এক কৌতূহলে সে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল।

ওরাবোনা আবার মুখ খুলল, আপনি একজন শিল্পের সমঝদার লোক মশায়।

আমার মতে যদি ওই স্পেসিমেনটা নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে দেখাই তাহলে আইনকে অপমান করা হবে না। হয়ত মিঃ রজারস যে কোনদিন এই স্পেসিমেনকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে ফেলবেন—কিন্তু আমার মতে সেটাই হবে জঘন্য এক অপরাধ।

হঠাৎ জোনসের মনে হল সে এই প্রস্তাবে অরাজী হবে কিন্তু কী একটু চিন্তা করে সে এগিয়ে চলল ওরাবোনার সঙ্গে।

এ্যালকোভের মঞ্চগুলোয় বিভীষিকার মূর্তিগুলো বিরাজ করছে, কিন্তু এখন সেখানে কোন দর্শক নেই। এ্যালকোভ পেরিয়ে, প্রধান প্রদর্শনী হলের পেছনের দিকে একটা ঘরে এসে তারা দুজন দাঁড়াল।

সেই ঘরের শেষ প্রান্তে রয়েছে উঁচু একটা পাটাতন। সেটা ঘন কালো মোটা পর্দা দিয়ে আবৃত। একেবারে সামনে রেলিং দিয়ে পাটাতনকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

ওরাবোনা হাসি হাসি মুখে সেই রেলিং-এর কাছে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল। তারপর আঙুল দিয়ে কালো পর্দা দেখিয়ে, মিষ্টি হেসে বলল, অবশ্যই এটা আপনার জানা উচিত মিঃ জোনস, এই স্পেসিমেনের পরিচয়লিপিতে আমরা যে নাম দিয়েছি সেটা হল রান টেগোথের কাছে আত্মবলি!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকাল জোনস—কিন্তু ওরাবোনার দৃষ্টি অন্য দিকে। সে বলে উঠল:

মিঃ রজারসের কল্পনারাজ্যে বিরাজ করত এক আদিম দেবতার মূর্তি, অস্পষ্ট এক যুগের উপকথায় আকীর্ণ এক পুঁথি পড়ে উনি এই দানব দেবতার কথা জানতে পারেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই জঘন্য, আপনি নিশ্চয়ই মিঃ রজারসের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সব শুনেছেন।

অন্য এক গ্রহ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে মেরুর এক অঞ্চলে এর আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই যুগে এই আদিম দানব দেবতা আত্মবলির রক্তে তৃপ্ত ও পুষ্টি-সাধন করত। সেটা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন এবং একটু বাদেই দেখতে পাবেন মিঃ রজারস কী চমৎকার ভাবে মূর্তিটাকে গড়েছেন—এমন কী যে আত্মদান করেছিল এই দেবতার কাছে তার মূর্তিও রয়েছে এই স্পেসিমেনের সঙ্গেই। গায়ে কাঁটা দেবার মতন সেই দৃশ্য! হেঁ হেঁ, বুঝলেন কিনা স্যার।

ঠিক সেই মুহূর্তেই জোনস ঠিক করল, আর একটি মুহূর্তও সে এখানে থাকবে না। তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে আর দেহটা ঝুঁকে পড়ছে রেলিং-এর উপরে।

ওরাবোনাকে নিষেধ করতে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওরাবোনা কালো মোটা পর্দার দড়ি ধরে টান মারল।

পর্দা সরে গেল।

ওরাবোনা খিলখিল করে হেসে চীৎকার করে বলল, দেখুন! দেখুন!

শক্ত করে রেলিং ধরে নিঃশব্দে, হতভম্বের মত পাটাতনের দিকে তাকিয়ে রইল জোনস।

প্রায় দশ ফিট উঁচু, কদাকারভাবে হেলে থাকা সত্ত্বেও, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে অতিকায় বীভৎস জঘন্য এক মোমের মূর্তি।

এই মূর্তির চেহারার সঙ্গে দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে ফটোতে দেখা সেই মূর্তির। জলন্ত এক নারকীয় বিভীষিকা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সাইক্লপ ভাস্কর্যে গঠিত খোদাই করা এক পাথরের সিংহাসনে বসে আছে দুঃস্বপ্নের মতন মূর্তিটা।

সেই দু'টা শুঁড়ের মাথায় দাঁড়ার থাবার মতন তীক্ষ্ন নখর, বুকের মাঝখানে কুণ্ডলী পাকানো শুঁড়, কোমরের দু'পাশ দিয়ে অসংখ্য কিলবিল করা শুঁড় বেরিয়ে এসেছে আর সেই শুঁড়গুলোর মুখে সাপের ফণার মতন সরু লিকলিকে চেরা জিভ বেরিয়ে আসছে। হিংস্র কুটিল দৃষ্টিতে বড় বড় তিনটে মসৃণ চোখে তাকিয়ে আছে তার কোলের কাছে শুয়ে থাকা একটা প্রাণহীন চেহারার দিকে।

মূর্তিটার দু'টা শুঁড় জড়িয়ে রেখেছে ছিন্ন-ভিন্ন রক্তশূন্য, শুকনো চিমসে একটা মাংসের স্তূপকে। সেই স্তূপের চামড়া বিবর্ণ হয়ে গেছে কোন তীব্র অ্যাসিডে।

শিকারের মাথাটা কেবলমাত্র অক্ষত রয়েছে, সেটা ঘাড়শুদ্ধ একদিকে ঝুলে রয়েছে—এতে স্পষ্ট বোঝা যায় ওই শুকনো চিমসে রক্তশূন্য শিকারটা একসময়ে মানুষের চেহারা নিয়েই বেঁচেছিল।

রজারসের কাছে যে ওই ফটোগুলো দেখেছে তার কাছে এই দানব দেবতার পরিচয়ের কোন প্রয়োজন হবে না। সেই ফটোর ব্যাপারটা যে বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার সে বিষয়ে মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু

ফটোতে যে বিভীষিকা জেগে উঠছে, তার চেয়েও নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর বিভীষিকা জেগে উঠেছে বাস্তবের এই বিশাল মূর্তির ভেতরে।—

সেই গোলাকার ধড়, মাথার দিকটায় অগণিত জলবুদ্‌বুদ, তারই ভেতরে তিনটে চোখ মাছের মতন.অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বিসর্পিল ছ'টা বাহু লিকলিকে হয়ে বেরিয়ে এসেছে, থাবার দিকে দু'ভাগে বিভক্ত তীক্ষ্ণ নখর, কুণ্ডলী পাকানো একটা শুঁড় নেমে এসেছে বুকের মাঝখানে আর সাপের মুখ নিয়ে অসংখ্য শুঁড় বেরিয়ে এসেছে কোমরের দিক থেকে……।

ওরাবোনার বিশ্রী শীতল হাসি কিছুতেই থামতে চায় না।

প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় শেষবারের মতন মঞ্চের দিকে তাকাল জোনস। তারপরেই তার দৃষ্টি আবদ্ধ হল মূর্তিটার শুঁড়ের বেষ্টনীর মধ্যে আটকে থাকা চিমসে যাওয়া শিকারের ঝুলে পড়া মাথার দিকে।

যদিও মাথাটার লম্বা চুলগুলো মুখের একদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু তাতে মাথা এবং মুখ দেখার কোন অসুবিধা হল না। মুখটা বেশ চেনাচেনা মনে হল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, মুখটা অবিকল উন্মাদ রজারসের মুখের মতন।

জোনস প্রখর দৃষ্টিতে আর একবার সেদিকে তাকাল। ভালভাবে যাতে দেখা যায় সেই উদ্দেশ্যে রেলিং-এর ওপারে মুখটা উঁচিয়ে রাখল। হ্যাঁ রজারসের মুখই বটে।

কিন্তু কী কারণে রজারস এভাবে তার নিজের মূর্তি তৈরী করে রাখল? এটাও কী তার এক খেয়াল নাকি?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জোনস লিং-এর প্লাটফর্ম থেকে নীচে নেমে আসছিল—কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল এবং রেলিং ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঝুলন্ত মাথাটার দিকে।

তার সারা দেহে যেন মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের ঝড় বয়ে গেল। সেই কুকুরটার চিমসান ছিন্ন-ভিন্ন শুকনো দেহটার মতনই রজারসের দেহ পড়ে আছে দানবের শুঁড়ের মধ্যে।

সত্যিই যদি ওটা মোমের মূর্তি হয় এবং ওরাবোনার কথা অনুযায়ী ওটা মোমের মূর্তিই বটে, তাহলে মাথাটার গালের নীচে ওই ক্ষত চিহ্নটা এল কী ভাবে?

কথাটা মনে আসতেই জোনস চমকে উঠল, কারণ সে যখন রজারসের

সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে মত্ত ছিল তখন তার চিবুকের উপর দারুণ সূক্ষ্ম ওই ক্ষতটার সৃষ্টি তার স্পষ্ট মনে আছে।

তবে কী জীবন্ত রত্নাকরসেরই ওই ভয়াবহ নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটেছে!

জোনস নিজেকে আর সামলাতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রেলিং-এর প্লাটফরমের উপর।

তখনও ওরাবোনার মুখে লেগে রয়েছে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া।

সমাপ্ত